মঙ্গলালোক

মঙ্গলালোক

(দ্বিতীয় খণ্ড)

—সুনীলা গুহ

কল্পতরু সঙ্ঘ
কলিকাতা-৬

প্রকাশক : কল্পতরু সঙ্ঘ
১২, হাজি জ্যাকেরিয়া লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬
ফোন : ৩৫-৪৮৩০

প্রথম প্রকাশ : কৃষ্ণা পঞ্চমী ১১ই চৈত্র, বুধবার, সন-১৩৫৭

মুদ্রক :
কল্পতরু প্রেস
৯/২-গড়িয়াহাট রোড
কলিকাতা-১৯

শ্রীশ্রী মাধব

॥ আশীর্ব্বাদবাণী ॥
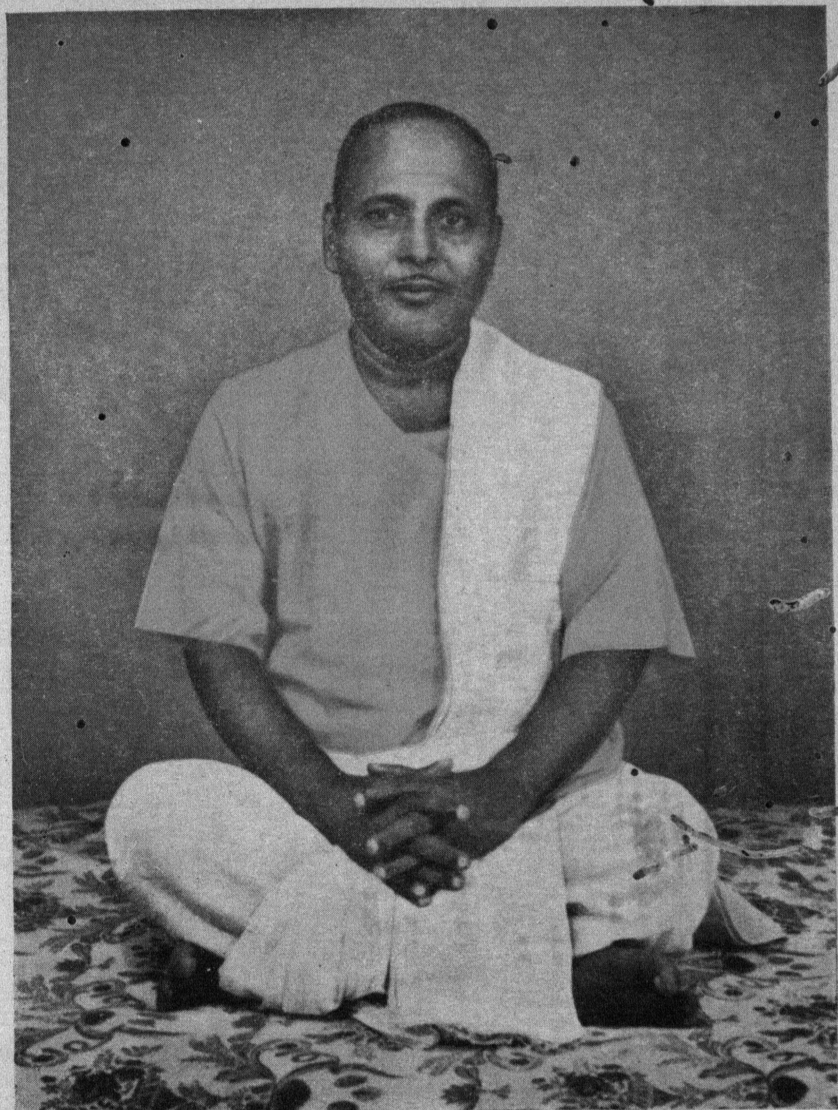
শাশ্বত সত্যের বাণী ভবকর্ণধার,
সে-বাণী ধ্বনিত হউক বিশ্বপারাবার
জাগিয়া জাগাও তুমি মানব-সন্তান,
মানবিকতার ধর্ম্মে সবে হও আগুয়ান ॥

—শ্রীশ্রী মা
(গঙ্গাদেবী)

ভূমিকা

বিপর্য্যয় যখন আসে তখন সে একা আসে না—সঙ্গে নিয়ে আসে নানা দুর্যোগ, নানা দুঃসহ, বেদনা, অনতিক্রম্য বাধা। সংকল্প হ'লেও সেই বিপর্য্যয়কে কাটিয়ে উঠ্‌তে সময় লাগে—তাই আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মঙ্গলালোকের দ্বিতীয় খণ্ড সময়মত পাঠক-পাঠিকার হাতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

প্রথম খণ্ড প্রকাশের পরে পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে যে সাধুবাদ এসে পৌঁছেছে তাতে দ্বিতীয় খণ্ড লেখায় অপরিসীম অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। সেই কারণে তাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। মনে হয় দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীমাধব আরও গূঢ় ভগবৎ—তত্ত্ব প্রকাশ ক'রেছেন, জানিনা পাঠক-পাঠিকার কাছে এটিও আদরণীয় হবে কি না।

আগেও ব'লেছি, এখনও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করছি যে, এখানে আমার নিজস্ব কোন কথা বা অলঙ্করণের প্রয়াস নেই, আমি অনিষ্ঠা অনুলেখিকা মাত্র।

শ্রীমাধবের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নানা অংশ তুলে, মুদ্রণ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে যাঁরা সাহায্য ক'রেছেন তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

পাঠক-পাঠিকা নিজগুণে যেন ভুলত্রুটি ক্ষমা ক'রে নেন, এই প্রার্থনা।

সুনীলা গুহ

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়	পৃষ্ঠা

——):*:(——

ভগবৎ সান্নিধ্যলাভে সহজ পথ

মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্তের প্রশ্ন ছিল,—আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কিভাবে ভগবানকে ডাকলে তাঁর সান্নিধ্য সবসময় উপলব্ধি করা যায় ?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, যে কোন কর্ম্মসম্পাদনে জীবমাত্রেই সর্ব্বদা সহজ পথের সন্ধান করে, কঠিন পথটি কেউই বেছে নেয় না, কেননা সে পথে পাড়ি দিতে সময় এবং পরিশ্রম উভয়ই বড় বেশী লাগে। এখন প্রশ্ন উঠে, সহজ পথ কোন্‌টি সে বিচার করি কি উপায়ে ?

শ্রীমাধব বলেন, যে অবস্থা বা পথ তোমার আয়ত্তাধীন সেটিই তোমার কাছে সহজ, আর যেটি তোমার আয়ত্তের বাইরে তাকেই তুমি কঠিন বা অলঙ্ঘনীয় ব'লে মনে কর। যেমন মাদ্রাজী ভাষা আমাদের আয়ত্তাধীন নয় ব'লে কঠিন লাগে, অথচ যারা সে ভাষা আয়ত্ত করতে পেরেছে তারা তো সেই ভাষাকে কঠিন মনে করে না।

পৃথিবীতে বহু মত ও পথ চিরকালই রয়েছে। যে যে পথে চলে অভ্যস্ত, যে পথের অভিজ্ঞতা যে অর্জ্জন ক'রেছে সে পথটি তার কাছে সহজ মনে হয়, সে পথে চলতেই সে শঙ্কাহীন বোধ করে, ভরসা পায়। তাহ'লে একথাই বলা যায় যে, সর্ব্বপ্রথম মানবমানবীকে চলার পথের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে হবে এবং এই অভিজ্ঞতা আসবে সাধু, গুরু, বৈষ্ণব ও মহাপুরুষের সঙ্গ করার ফলে। কখন কার কোন্ কথাটি যে আমার হৃদয়তন্ত্রীর সাথে সুর মিলিয়ে বেজে উঠবে, তা তো আগে থেকে কেউই বলতে পারে না। সহজ পথ বলে কোন পথের নিশানা তো পরমেশ্বর আমাদের কাছে প্রকাশ করেন নি; কাজেই অনন্ত এই বিশ্বে সত্যের সান্নিধ্য লাভ করতে

হ'লে অনন্ত মত ও পথের মধ্যে সহজ এবং কঠিন পথ খুঁজে বার করা সম্ভব নয়, তাই মনে হয় অভিজ্ঞপথ ধ'রে এগিয়ে চলাই এর একমাত্র সমাধান। সেই কারণেই সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের উপদেশ নির্দ্দেশ শ্রবণ, স্মরণ, মনন করা প্রয়োজন। প্রথমে কঠিন মনে হলেও শ্রবণ, স্মরণ, মনন বা চিন্তন দ্বারা কাঠিন্যের কুয়াশা দূরীভূত হ'য়ে আলোর পরশ লাগে এবং আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যেতে একটুকুও কষ্টবোধ হয় না। আধ্যাত্মিক জীবনে কোন পথকেই সহজ বা কঠিন বলা চলে না, কেননা তাহ'লে তো অন্য পথকে উপেক্ষা করা হ'ল এবং এই উপেক্ষা বস্তুটি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে একেবারেই অচল। যে কৃচ্ছ্র সাধনা ক'রে আনন্দ পায় তার কাছে সে পথ তো কঠিন নয়, কাজেই সাধন ক্ষেত্রে যে পথ আমায় আনন্দ দিতে পারে সেই তো আমার কাছে আকাঙ্ক্ষিত পথ।

শ্রীমাধব বল্লেন, সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের নির্দ্দেশে সঠিক পথ নির্ব্বাচন করা যায়। আর যাদের গুরুকরণ হ'য়েছে তাদের ক্ষেত্রে পথ নির্ব্বাচনের কোন প্রশ্নই উঠে না কেননা গুরু নির্দ্দেশিত পথই তাদের সব চাইতে সহজ, সরল পথ। গুরু যাকে যে পথের নির্দ্দেশ দেন আপাতদৃষ্টিতে তা কঠিন হ'লেও গুরুদেবের পরিচালনায় আপনিই সে পথ সহজ হ'য়ে আসে, অতএব সে পথ ত্যাগ বা গ্রহণের প্রশ্ন অবান্তর।

বাংলা ভাষায় একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যে, শিগ্‌গির যেতে চাইলে ঘুর পথে যাও অর্থাৎ ঘুর পথে বিপদ আপদের ভয় কম, যদিও সময় বেশী লাগে। কম সময়ে যে পথ অতিক্রম করা যায় সেখানে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা পোয়াতে হয় তাই নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে হ'লে ঘুরপথে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এই পথ প্রসঙ্গে শ্রীমাধব রামায়ণের কাহিনী ভক্তজন সমক্ষে বিবৃত করেন।

রাজা দশরথের দুই পুত্র ভরত ও শত্রুঘ্নকে নিয়ে বিশ্বামিত্র মুনি পথ চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোন্ পথে যাবে? একটি হ'ল সংক্ষিপ্ত ও কণ্টকপূর্ণ পথ, অন্যটি নিরাপদ ঘুরপথ'। ভরত বলে, 'ঘুর পথে যাব।'

একথা শুনে বিশ্বামিত্র বলেন, 'যেতে হবে না, ফিরে চল।' ফিরে গিয়ে রাজা দশরথকে তিনি বলেন, 'আমি এদের চিনিনা বা আগে দেখিনি বলে, তুমি রাম লক্ষ্মণকে না দিয়ে এদের সঙ্গে দিয়েছ? রাম লক্ষ্মণকে দাও, মিথিলায় জনকরাজার কন্যা জানকী বা সীতার স্বয়ম্বর সভা, সেখানে নিয়ে যাই।' যাত্রাকালে কোন্ পথে যাবে জিজ্ঞাসা করায় লক্ষ্মণ বলেন, 'যে পথে কণ্টক সেই পথেই যাব, যাবার সময় কণ্টক উৎপাটন ক'রে যাব, এটাইতো ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।' রাম বলেন, 'লক্ষ্মণ তো লক্ষণযুক্ত কথাই বলেছে।' বিশ্বামিত্র বলেন, 'তোমরা দুভাই যাও, আমি ওপথ মাড়াব না।' রাম স্মিত হাস্যে বলেন, 'বেশ তো। আমরা আগে যাই, আপনি পিছনে আসুন, কণ্টকমুক্ত হ'লে তো যেতে বাধা নেই?' বিশ্বামিত্র বলেন, 'তা যাব, তবে ওপথে তাড়কারাক্ষসী থাকে, সে কাউকে ছেড়ে দেবে না। তোমাদের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছি তাই ছাড়তে মায়া লাগে, চল, ছ'মাসের ঘুর পথেই যাইনা কেন'? লক্ষ্মণ বলেন, 'তাতে লাভ কি? তখনতো বাসী বিয়ের খাবার খেতে হবে।' রাম বলেন, 'চলুন, আপনাকে যেতেই হবে, কণ্টকমুক্ত হ'লেইতো হ'ল'?

রাম লক্ষ্মণ আগে আগে চলেছেন, বিশ্বামিত্র পিছনে। রাম লক্ষ্মণকে বলেন. 'দেখ ভাই, ওর মধ্যে ভয় রয়ে গেছে। কারণ জোর করে ব্রাহ্মণত্ব নিয়েছে তো। তাই ভয় আর ছাড়ছে না'। যাক্ বনের পথে রাম লক্ষ্মণ এগিয়ে চলেছেন, বিশ্বামিত্র দূর থেকে তাঁদের অনুসরণ ক'রে চলেন। পথে তাড়কা-

রাক্ষসীর সঙ্গে রাম লক্ষ্মণের দেখা, বলে, 'তোরা এ পথে এসেছিস কেন? তোঁদের কি ভয় ডরও নেই? তোদের দেখে বড় মায়া হ'চ্ছে, সময় থাকৃতে মায়ের ছেলে মায়ের বুকে ফিরে যা।' রাম তাড়কাকে বলেন, 'দেখ, তোমার ভয়ে এ অঞ্চলে সবাই ভীত, সন্ত্রস্ত। তুমি এপথ ছেড়ে গভীর অরণ্যে যেখানে জনমানবের গতায়াত নেই সেখানে গিয়ে বাস কর। তোমাকে দেখে আমারও মায়া হ'চ্ছে, তাই বলি এখান থেকে চ'লে যাও গভীর বনে, সেখান থেকে আর বের হ'য়োনা, তাহলে আমার বাণে নিহত হতে হবে, কেননা আমার বাণ যে অব্যর্থ।'

তাড়কারাক্ষসীও দমবার পাত্র নয়, মুখ হা ক'রে সে রামকে দেখায় যে তার দাঁতের ফাঁকে এখনও কত মানুষের হাড়গোড় আটকে আছে। সে বলে, 'ভাল চাস্‌তো এখনও বলছি এখান থেকে সরে পড়্।'

তার কথা শুনে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে বলে, 'দাদা! উপদেশের যোগ্য পাত্র তো এ নয়, আপনি অনর্থক একে উপদেশ দিচ্ছেন, আমি একে হত্যা করব।'

তাড়কার মনে পড়ে জমদগ্নি ঋষির পুত্র পরশুরাম এপথ দিয়ে যাবার সময় তার সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল এবং তখন পরশুরাম বলেছিলেন 'কেন অযথা আমাকে মারবার চেষ্টা করছ? তোমাকে বধিবে যে সে হ'ল রাম, আমিও রাম বটে, তবে তোমার মৃত্যু হবে তাঁর হাতে, আমি তোমায় বধ করব না।'

তাড়কা মনে মনে বুঝতে পেরেছে যে তার সময় হ'য়ে এসেছে এবং একথাও সে জানে যে, যদি রামচন্দ্রের হাতে তার মৃত্যু ঘটে তবেই রাক্ষস জীবনের অবসান হ'য়ে সে মুক্তি লাভ করতে পারবে। তাই লক্ষ্মণের হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন না দিয়ে পূর্ণব্রহ্ম রামের হাতেই তার প্রাণ দেবার বাসনা। এই কারণেই ক্রমাগত রাম লক্ষ্মণকে

সে উত্তেজিত ক'রে কথা বলতে থাকে, ভয় দেখাতে থাকে, বলে, 'দুধের বালক ব'লে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম, তা আর হ'ল না।' এই বলে তাড়কারাক্ষসী হা ক'রে রাম লক্ষ্মণকে গিলে ফেলতে এগিয়ে গেল। তখন রামচন্দ্র তাড়কাকে বধ করবার জন্য বাণ নিক্ষেপ করেন। মৃত্যু পথ যাত্রী তাড়কা সেই বাণে এক লম্ফ দিয়ে আকাশের দিকে উঠেই ভূতলে পতিত হয়, এবং তার দেহভারে মেদিনীগর্ভে আঠার যোজন একটি গহ্বরের সৃষ্টি হয়। শ্রীরামচন্দ্রের বাণেই শেষ পর্যান্ত তাড়কারাক্ষসীর জীবনের অবসান হ'য়ে মুক্তি লাভ হয়।

এদিকে তাড়কার ভয়ে বিশ্বামিত্র ঊর্দ্ধশ্বাসে পশ্চাৎ অপসরণ করেন. তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য রাম লক্ষ্মণকে পাঠান। লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের কাছে তাড়কা নিধনের সংবাদ দেন কিন্তু বিশ্বামিত্রের ভয় কাটে না, অবশেষে রামের বাণে তাড়কার মৃত্যু হ'য়েছে শুনে তিনি আশ্বস্ত হন এবং রামের কাছে এসে বলেন, 'হে রাম! তুমিই আত্মারাম, প্রাণারাম, তোমার কাছে পৌঁছাতে হ'লে কোনটি সহজ পথ তাই বল' ?

রাম উত্তর দেন. 'পথ তো একটি নয়, বহুপথ আছে, তবে যে পথেই তুমি এগোতে চাও না কেন. সে পথেই মায়ামোহ সব মিলিত হ'য়ে তোমাকে গ্রাস করতে আসবে, কেউই তোমাকে সহজে মুক্ত. হ'তে দেবে না। তাড়কারূপী মায়ামোহ আত্মারাম ছাড়া আর-সকলকেই গ্রাস করবার চেষ্টা করে। জগতবাসী প্রত্যেক মানব-মানবীই লক্ষ্মণ স্বরূপ, ভগবৎপথে যদি তাদের যাবার একাগ্রতা থাকে তবে আমি স্বয়ং তাড়কারূপী মায়ামোহকে নিধন ক'রে তার পথের কাঁটা সরিয়ে তাকে পথটি পার ক'রে দিই। আমি ভিন্ন আর কেউ এই পথকে কন্টকমুক্ত করতে পারে না। কখনও সাধু ও গুরুরূপে, কখনও শ্রীমূর্ত্তিরূপে আমিই ভক্তের পথের কন্টকমুক্ত করি, যে আমার আশ্রয়প্রার্থী তারই কন্টক আমি মুক্ত ক'রে থাকি।'

মহাপ্রভু বলেছেন, 'আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে।'

তাই শ্রীমাধবের উপদেশ হ'ল, আশ্রয় আমাদের প্রত্যেককেই নিতে হবে, হয় গ্রন্থের আশ্রয়, নয় সাধু, গুরু, মহাপুরুষের আশ্রয় বা সৎসঙ্গের আশ্রয়। গুরুর আশ্রয় নিলে তিনি স্বয়ং গুরুরূপে পথের কণ্টক সরিয়ে দেন।

বিশ্বামিত্রের অনুশোচনা জাগে, বলেন হে 'রাম! আজ বুঝতে পারছি, এতদিন আমি যা করেছি সবই না জেনে, না বুঝে করেছি। নিজ বাহুবলের গর্ব্ব আমায় অন্ধ ক'রে রেখেছিল, আজ আমার কাছে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হ'ল যে, অন্তরালে থেকে তুমিই আমায় কণ্টকমুক্ত ক'রেছ, আমার নিজ বুদ্ধিতে যা করেছি তাতে কণ্টক বাড়া ছাড়া কমেনি।'

শ্রীমাধব বলেন, তাহ'লে দেখা গেল আশ্রয় আমাদের নিতেই হবে। আশ্রয় ছাড়া কোন লক্ষণই ফুটে উঠবার পথ নেই। যেমন বৈষ্ণব পথের আশ্রয় নিলে বৈষ্ণবের বেশ নিতে হয়. যোগ পথের আশ্রয় যে নেয় তাকে নিতে হবে যোগীর বেশ। ভক্তিপথকে যারা আশ্রয় করে তাদের মধ্যে অষ্টসাত্ত্বিকী ভাব ফুটে উঠে। কাজেই যে, যে পথেরই আশ্রয় নাও না কেন, সেই পথের লক্ষণ তার মধ্যে ফুটে উঠবেই।

আপাতদৃষ্টিতে রামচন্দ্র ছিলেন লক্ষ্মণের দাদা কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁকে পূর্ণব্রহ্ম রামরূপেই জানতেন। আহার, নিদ্রা, মৈথুন এই তিনটিই লক্ষ্মণের বশীভূত ছিল। চৌদ্দ বছর তিনি আহার ও নিদ্রা কি তা জানেন নি, বিবাহ ক'রেও মৈথুন ছিল তাঁর কাছে অজানিত। তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিলেন পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র। যাঁর কাছে আশ্রয় নেওয়া যায়, পূর্ণনির্ভরতা থাকলে তিনিই তাকে হাত ধ'রে পথ পার ক'রে দেন। আমাদের ক্ষমতা কি যে নিজ শক্তি বলে কণ্টকাকীর্ণ চলার পথ অতিক্রম করি? আমরা যে অন্ধ।

সভায় আর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হ'য়েছিল—ভগবানকে জ্যোতি বলা হয়, তার অর্থ কি?

শ্রীমাধব বলেন বিশ্বপ্রকৃতি তাঁরই প্রতিকৃতি, সেদিকে চোখ মেলে তাকালে যা কিছু দু'চোখে পড়ে, সবই কি তিনি নন? তিনি ছাড়া এ জগতে আর কি কিছু আছে? তিনিই তো পরমজ্যোতি। তাঁকে যে, যে ভাবে উপলব্ধি করে সেইটিই তার কাছে সত্য। ভক্ত তাঁকে উপলব্ধি করে আনন্দঘন বিগ্রহরূপে। সচ্চিদানন্দরূপে, জ্যোতিরূপে, আত্মারূপে, ষড়ৈশ্বর্য্যবানরূপে, নিরাকার ব্রহ্ম ইত্যাদি রূপেও কেউ কেউ তাঁকে উপলব্ধি করে। যাঁর কোন আকার নেই, অথচ যিনি সর্ব্ব আকারের আকর, যিনি রূপাতীত হ'য়েও সর্ব্বরূপের রূপকার তিনিই নিরাকার ব্রহ্ম। কাজেই জ্যোতিদর্শন কথাটিকেও তো অস্বীকার করা যায় না। শ্রীমাধব বলেন, সব চাইতে বড় কথা হ'ল বিশ্বাস। যার যেটিতে বিশ্বাস তার কাছে সেইটিই সত্য, সেইটিই সুন্দর, সেইটিই আনন্দময়। তাঁর মতে দ্বৈতভাবে দর্শনই হ'ল মনোরাজ্যের চূড়ান্ত অবস্থা, এই দ্বৈতভাবের অতীত অবস্থায় যে পরমভাবের উদয় হয় সেটিই হ'ল অদ্বৈতভাব বা আত্মরাজ্য। তবে অদ্বৈতভাবে যেতে হ'লে দ্বৈতভাবের মাধ্যমেই যেতে হবে। জ্যোতিদর্শন হ'ল দ্বৈতভাবের কথা। এসব দর্শন করতে করতেই এ বোধ আসবে যে এও বাহ্য, তখন আর এই দর্শনেরও কোন অস্তিত্ব থাকবে না। জ্যোতিতে পথ দেখা যায় না, এ পথ দেখলে সাধকের মনে বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় যে, সে ঠিক পথেই চল্‌ছে এবং সে কারণেই তার সাধনপথে প্রেরণা আসে। যে, যে পথে আনন্দ পায় তার সে পথ অনুসরণ করাই উচিত। জ্যোতিদর্শন করলেও সেখানে থেমে থাক্‌লে চলবে না, সাধককে সাধনার পথে এগিয়ে যেতেই হবে। সব ক্ষেত্রে যে জ্যোতিদর্শন হবেই এমনও কোন কথা নেই।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীমাধব বলেন, 'মনোরাজ্য ছাড়া আত্মরাজ্য দর্শনের কোন পথ নেই'। যে বেদকে আমরা অতি উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছি, সেই বেদ পাঠে অনুভব হয় যে, বেদাতীত না হ'লে

সত্যের অনুভূতি সম্ভব নয়। একথা শুনে কিন্তু তোমরা মনে ক'রো না যে বেদকে তুচ্ছজ্ঞান করা হ'চ্ছে। বেদ পাঠে এটাই প্রকৃষ্টভাবে অনুভব করা যায় যে, মানুষ কত অন্ধকারে বা অজ্ঞানতায় ডুবে ছিল, সেই অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসার জন্যই বেদে নানা দেব-দেবীর পূজা, আরাধনা ও উপাসনার নির্দ্দেশ আছে।

সভায় ছোট্ট একটি প্রশ্ন উঠেছিল মন্ত্রশক্তির তাৎপর্য্য কি ?

শ্রীমাধব বলেন, এক ওঙ্কার ধ্বনি থেকেই সর্ব্বমন্ত্রের সৃষ্টি কাজেই মন্ত্রে শক্তি, গুণ, ক্রিয়া সবই বর্ত্তমান। চিন্তা ক'রে দেখ গুরুমন্ত্রের শক্তি কি ? গুরুমন্ত্রে অসাধুকে সাধু করে, মনের মালিন্য কেটে যায়, সৎসঙ্গ, সাধুসঙ্গ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে, ভগবৎ পাদপদ্মে বিশ্বাস জন্মে, এককথায় চরিত্র সংশোধিত হয়, কিন্তু সাপের মন্ত্রে কি এই একই কাজ হয় ? না; তাতে দেহ থেকে সাপের বিষ দূরীভূত হয় বটে তবে চরিত্র সংশোধিত হয় না।

ক্ষেত্র ও ভাষাবিশেষে মন্ত্রের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ক্রিয়ার প্রকাশ হয়। কেউ যদি খারাপ ভাষা ব্যবহার করে তখন তার প্রতিক্রিয়া একরূপ নেয়, আবার মধুর কণ্ঠে মা ডাক শুনলে তার প্রতিক্রিয়া হয় অন্যরূপ; সেইরকম ক্ষেত্রবিশেষে ও ভাষাবিশেষে মন্ত্রের ক্রিয়ারও তারতম্য হয়।

নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ

মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় প্রশ্ন ছিল, নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ এ দুটির মধ্যে তফাৎ কি?

শ্রীমাধব বলেন, অনিত্য এই সংসারে মানবমানবী যখন চিন্তা করে যে, যেখানে সবই মিথ্যা সেখানে আমিও তো মিথ্যা, কাজেই তখন তার মনে প্রশ্ন জাগে, এই মিথ্যা সংসারে আর কতদিন? নিত্যের সন্ধান কি কোনদিনও পাব না? এই অনুশোচনাই তাকে অনিত্য বা মিথ্যা থেকে সত্য বা নিত্যে যাবার সাধনায় প্রবৃত্ত করে।

শ্রীমাধব বলেন, ঝড়ঝঞ্ঝা, উত্তাল তরঙ্গ ও জলজন্তুর হাত এড়িয়ে সাঁতার কেটে নদী পার হওয়া বা ভয়ভীতি উত্তীর্ণ হ'য়ে বিপদসঙ্কুল গভীর অরণ্য অতিক্রম করা উভয়ই সাধনসাপেক্ষ। সাধনার অন্য অর্থ হ'ল সাধা। প্রথমটিতে শ্রমের দ্বারা জীবন-পথ অতিবাহিত করার সাধনা, অর্থাৎ সেখানে সাধকের চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই, যদিও ভগবানের প্রতি তার পূর্ণ নির্ভরতা আছে। আর দ্বিতীয়টি হ'ল ভগবানকে ডেকে অন্ধকার থেকে আলোতে যাওয়া। পূর্ণ নির্ভরতা এখানেও আছে, তবে সাধক এখানে নিশ্চেষ্ট, শ্রমবিমুখ। এরকম সাধনাকেই বলা হয় সাধা বা তোষামোদ করা।

শ্রমের মাধ্যমে যে সাধনা সেখানে সাধকের ভাব হ'ল, 'হে ঈশ্বর! তোমার অপার করুণা, তাই না চাইতেই তুমি আমায় চলন, বলন, স্মরণ, মনন, চিন্তন ইত্যাদি কত ক্ষমতা, কত শক্তি দিয়ে রেখেছ, তোমার কাছে নূতন ক'রে চাইবার তো আর কিছু নেই! কিন্তু তোমার ও আমার মধ্যে যে ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে উঠেছে, আমার শ্রম দ্বারা, চেষ্টা দ্বারা, যেন সেই প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে আমি

যে তোমার অভিন্ন সত্তা তা বোধে আনতে পারি, সাধনার এই পর্য্যায়ে যেন আমি সফলকাম হই'।

শ্রমবিমুখ সাধকের ভাব হ'ল, 'হে ঈশ্বর! বয়সকালে কত শক্তির খেলাই তো খেলেছি, আজ এই বৃদ্ধবয়সে আমি শক্তিহীন, সহায়সম্বলহীন, অপারগ! তুমি ছাড়া এই ভবসাগর পাড়ি দেবার কাণ্ডারী আর কে আছে আমার, তাই তো নিশিদিন তোমারই নাম হ'ল আমার জপ, তপ, ধারণা ও ধ্যান'। এইরূপ যে সাধনা সেটিই হ'ল ঈশ্বরকে তোষামোদ করা। তবে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, গুরুনাম করা কিন্তু তোষামোদের পর্য্যায়ে পড়ে না।

শ্রীমাধব বলেন, প্রকৃতপক্ষে নাম করা হ'ল একটি সশ্রম সাধনা। এ কথার অর্থ কি? নামের মধ্যে এত শক্তি নিহিত আছে যে এরই মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানা, চেনা এবং বোঝা যায়, আর সে কারণেই গুরুদেব নামের মাত্রা বাড়িয়ে যাবার নির্দ্দেশ দেন। নাম করার উদ্দেশ্য হ'ল নামীকে জানব ব'লে, আমি যে নামীর অভিন্ন সত্তা সে উপলব্ধি আসবে ব'লে, কিন্তু হাজার বার, লক্ষ বার নাম ক'রেও সে বোধ তো কৈ আসে না? তার কারণ, হয়তো যেরূপ একাগ্রতা নিয়ে নাম করা উচিত কোথাও সে একাগ্রতার অভাব আছে। তাই শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদা উপদেশ দেন যে, নামীকে জানবার জন্যই নাম করতে হবে। যে শক্তি জানার আনুকূল্যে তোমার মধ্যে ষড়ৈশ্বর্য্য প্রকাশের সম্ভাবনা, সেই শক্তিকে জান। বিপদোদ্ধারের বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য নাম করলে তা ক্ষেত্র বিশেষে সাফল্য আনে বটে কিন্তু পরমার্থের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু লাভ হয় না। ঐকান্তিক ও বিশুদ্ধাভক্তি সহকারে নাম করা প্রয়োজন—তবেই পরমার্থকে উপলব্ধিতে জানতে পারবে এবং নামের শক্তিতেই নামী ও তুমি যে অভেদ সে জ্ঞানও হবে।

শ্রীমাধব বলেন, আমরা তাঁকে কত নামে ডাকি, কত তোষামোদ

করি, বলি, 'হে ঈশ্বর! তুমি দীনবন্ধু, পতিতপাবন, দয়াময়, আরও কত কি'। কিন্তু আমাদের এই তোষামোদে কি তিনি তুষ্ট হন? হন না। তবে কি ক'রে তাঁকে তুষ্ট করা যায়?

শ্রীমাধব বলেন, তিনি যখন দেখেন যে তাঁর সন্তান ক্ষর নামের দ্বারা অক্ষর নামীকে বোধে আনতে পেরেছে তখনই তিনি দু হাত তুলে সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করেন। অক্ষর বোধে এলে তো নামীকেই জানা হ'ল। অক্ষরকে বোঝার জন্যই ক্ষরের মুখে নাম করার উপদেশ শ্রীগুরুদেব দেন। কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা ক'রে নাম করা উচিত নয়। নাম দ্বারা যখন নামীকে বোঝা যায়, তখন চাওয়া পাওয়া ব'লে আর কিছু থাকে না, তখন নাম করেই সে আনন্দ সাগরে ভাসে।

সাংসারিক সংসারের ছেলে যখন অক্ষর চিনে নিজে নিজেই পড়ে, তখন পাশের ঘরে ব'সে পিতামাতার আনন্দ আর ধরে না। বলেন, 'ছেলে যে নিজে নিজেই পড়তে শিখে গেছে গো'!

এও সেইরকম, নাম করতে করতে সন্তান যখন নামীকে বুঝতে পারে অর্থাৎ অক্ষরকে সে বোধে আনতে পারে, তখন তার উপলব্ধি হয় যে পরমপিতা নিত্য, আমিও নিত্যের অভিন্ন সত্তা। তখন যে নির্ম্মল আনন্দ পায় সেই আনন্দ সে আরও দশজনকে বিতরণ ক'রে সচ্চিদানন্দে ডুবে থাকে। এইটিই হ'ল নিত্যসিদ্ধ অবস্থা।

আর যতক্ষণ নামীকে না জেনে তাঁকে জানার জন্য নাম করা যায় সেইটি হ'ল সাধনসিদ্ধ অবস্থা। সাধনসিদ্ধ অবস্থা হ'ল আমের কাঁচা অবস্থা, আমের পাকা অবস্থাকে নিত্যসিদ্ধ অবস্থা বলা চলে। দ্বিধাহীন সিদ্ধান্তে যে পৌঁছাতে পারে সে-ই সিদ্ধপুরুষ।

শ্রীমাধব বলেন, তুমি যে সেই অক্ষরেরই অভিন্ন সত্তা, তোমার মধ্যে যে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদই উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছেন সেকথা একবার চিন্তা ক'রে দেখ, সে সম্পদ নিজের মধ্যে একবার

ভাল ক'রে খুঁজে দেখ। তবেই দেখ্‌বে, তুমি আর তোমার নিজেকে খুঁজে পাচ্ছ না অর্থাৎ আমার আমার ব'লে যা কিছু এতদিন আঁকড়ে থেকেছ সে সবই, 'তিনিময়'। এমন কি তোমার কোন পৃথক অস্তিত্বও নেই, তুমিও 'তিনিময় হ'য়ে গেছ'।

শ্রীগুরুদেব যে নাম জপ করতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন, নিষ্ঠার সহিত বার বার সে নাম জপ করলে একদিন না একদিন দেখ্‌বে তোমার ব'লে কিছুই নেই সবই 'তিনিময়'।

আর নদীকূলে ব'সে যদি বিলাপ কর, 'আমি অন্ধ, সহায়সম্বল-হীন, দয়া ক'রে আমাকে পার কর দীনবন্ধু! তবুও কেউ তোমাকে পার করতে এগিয়ে আসবে না, কেন না সেখানে তো কোন সেতু নেই বা নৌকা নিয়ে তোমার অপেক্ষায় কেউ দাঁড়িয়েও নেই, সাঁতার কেটে তোমায় নিজেকেই যে নদী পার হ'তে হবে। ঈশ্বর অপার করুণাময়, দয়াময়, দীনবন্ধু, তাঁর কাছে সত্যিই কিছু চাইবার নেই, তিনি যে অতি সুবিচারক, তাই চাইবার অপেক্ষায় না থেকে হিসাব কষে সবাইকে সমানভাবে সবকিছুই দিয়ে রেখেছেন, কিন্তু সেকথা আমাদের অন্তর মানে না। দিনের পর দিন তাই একই আবেদন আমরা পেশ করি, 'করুণা ক'রে আমায় পার ক'রে দাও গো'।

শ্রীমাধব বলেন, এই রকম করুণা ভিক্ষার কথা আমাদের ভুলে যেতে হবে, আমরা তো তাঁর দুর্ব্বল এবং অক্ষম সন্তান নই। এত শক্তিমান ও দয়াময় যাদের পিতা তারা কেন করুণা ভিক্ষা করবে? তাদের মুখে ফুটে উঠবে বলিষ্ঠের ভাষা, তারা বলবে, 'হে পরমপিতা! হে প্রভু! তুমি অপার করুণাময়, না চাইতেই তুমি তোমার সন্তানদের নিজ শক্তিবলে শক্তিমান ক'রে রেখেছ, তোমার শক্তিবলে বলীয়ান হ'য়েও আমরা তার যথার্থ প্রয়োগ করতে পারিনি, আজ তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি যে, তোমার দেওয়া শক্তি দিয়েই যেন আমরা এই ভবসাগর পার হ'তে পারি'। কেননা

আমরা প্রত্যেকেই যে তোমার; আমরা প্রত্যেকেই যদি তোমার হ'য়ে থাকি তবে আমাদের মধ্যে যা কিছু তাও তো তোমারই। তাহ'লে কে কাকে পারের কড়ি দেবে? তুমি পরম সত্য—আমরা তোমার অভিন্ন সত্তা, জীবের এ বোধ এলে আর পারের কড়ির প্রশ্ন থাকে না।'

পরের শুক্রবার অর্থাৎ ১লা ভাদ্র থেকে শ্রীমাধবের শিষ্যগণ এক সপ্তাহের জন্য মৌনব্রত উদ্‌যাপন করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমাধব বলেন, 'মৌনব্রতকে সর্ব্বসাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা বলা যেতে পারে। এই ব্রত উদযাপন দ্বারা আমিত্ব বুদ্ধি বা আমিত্ব জ্ঞানের নীরবতা আনয়ন করা যায় অর্থাৎ তারা যেন কথা বলবার সুযোগ আর না পায়। ষড়রিপু এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়—সকল সর্ব্বদা তোমাদের মুখর ক'রে রেখেছে, তাই নিজে মৌন হ'য়ে তাদেরও তুমি মৌন করাও। তুমি নিজে মৌন হ'লে তাদেরও মৌন হ'তে হবে। তুমি সরব বলেই তারাও সরবে আছে।'

প্রশ্ন জাগে এই মৌনব্রত পালনের উদ্দেশ্য কি? এই ব্রত উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য হ'ল তাঁর নাম, তাঁর গুণ, তার মহিমা, এবং কীর্ত্তনে ডুবে থাকা। এ জগতে তাঁর মহিমা কীর্ত্তন ছাড়া আর সবই যে অনিত্য। অনিত্য এই জগৎ সংসারে নিজে মৌন থেকে অনিত্য-বুদ্ধিকে মৌন করা যায়।

মনে এই প্রশ্ন হয়তো জাগতে পারে যে, তবে কথা বলবে কে? শ্রীমাধব বলেন, তুমি হ'লে যন্ত্রস্বরূপ, আর তিনি হ'লেন যন্ত্রী। যন্ত্রীই তো যন্ত্রের কর্ত্তা। যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র যখন বাজে তখনই তো তাল, মান ও লয়ের সমন্বয়ে যন্ত্রের সুন্দর বোল উঠে এবং শ্রুতিমধুর হয়। এই ভাব বা বোধ নিয়ে যারা চলে তাদের আমিত্ব-বোধ নাশ হয়।

সভায় প্রশ্ন উঠেছিল জন্মসিদ্ধ কথাটি কি? শ্রীমাধব বলেন, আমার মতে জন্মসিদ্ধ কথাটি অস্পষ্ট, কারণ জন্মসিদ্ধ বলতে আমরা

বুঝি, যে জন্মের আগেই সিদ্ধি লাভ ক'রেছে ; তাছাড়া অভিধানেও একথাটি খুঁজে পাওয়া যায় না। শ্রীমাধব বলেন, পূর্ব্বজন্মে তিনি কি ছিলেন তা তো আমাদের কারুরই জানা নেই, আমরা একথা ব্যবহার করি তাঁর লক্ষণ দেখে। আমার বক্তব্য হ'ল পাত্র যদি পরিষ্কার হয়, চিম্‌নীটি যদি মালিন্য মুক্ত থাকে, তবে সেই চিম্‌নীর সাহায্যে আলোর প্রকাশ তো হবেই। তাই জন্মসিদ্ধ কথাটি উঠতে পারে না। এরকম কেউ কেউ আছেন যাঁরা যুগযুগান্ত ধ'রে এমন সতর্ক হ'য়ে চলেন যে তাঁদের চিম্‌নীতে ময়লা পড়ার কোন সুযোগই নেই।

তিনি বলেন, 'আমি একথাই বলতে চাই যে মনুষ্য জন্মটাই মীমাংসার জন্য। সুপথে চলার জন্ম যখন পেয়েছ, তখন পথ উত্তীর্ণ হবার জন্য এগিয়ে চল। মানুষের জীবন পথটাই ঈশ্বরের প্রকাশ বিকাশের ক্ষেত্র। তুমি ব্যতিক্রমে চলে ঈশ্বরের প্রকাশ বিকাশে বাধা সৃষ্টি কেন করবে? শ্রীমাধব বলেন, 'তুমি যে সত্যের অভিন্ন সত্তা সে অনুভূতি আসতে, তিন জন্ম লেগে যাবে, একথা ভাববার কোন কারণ নেই। তোমার এ জন্মের মধ্যেই ঈশ্বরের সম্পূর্ণ প্রকাশ বিকাশ অনুভূত হ'তে পারে, তাই জন্ম জন্মান্তরের কথা চিন্তা না ক'রে এ জন্মেই যাতে সেই পর্য্যায়ে উন্নীত হ'তে পার সে চেষ্টা কর। জন্মজন্মান্তর বলতে পর পর জন্ম বুঝায়। আর আমি বলছি বর্ত্তমান জন্মে ক্রমের মাধ্যমে চলেই তুমি সে অবস্থা প্রাপ্ত হ'তে পারবে।'

জন্মান্তর বাদ

শ্রীমাধবের মঙ্গলবারের আলোচনা সভায় প্রশ্ন ছিল হিন্দুধর্ম্মে জন্মান্তর বাদ রয়েছে কিন্তু মুসলমান বা খ্রীষ্টধর্ম্মে তো এই জন্মান্তর বাদ মানে না, এ বিষয় কিছু আলোকপাত করুন।

শ্রীমাধব আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, মনে পড়ে বহুদিন আগে সিমলাষ্ট্রীটে শ্রীগঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে গিয়েছিলাম। এর আগে তাঁর সঙ্গে কোন সাক্ষাৎ, পরিচয় ছিল না, লোকমুখে দুজন দুজনকে জানতাম। সেবার তিনি লোক পাঠিয়ে আমাকে নেওয়ালেন। গিয়ে দেখি, বহু শিষ্য ভক্ত জমায়েত হ'য়েছে। সেখানে এই পুনর্জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে—হিন্দুধর্ম্মে জন্মান্তব বাদ রয়েছে, কিন্তু মুসলমান বা খ্রীষ্টধর্ম্মে তা মানে না।

শ্রীগঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনাব এ বিষয়ে অভিমত কি ?' আমার সম্মুখে আম ইত্যাদি নানা ফলাহার সাজিয়ে দিয়েছিল। আমি একটি আম হাতে নিয়ে বলি, 'দেখ, এই আমের মধ্যেও পুনর্জন্মের বীজ রয়েছে।'

প্রশ্ন উঠে, তা কি ক'রে হয় ? এ আমটি তো আর ফিরে আসছে না ?

বলি, 'দেখ ! ভগবানের কি বিচার। তুমি তোমার এইরূপে বা দেহে ফিরে আসছ না ? অন্য কোন রূপে আসছ। তবে বহির্দৃষ্টিতে চিন্তা না ক'রে অন্তর্দৃষ্টিতে চিন্তা কর। আমটি হ'ল কারণ, মূল হ'ল তার বীজটি, এই বীজ থেকেই তো কত আমের সৃষ্টি হবে, তেমনি মানুষ যতদিন না জন্মায়, ততদিন বায়ুভূত অবস্থায় থাকে। তার জন্ম হয় না, সে প্রেতলোকে প্রেতাত্মারূপে থাকে, তার বহু প্রমাণ সর্ব্বত্র রয়েছে।

যদি পুনর্জন্ম না থাকে তবে সনাতন ধর্ম্মে যে অবতারবাদ মানা হয় তা ও তো মিথ্যা হ'য়ে যায়। কারণ শ্রীরামচন্দ্র যে শ্রীকৃষ্ণরূপে এসেছিলেন বা শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতাররূপে এসেছিলেন সেকথাও তবে মিথ্যা। তারপব নচিকেতার কথা ভেবে দেখ, সেখানেও পুনর্জন্মের প্রমাণ রয়ে গেছে।

আমাদেব সনাতনধর্ম্ম সবচেয়ে পুরাতন ধর্ম্ম। অন্যান্য যে সব ধর্ম্মে পুনর্জন্মকে স্বীকার করেনি, সে সব ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্মের পরে সৃষ্টি হ'য়েছে। তাঁদেব আয়ুষ্কালে তাঁবা যতটা অগ্রসর হ'তে পেরেছেন, সে ব্যাখ্যাই তাঁরা দিয়ে গেছেন। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মই হ'ল আদি ধর্ম্ম। পুনর্জন্ম আছে, এটা সনাতনধর্ম্মের অটুট সিদ্ধান্ত। সেই কারণেই এই ধর্ম্ম সর্ব্বদা এই সতর্কবাণী স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পুনঃ পুনঃ জন্মের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তোমার মনুষ্য জন্মকে সার্থক ক'বে তোল অর্থাৎ পূর্ণমনুষ্যত্ব লাভ ক'বে তুমি যে ঈশ্বরের অভেদ সত্তা সেটি উপলব্ধি ক'বে এই মীমাংসার জন্মকে পূর্ণরূপ দান কর। সনাতনধর্ম্মের এই জন্মান্তরবাদে সমগ্রবিশ্বই অন্তর্ভুক্ত।'

শ্রীমাধব বলেন, পুনর্জন্ম যদি না থাকে, তবে কিসের সাধনসাধনা? জন্ম হ'লেই মৃত্যু অবধারিত এবং তাতে যদি মুক্তি আসে তবে তো সাধনভজন নিরর্থক।

একমাত্র সনাতন ধর্ম্মেই দেখা যায় যে, যা কিছু সৃষ্টি হ'চ্ছে সেই সঙ্গে গুণ, ক্রিয়া; চলন, বলন, ধারণ ও চলছে। এই গুণ ও ক্রিয়াব ব্যতিক্রমে যে পরিণাম তাব বিচাবও সঙ্গে সঙ্গেই হয় এবং দেহের মাধ্যমেই তার সুফল ও কুফল ভোগ করতে হয়। দেহছাড়া কিসের বিচার? তবে যমালয়ে নানা বীভৎস বিচারের যে গল্প ও কাহিনী আমরা শুনি সেটা হ'ল সতর্কবাণীর মত, খানিকটা ভয়ভীতি প্রদর্শন করা অর্থাৎ এসব শুনে লোকে যেন সৎপথে ও ন্যায়েব পথে চলে, অন্যায় ও অসৎকর্ম্ম থেকে বিরত থাকে।

শ্রীমাধব বলেন, ভোগ করতে হবে দেহের মাধ্যমে, কেননা বিদেহীর কোন ভোগ নেই। তিনি বলেন, যদি প্রশ্ন উঠে যে দেবলোক বা স্বর্গলোক বলতে আমরা কি বুঝব? তার উত্তরে বলি, দেব অর্থাৎ দৈব বা ঈশ্বরবোধ নিয়ে যাঁরা জন্মান তাঁরা মুক্তপুরুষ, নিষ্পাপ। পাপপুণ্য কিছুই তাদের স্পর্শ করতে পারে না—এবং একেই বলে দেবলোক। দেবলোক ব'লে আলাদা কোন জগৎ নেই।

কাজেই সব কিছুরই উৎস হ'লেন ব্রহ্ম। জন্ম হ'লে যেমন মৃত্যু অনিবার্য্য তেমনি মৃত্যুর পরে আবার জন্মও অবশ্যম্ভাবী তাই সনাতন ধর্ম্ম জন্মান্তরবাদ মেনে চলে।

সনাতন ধর্ম্মগ্রন্থ হ'ল অমুখবাণী। এই ধর্ম্মগ্রন্থ কারুর সৃষ্টি নয়। প্রাচীনকালের মুণিঋষিগণ মহাকাশের উত্থিত ধ্বনি থেকেই সমস্ত মন্ত্রের আবিষ্কার ক'রেছেন এবং সেই অমুখবাণী ধর্ম্মগ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। সমগ্র বিশ্বের বীজ রয়েছে এই সনাতন ধর্ম্মে। বিভিন্ন ধর্ম্মের লোক নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী ধর্ম্মের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন, তাই জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে তাঁদের প্রকৃত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আজকাল অনেকেই এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জ্জন করতে প্রয়াসী হন এবং তাঁদের অনেকে পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাসও করেন।

আলোচনা সভায় জাতিস্মর কথাটি উঠে। শ্রীমাধব বলেন, আধ্যাত্মিক তত্ত্বে জাতিস্মর কথাটি অচল। অভিধানগত অর্থে পূর্ব্বজন্মের কথা মনে আছে এমন লোককে জাতিস্মর বলা হয়, কিন্তু সে অপরের কথা বলতে পারে না।

শ্রীমাধবের মতে যিনি মানবজাতির ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান জানাতে পারেন, তিনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি। সেই ঋষি যখন সাধারণ

মানুষ হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেন তখন হয়ত তিনি পূর্ব্বজন্মের সাধনার ফলে মুক্ত পুরুষের ন্যায় ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান বলতে সক্ষম হন। তখনই সাধারণ মানুষ তাঁকে জাতিশ্বর বা আরো নানাপ্রকার উপাধিতে ভূষিত করে থাকে। শুধু ভূত, ভবিষ্যতের কথাইতো তাঁরা বলেন না, মানব-মানবীদিগকে নানাপ্রকার সদুপোদেশ দ্বারা ঈশ্বর পথে আনতেও চেষ্টা করেন।

আরাধ্যের সর্ব্বজনীনতা ও অখণ্ডজ্ঞান

শ্রীমাধবের আজকের আলোচনার মূল প্রবাহটি হ'ল আরাধ্যের সর্ব্বজনীনতা এবং অখণ্ডজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'রে। তিনি বলেন, আমার মতে পুরাণ শাস্ত্র নয়, এটি একটি ইতিহাস। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লোকের বোধগম্য করবার বা তাদের বুঝবার জন্যই মুনিঋষিগণ পুরাণের কাহিনী অবতারণা ক'রেছেন। অথচ আমরা সেই সমস্ত তত্ত্ব অনুধাবন না ক'রে কেবল সরস কাহিনী রূপেই তাকে উপভোগ করতে চাই।

শ্রীমাধব বলেন, বিস্তৃত আলাপ আলোচনা এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, যার যার আরাধ্যকে ভগবান বলা আর কুয়োর ব্যাঙ কুয়োর মধ্যে লম্ফঝম্ফ করা একই কথা। যতক্ষণ সে কূপের মধ্যে আছে ততক্ষণ সীমাহীন সাগরের কল্পনা তার পক্ষে করা অসম্ভব, তাই কূপকেই সে সাগর মনে করে। কিন্তু যখন সাগরের অভিজ্ঞতা তার হয়, তখনই কূপের সঙ্কীর্ণ পরিসর তার বোধগম্য

হয় এবং কূপ ও সাগরের পার্থক্য বুঝতে পারে। তেমনি ভক্ত তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজ আরাধ্যকে ভগবান মনে করলেও সারা বিশ্ব তার আরাধ্যকে ভগবান বা ঈশ্বর ব'লে মেনে নেবে, এমন কোন কথা নেই। যিনি সারা বিশ্বকে আলো বা জ্যোতি দিতে সক্ষম, তিনিই সারা বিশ্বের কর্ত্তা এবং সমগ্র মানবজাতির ঈশ্বর বা আরাধ্য।

ঈশ্বরের কোন রূপ নেই, বিশ্বে যত রূপ আছে, সে সব রূপের সমষ্টিই তিনি। তিনিই তো সারা বিশ্বকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন, তাই তিনিই জগৎস্বামী, জগৎপতি। শ্রীমাধব বলেন, তোমাদের আরাধ্য, তোমাদের স্বামী, তোমাদের ভগবান কি রকম জান? যেমন জাগতিক ক্ষেত্রে এক এক জনের স্বামী এক একটি পৃথক ব্যক্তি এও তেমনি; কিন্তু তোমার স্বামীরূপী ভগবানকে অন্যে কি স্বামী ব'লে মানে?

কাজেই বলি, আমরা কূপের মধ্যে পড়ে আছি, সাগরের সন্ধান আমাদের মেলেনি। কৃষ্ণ বলতে আমরা বুঝি, গোকুলের যশোদানন্দন বালগোপালকে বা বৃন্দাবনের রাধা ও গোপিনীগণ পরিবৃত কৃষ্ণকে কিন্তু বিশ্ববাসী কি এ কৃষ্ণকে ভগবান ব'লে মেনে নিতে পারে? তোমার ভাবের ঘরে হয়তো তিনি আরাধ্যের আসনে অধিষ্ঠিত কিন্তু সারা বিশ্ব যদি তাঁকে সে ভাবে গ্রহণ করতে না পারে, তাতে কি অন্যায় কিছু হবে?

প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ তিনিই, যাঁর আকর্ষণে পৃথিবী ঝুলছে, যিনি কর্ষণ, বিকর্ষণকারী, যিনি সমগ্র বিশ্বের আশ্রয়দাতা, যিনি বিশ্বের সর্ব্বকালের পালনকর্ত্তা। সে কৃষ্ণকে মেনে নিতে সারা জগতে কারুরই আপত্তি থাকতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ বলতে প্রকৃতপক্ষে একথাই জানা উচিত, যে 'আমি-সত্তার' বিকর্ষণে অনন্ত বিশ্বসত্তা সৃষ্ট হ'য়েছে, সে-ই 'আমি'র কর্ষণে বিশ্বে যা

কিছু সৃষ্টি হ'চ্ছে, ও যে 'আমি'র আকর্ষণেই পৃথিবী ঝুলে আছে, সেই 'আমিই' কর্ষণ-আকর্ষণ-বিকর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণ।

তাই শ্রীমাধব উপদেশ দেন যে, তোমরা যার যার আরাধ্যকে আধ্যাত্মিক ভাবে চিন্তা ক'রে যদি ভজনা কর তবে আরাধ্যকেই ভগবান বলতে পার। তোমার আরাধ্যকে তুমি ভগবান বলে মান সে উত্তম কথা, তাই বলে অন্য কাউকে মানাতে যেওনা। তিনি বলেন, নিরাকার ভাবে ভজনা করতে যদি কষ্ট হয়, তবে সাকার ভাবেই তাঁকে ভজনা কর, তাহ'লে একদিন না একদিন নিরাকারের কিনারায় পৌঁছাতে পারবে।

শ্রীমাধব বলেন, তোমাদের সকলের মধ্যেইতো তিনি আত্মারূপে রয়েছেন, সেই আত্মাকেই ভজনা কর না কেন, তবেই তো সেখানে বিশ্বজনীন ভাব আসবে। সাকার হ'য়ে নিরাকারকে বোধে আনতে যদি কষ্ট হয় তবে আগে সাকারের ভজনাই কর, তাতে কোন দোষ নেই, কিন্তু এটি হ'ল খণ্ডজ্ঞান। খণ্ডজ্ঞানের প্রভাব যতদিন প্রবল থাকে ততদিন অখণ্ডজ্ঞান প্রকাশ পেতে পারে না, কেননা খণ্ডজ্ঞান দ্বারা অখণ্ডজ্ঞান যে চাপা পড়ে আছে। খণ্ডজ্ঞানের প্রভাব কেটে গিয়ে যেদিন অখণ্ডজ্ঞানের উদয় হবে সেদিনই বুঝতে পারবে যে, তোমরা তাঁরই অভিন্ন সত্তা।

যদিও আমাদের মধ্যে অখণ্ডজ্ঞান রয়েছে, তবু যেদিন জন্মগ্রহণ ক'রেছি সেদিন থেকেই জীবনের প্রতি পদক্ষেপে খণ্ডতার প্রভাব আমাদের ঘিরে আছে। পিতামাতা, ভাইবোন নিয়ে প্রতিটি সংসারই যে পৃথক। এক আত্মাই যে বহু হ'য়ে প্রকাশ হয়েছেন, সে জ্ঞান আসা কি সহজ ব্যাপার? এই খণ্ডজ্ঞানকে দূরীভূত করাই তো প্রকৃষ্ট সাধনা আর ময়লা দূরীভূত করা হ'ল কৃচ্ছ্রসাধনা। প্রকৃষ্ট সাধনায় কোন সংস্কার নেই, কৃচ্ছ্রসাধনায় সংস্কার রয়ে গেছে। প্রকৃষ্ট সাধনা ছাড়া খণ্ডজ্ঞানকে দূর করা সম্ভব
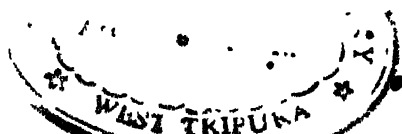
নয়। খণ্ডজ্ঞান দূরীভূত হ'য়ে একবার যদি অনন্তের জ্ঞান বা অখণ্ডজ্ঞানের উদয় হয় তবে তা আর কোন দিনই ঝরে পড়ে না। এই অখণ্ডজ্ঞান আসবে শ্রীগুরুর উপদেশ নির্দ্দেশ অনুশীলন ক'রে। সর্ব্বক্ষেত্রে শ্রীগুরুই এসে শিষ্যের জীবনতরীর হাল ধরেন, তিনিই তো পারাপারের মাঝি, তিনিই শিষ্যের ভবকাণ্ডারী।

সবশেষে শ্রীমাধব বলেন, খণ্ডজ্ঞানে বাস ক'রেও খণ্ডজ্ঞানকে ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করতে হবে, কেননা চিরকাল খণ্ডজ্ঞানে ডুবে থাকাও তো চলেনা। যাঁদের প্রকৃষ্টভাবে অখণ্ডজ্ঞান হয় তাঁরা খণ্ডজ্ঞানের অভিনয় ক'রেও অখণ্ডজ্ঞানে ডুবে থাকে এবং তাঁদেরই বলা চলে দক্ষ অভিনেতা।

প্রতীক্ষা

এই মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু হ'ল প্রতীক্ষা। তিনি বলেন, জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে জয়লাভ করতে হ'লে প্রতীক্ষার প্রয়োজন। সংসার ক্ষেত্রেও ফল লাভের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়। শ্রীমাধব বলেন, যে ফল লাভের জন্য তুমি প্রতীক্ষমাণ, সেই কারণটিকে প্রস্ফুটিত ক'রে তোলার জন্য তোমায় কর্ম্ম ক'রে যেতে হবে। কেননা সুষ্ঠু কর্ম্মই তোমার প্রতীক্ষাকে ফলপ্রসূ ক'রে তুলবে। উপমা স্বরূপ তিনি বলেন, কেউ যদি মাষ্টার ডিগ্রী নিতে চায়, তবে তাকে বর্ণবোধ থেকে শুরু ক'রে মাষ্টার ডিগ্রী পর্যন্ত যা কিছু প্রয়োজন সবই অধ্যয়ন করতে হয়। যে মাষ্টার ডিগ্রীর জন্য সে প্রতীক্ষা করছে, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হ'লে অধ্যয়নরূপ কর্ম্মটি তার সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা চাই।

মূল কথা হ'ল, প্রতীক্ষার কারণকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রকাশিত হবার জন্য সর্ব্বদাই সুকর্ম্ম ক'রে যেতে হবে। তা না ক'রে দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত থাকলে যে ফল ফলবে, সেটি হবে কুফল।

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রতীক্ষার কারণ হ'লেন ঈশ্বর; যাঁর কারণে আমরা নানারকম সাধাসাধন ও ভজনক্রিয়া ক'রে থাকি। যারা গুরুবাণী অনুকরণশীল হ'য়ে জীবনপথকে সংশোধিত এবং ক্রমে পরিচালিত করতে প্রয়াসী হয়, তাদের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের প্রতীক্ষা ফলবতী হয়, তার অন্যথা বা ব্যতিক্রমে ফল হয় অশুভ। ব্যতিক্রম বলতে একথাই বলা হ'চ্ছে যে, যারা নিজ স্বার্থের কারণে কর্ম্ম করে। আর যারা বুঝতে পারে যে, তারা ঈশ্বরেরই অভিন্ন সত্তা এবং এতদিন যে মিথ্যা অভিনয় ক'রেছে, সেটি বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হ'য়ে সেই মিথ্যা অভিনয়কে উপেক্ষা ক'রে চলে, তারাই নিঃস্বার্থ কর্ম্ম করে এবং তাদের পক্ষেই ঈশ্বরের সহিত মিলন হওয়া সম্ভব।

প্রতীক্ষার মূল কারণ যে ঈশ্বর—তাঁকে জানা, চেনা এবং উপলব্ধি করার জন্যই বিশ্ববাসী ব্যাকুল। এই প্রতীক্ষমাণদের সহায়তার জন্যই সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের উপদেশ নির্দ্দেশের এত প্রয়োজন।

সংসার ক্ষেত্রেও প্রতীক্ষার প্রয়োজন আছে। যুবকযুবতী পরস্পরের প্রতীক্ষায় দিন গোনে। দারুণ গ্রীষ্মে লোকে প্রতীক্ষা ক'রে থাকে বর্ষার আগমনকে স্বাগত জানাতে, আবার তীব্র শীতে গ্রীষ্মের জন্যও তার প্রতীক্ষার অন্ত নেই। জমির ফসল প্রতীক্ষা ক'রে আছে কবে একটু জল পেলে সে মনের সুখে বেড়ে উঠতে পারে, আবার রবিশস্যের আকুল প্রতীক্ষা সূর্য্যের জ্যোতির জন্য।

জাগতিক ক্ষেত্রেও স্বার্থসিদ্ধির কারণে কত না প্রতীক্ষা! কাজেই প্রতীক্ষা কোথায় নেই? যে কারণের জন্য আমরা প্রতীক্ষায় আছি

সেই কারণকে লাভ করার জন্য যে কর্ম্ম, প্রতীক্ষাই সেই কর্ম্মের প্রেরণা জোগায়। তবে ধৈর্য্যশীল হ'য়ে প্রতীক্ষা করা বিধেয়। প্রতীক্ষার সময় যে চঞ্চল হ'য়ে উঠে বা ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে তার পক্ষে সুফল আশা করা যায় না, কেননা, প্রতীক্ষার মেরুদণ্ডই হ'ল ধৈর্য্য। সুফলের জন্য ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করতে হবে এবং সুচারুরূপে কর্ম্ম সম্পাদন করতে হবে।

সর্ব্বকর্ম্মেই প্রতীক্ষার কারণকে যতক্ষণ কাছে পাওয়া যায় ততক্ষণই শান্তি। প্রতীক্ষার কারণ যদি গুরু বা আরাধ্য হ'য়ে থাকেন এবং তিনি অন্তরে অনুভূত হন তবে তো পরমশান্তি মনে জাগে। সর্ব্বকারণের যে কারণ, তার কারণে, তার জন্য যে প্রতীক্ষা সেটিই হ'ল নিঃস্বার্থ প্রতীক্ষা।

ইন্দ্রিয় চরিতার্থের কারণে যখন আমরা প্রতীক্ষায় থেকে কর্ম্ম করি, সে তো স্বার্থপ্রণোদিত কর্ম্ম, যাতে সাময়িক আনন্দ হ'লেও; নিরানন্দই এর প্রকৃত পরিণাম।

সর্ব্বকেন্দ্রের কেন্দ্রবিন্দু যিনি, তাঁর কারণে যে প্রতীক্ষা করে, সে হ'ল সাধক। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে নিজ স্বার্থসিদ্ধির কারণে যে প্রতীক্ষা করে, সে হ'ল স্বার্থপরায়ণ। সারাটা জীবনই মানুষকে প্রতীক্ষমাণ হ'য়ে কাটাতে হয়। কারণ, প্রতীক্ষা ছাড়া জীবনপথে অচল হ'য়ে যাবে। সেই কারণেই বলা হয়, মানুষ আপেক্ষিক এবং ঈশ্বর নিরপেক্ষ। 'আমি রোজগার করছি, উপার্জ্জিত অর্থ আমার— এই আমিত্ববোধে যে কর্ম্ম করে, তার অর্থ ঘরে এলেও অনর্থ ঘটায়'। আর যে ভাবে সবই তাঁর করুণায় — এই বোধে কর্ম্ম ক'রে গেলে সেখানে কোন অনর্থই ঘটে না।

ইন্দ্রিয়চরিতার্থে বা আত্মচরিতার্থে প্রতীক্ষায় থেকে সেই কারণকে লাভ করার জন্য যখন আমরা স্বার্থপরায়ণ কর্ম্ম করি তাকেই বলা হয় সকাম কর্ম্ম। আর ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কারণ উদ্ধারের জন্য

কর্ত্তব্যপরায়ণ হ'য়ে প্রতীক্ষার কারণকে উদ্ধার করার জন্য সুচারুরূপে কর্ম্ম করাকে বলে নিষ্কাম-কর্ম্ম। সর্ব্বকারণের যিনি ফলদায়ক, তাঁর কারণে কর্ম্ম করাই প্রকৃতপক্ষে নিষ্কাম কর্ম্ম।

'প্রতীক্ষার উপর নির্ভর ক'রেই মানুষ বেঁচে থাকে। আভিধানিক বিশ্লেষণে আশা ও প্রতীক্ষাকে যদিও একই অর্থে ব্যবহার করা হয় তবুও শ্রীমাধবের মতে উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে ; যদিও সেটি অতি সূক্ষ্ম। তিনি বলেন, আশা ও প্রতীক্ষা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, ভাগ ক'রে দেখা বড় কঠিন। তাঁর মতে পিতৃমস্তক থেকে যেদিন সন্তান মাতৃগর্ভে স্থান পায়, সেদিন থেকেই প্রতীক্ষা তার সঙ্গী, আর আশা হ'ল প্রতীক্ষার প্রকাশ, তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে আশা জাগে। আশা মানবজীবনে সবসময় পরিপূর্ণতা আনয়ন করে না। আশা হ'ল তীব্র, তার সঙ্গে লোভ জড়িত আছে তাই যখন তখন গ্রাস করতে চায়। আমার আমার বুদ্ধি যখন পরিপক্কতা লাভ করে তখনই আশা জাগে। আশা ভঙ্গ হ'লে দুঃখ আসে কিন্তু প্রতীক্ষায় দুঃখভোগ সহ্য করতে হয় না। সন্তানের অকাল মৃত্যুতেও প্রতীক্ষাই মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। সুকর্ম্মের মাধ্যমে একদিন না একদিন প্রতীক্ষার জয় অনিবার্য্য।

প্রারব্ধ

এই মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় প্রশ্ন ছিল—প্রারব্ধ কাকে বলে, কিরূপে এই প্রারব্ধ খণ্ডন করা যায় ?

আভিধানিক অর্থে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল যার ভোগ পরজন্মে

শুরু হয় তাকে বলে প্রারব্ধ। শ্রীমাধব বলেন, মানুষের মনুষ্যত্বই হ'ল ঈশ্বরের অভিন্ন সত্তা; এই বোধ যার নেই সে মায়ান্ধকারে পড়ে আছে, মনুষ্যত্বের গুণাবলী তার কাছে সুপ্ত, মনোরাজ্যই তার একমাত্র আবাসস্থল। সঙ্কল্প, বিকল্প ও লাভক্ষতি পরিপূর্ণ মনোরাজ্যে যতদিন সে বাস করে, ততদিন প্রারব্ধ কাটাবার উপায় সে খুঁজে পেতে পারে না। প্রারব্ধ খণ্ডন করতে হ'লে তাকে মনোরাজ্যের অতীত হ'য়ে আত্মরাজ্যের কায়েমী বাসিন্দা হ'তে হবে। আত্মরাজ্যের অধিবাসীর ক্ষেত্রে প্রারব্ধের কোন প্রশ্ন নেই।

শ্রীমাধব বলেন আত্মরাজ্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়; একটি তার জাগতিক ক্ষেত্র আর একটি তার আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র।

জাগতিক ক্ষেত্রে তোমার ছোট্ট সংসারে তুমি কর্ত্তা, তাই তোমার আশ্রিতজনের ভরণ-পোষণ, লালন-পালন করা তোমার কর্ত্তব্য। আবার তুমি যাঁদের আশ্রয়ে আছ যেমন মাতাপিতা, বয়োজ্যেষ্ঠ, শ্রীগুরুদেব প্রভৃতি, তাঁদের সেবা করাও তোমার কর্ত্তব্য। এইটি হ'ল জাগতিক আত্মরাজ্য বা আমার রাজ্য। এই আমার রাজ্যটি হ'ল মনোরাজ্যে আত্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা। আমার রাজ্যে, তুমি যে কর্ম্ম করছ সেটি হ'ল নিজে বেঁচে থাকা এবং আশ্রিতদের বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে। এখানে কোন আতিশয্য নেই, দান ভোগের স্পৃহা নেই, লাভ বা ব্যতিক্রমের প্রশ্ন উঠে না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন চাওয়া পাওয়ার আকাঙ্খাও তোমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে না, এখানে আছে ক্রম এবং কর্ত্তব্য। আমার রাজ্যে যাদের কারণে তুমি কর্ম্ম করছ, তার কোন পরিণাম নেই, তবে পরিণতি আছে। এই পরিণতি হ'ল শান্তি।

এই আমার রাজ্যে থেকে যখন জ্ঞান পরিপক্ক হয় তখন সেই জ্ঞানই তোমায় বুঝিয়ে দেয় যে তুমি ঈশ্বরেরই অভিন্ন সত্তা। সেটিই হ'ল আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের আত্মরাজ্য অর্থাৎ আত্মার রাজ্য।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই পরম সত্যের সত্তা, সবাইকে নিয়েই তিনি, আলাদা ক'রে তাঁর কোন রূপ নেই, তোমার ছোট্ট সংসারের সবার মাধ্যমেই তিনি তোমার সেবা গ্রহণ করেন।

উদ্ভিজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ এই চারিটি জাতির মধ্যে আত্মার প্রকাশ বিকাশ। আরও গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় সারা বিশ্বটাই আত্মরাজ্য। এই বোধে যারা কর্ম্ম করে তাদের কর্ম্মের কোন পরিণাম নেই। কারণ সেখানে কোন চাওয়া পাওয়া নেই কিনা।

কিন্তু মানবমানবী আত্মার রাজ্যের বাইরে আত্মচরিতার্থে যদি কোন কর্ম্ম করে, তবে তার পরিণাম তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হয়। আশ্রিতজনের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আত্মচরিতার্থে যদি মানবমানবী কর্ম্ম করে, তবে তার প্রারব্ধ আছে। এমনকি আশ্রিতের প্রয়োজন উপেক্ষা ক'রে যদি তুমি ঠাকুর সেবাও কর, তারও পরিণাম তোমাকে ভোগ করতে হবে বই কি। সেখানে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা পাবার যোগ্যও তুমি হ'তে পার না।

আত্মরাজ্য ও মনোরাজ্য প্রসঙ্গে শ্রীমাধব একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দেশে এক বাজীকর হঠাৎ বড়লোক হয়। ঘরে বৌ ছিল, তা সত্ত্বেও গ্যালিকা কুসুমাকে নিকা করে। দুই বৌকে, দুটি বাড়ীতে রাখে। বছর দুই মহাসুখে তার কাটে, কিন্তু তারপর যখন সে রিক্তহস্ত, তখন আর কেউ তার খোঁজ করে না।

শ্রীমাধব বলেন, যখন তার ধন সম্পদ ছিল তখন বন্ধুবান্ধবেরও অভাব ছিল না, ইন্দ্রিয় চরিতার্থের খোরাক তারা সমানেই জুগিয়ে গেছে, কিন্তু নিঃস্ব অবস্থায় কেউ কারো নয়। তখন অন্তর্দংশনে সে বিষে বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে উঠে। এইটিই হ'ল আত্মচরিতার্থের পরিণাম।

শ্রীমাধব বলেন, মনোরাজ্যের অধীন হয়ে যে কোন কর্ম্মই তুমি কর না কেন, তার প্রারব্ধ আছে, সেখানে পরিণামের হাত থেকে

তোমার নিস্তার নেই। এর কারণ হ'ল মনোরাজ্যে ইন্দ্রিয় এবং রিপুগণের আধিপত্যই বেশী। মন রাজা হ'লেও সে বড় দুর্ব্বল, আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তার অভাবে সে ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের হাতে ক্রীড়নক। তাই ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের প্রভাবে আত্মচরিতার্থে কর্ম্ম ক'রে সে তার ফল ভোগ করে।

শ্রীমাধব বহুবার বহু আলোচনায় সংসার ধর্ম্মের গুরুত্বের কথা উল্লেখ ক'রেছেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমান যুগে সংসার পরিত্যাগ করা ধর্ম্ম নয়। সংসার ত্যাগ ক'রে, সংসারের কর্ত্তব্যে ফাঁকি দিয়ে এযুগে কিছু করা চলবে না। পুরোপুরি সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করতে হবে, তবেই ধর্ম্ম এবং ন্যায়ের পথের সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীমাধব বলেন, এ যুগে অন্নগত প্রাণ, আগে সংসারের অন্ন যোগাও, তারপর সম্পূর্ণাকে খুঁজবে। সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস নেওয়ার যুগ এটা নয়।

শ্রীমাধব বলেন, তোমার গণ্ডী সংকীর্ণ তাই তোমার কর্ত্তব্য তোমার ছোট্ট সংসারকে ঘিরে কিন্তু বুদ্ধদেব ও মহাপ্রভুর ক্ষেত্রে সারা বিশ্বই ছিল তাঁদের সংসার। সংকীর্ণ সংসার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হ'তে তো তাঁরা আসেন নি, তাই তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তবে এর কোন ক্ষেত্রেই প্রারব্ধ নেই, কেনন দুটি অবস্থাই মনোরাজ্যের অতীত. লাভক্ষতির আওতার বাইরে, তাই পরিণামের প্রশ্নও উঠে না।

শ্রীমাধব বলেন, দেহ ছাড়া আত্মার রাজ্য হ'তে পারে না। আত্মার কোন রূপ নেই। দেহের মাধ্যমেই আত্মার প্রকাশ বিকাশ দৃষ্টমান।

সাধারণ মানবমানবীর প্রায় সাড়ে নিরানব্বই ভাগই প্রারব্ধের মধ্যে রয়েছে, কেননা লাভক্ষতি নিয়েই অমূল্য মানবজীবন তাদের কেটে যায় তারা জানে সংস্কারকে তাদের শ্রদ্ধা করতে হবে কারণ সংস্কার হ'তেও অনেক সময় প্রারব্ধের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু আত্মরাজ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পর আমাদের সকলেরই বোঝা উচিত যে, আত্মরাজ্যে সংস্কারের কোন স্থান নেই। পরিবেশের প্রভাবে বা শিক্ষার মাধ্যমে আমরা সংস্কারে জড়িয়ে প ড।

আত্মরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যে কর্ম্ম আমরা ক'রে থাকি সেটি হ'ল প্রয়োজনের তাগিদে বা কর্তব্যের খাতিরে, সেখানে লাভ, লোকসান বা পরিণামের সম্মুখীন হ'তে হয় না। উপমা স্বরূপ শ্রীমাধব বলেন, সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে মাতা যে আপন বক্ষসুধা পান করান সেটা তো সংস্কার নয়, সেটা তিনি করেন আপন কর্ত্তব্য বোধে।

দেব-দেবীর পূজা, সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের সেবায় যে আতিশয্য, এ সবই আমরা করি সংস্কার বশে। কিন্তু সংস্কার মুক্ত হ'য়ে সেবা পূজা করলেই সেবা পূজার যথার্থ লক্ষ্যবস্তু অন্তর অনুভূতিতে বোধগম্য হয়। এ সংস্কারের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, তবে এ সংস্কার নিয়ে পড়ে থাকলে তো চলবে না। এ সবের অতীত হ'য়ে আত্মরাজ্যে গেলে দেখা যায়, সেখানে মনুষ্যত্বই প্রধান।

শ্রীমাধবের মতে, কর্ত্তব্যবোধে ক্রমের মাধ্যমে যে কর্ম্ম করে তারই ঘরে ভগবান বিরাজ করেন। ক্রমের কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যত্বের গুণাবলী অর্জ্জন ক'রে যে আত্মরাজ্যে অধিষ্ঠিত হ'তে পারে, তাকে তো আলাদা ক'রে ভগবানকে খুঁজবার প্রয়োজন নেই, সে যে তখন তাঁরই সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে আছে।

আত্মচরিতার্থে যারা সারাদিন কর্ম্মে লিপ্ত থাকে, সন্ধ্যাবেলা তারাই 'হরি হরি' করে অর্থাৎ সারাদিন কুকর্ম্মে ব্যাপৃত থেকে সন্ধ্যেবেলা হরিনাম ক'রে নিজেকে ধার্ম্মিক প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা ক'রে। আত্মরাজ্যকে উপেক্ষা ক'রে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভুলে গিয়ে, ক্রমের পথ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে তাই তারা মনোরাজ্যের অধীনে ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের প্ররোচনায় আত্মচরিতার্থে অবলীলাক্রমে অজ্ঞানের ন্যায় গা ভাসিয়ে দিতে অতটুকুও দ্বিধা বোধ করে না।

চঞ্চল জ্ঞান ও স্থিত প্রজ্ঞ

এই মঙ্গলবারে শ্রীমাধব তাঁর আলোচনা-সভায় চঞ্চল জ্ঞান ও স্থিত প্রজ্ঞের পার্থক্য এবং চঞ্চল জ্ঞান থেকে স্থিত প্রজ্ঞে পৌঁছাবার উপায় সম্বন্ধে আলোকপাত করেন।

তিনি বলেন, লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে জাগতিক ক্ষেত্রে মানবমানবী স্বার্থসিদ্ধির কারণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। একই ভাবে প্রকৃত মনুষ্যত্বের গুণাবলী অর্জ্জন করতে এবং ভগবৎ পথে উন্নীত হবার জন্য যদি তারা আন্তরিক ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় অর্থাৎ মনুষ্যত্বহীন কর্ম্ম থেকে তারা বিরত থাকে তবেই বদ্ধ অবস্থা থেকে তারা মুক্ত হ'তে পারে। যদিও কোন প্রতিজ্ঞাই চিরস্থায়ী নয় এবং একটি প্রতিজ্ঞা থেকেই অন্য প্রতিজ্ঞার প্রেরণা জাগে তথাপি ক্রমাগত প্রতিজ্ঞা করতে করতে চঞ্চলতা কেটে গিয়ে অচঞ্চল ও স্থির জ্ঞান তোমার মধ্যে প্রকাশমান হবে। চঞ্চলতাই স্থিত প্রজ্ঞের বিরুদ্ধ ভাব, চঞ্চলতা কেটে গেলে, যে কোন কর্ম্মই তুমি কর না কেন, সেটি সুস্থ ও সুস্থির ভাবে সুসম্পন্ন হয় এবং কখনও মনে অস্থির ভাব জাগে না।

জাগতিক ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান সর্ব্বদাই চঞ্চল, সেই হেতু কোন কর্ম্মই আমরা সুস্থিরভাবে সম্পন্ন করতে পারি না, কাজেই মনের সুস্থতাও কোন সময় আমরা বোধ করি না; সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বদা চঞ্চল ও অস্থির হ'য়ে থাকি। এই চঞ্চল ও অস্থির অবস্থা থেকে আমাদের স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় উন্নীত হ'তে হবে এবং সেই কারণেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীমাধব বলেন, স্থিতপ্রজ্ঞ বলতে একথাই বোঝায় যে, তোমার

আরাধ্য বা গুরুর প্রতি তুমি স্থির বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছ। এই বিশ্বাস থাক্‌লে কখনও তোমাব মনে অস্থিরতা স্থান পাবে না। যদি সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, মঙ্গলময় গুরুর মঙ্গল ইচ্ছা বা বিধানে আমার যা হবার হবে, অস্থির হ'য়েও আমি এর কোন প্রতিবিধান কবতে পারি না, ত.ব আপনা থেকেই অস্থির ভাব কেটে যায়। ছেলে দূরদেশে গেলে, স্ত্রী অসুস্থ হ'লে বা প্রিয়জনের আপদ বিপদেও এই বিশ্বাসই তোমাকে ধীর, স্থির ও অচঞ্চল হ'তে সাহায্য করবে।

শ্রীমাধব বলেন, অহরহ যে জ্ঞানের গর্ব্ব আমবা ক'রে থাকি, সে হ'ল চঞ্চল জ্ঞান তাই সে অস্থিব। অনাদিকালের বহির্মুখতায় যে জ্ঞান আমাদের মনে অ বিপত্য বিস্তাব করে, সে জ্ঞান চঞ্চল বা অস্থির, তার কোন স্থিতি নেই এবং এই অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে যে জ্ঞানের আমরা উত্তরাধিকাবী সেই স্থিতপ্রজ্ঞ তখন থাকে আভাস-রূপে। শ্রীমাধব বলেন, তুমি যদি মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা কব যে, রোজ একঘণ্টা সাধু বা গুরুসঙ্গ করব বা ঠাকুর ঘরে বসব, তবে এই প্রতিজ্ঞাই তোমাকে স্থিতপ্রজ্ঞে নিয়ে যাবে। যতক্ষণ আভাস জ্ঞানে রয়েছ ততক্ষণই যত অস্থিবতা। তাই প্রতিজ্ঞা দ্বারা এই আভাস জ্ঞানকে পার হ'য়ে স্থিতপ্রজ্ঞে যেতে হবে। আভাস জ্ঞান আবার বহু ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বুদ্ধি আর অন্য দশ ভাগ আছে ইন্দ্রিয়গণেব কবলে। এক এক রকম জ্ঞান এক এক ভাবে আস্বাদিত হয়। এই আভাস জ্ঞানকেই আভাস চৈতন্য বলা হয়। এরই মধ্যে আমাদের বাস এবং এই আভাস চৈতন্যের ক্রিয়ায় আমরা অস্থির থাকি। এই জ্ঞানেই আমরা জ্ঞানী ব'লে প্রতিপন্ন হই, কিন্তু এই জ্ঞানের স্থায়িত্ব কতটুকু! দশ বছর থেকে ষোল বছরের মধ্যে এর সুরু এবং পঞ্চাশ বা ষাট বছর পর্যন্তই তার মেয়াদ, তারপরেই স্থবিরত্ব এসে যায়। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ কখনও স্থবির হ'তে পারে না, তার প্রমাণ স্বরূপ দেখা যায় দু'শ, আড়াইশ বছর বয়সের সাধু-

সন্তগণও স্থিতপ্রজ্ঞে অচঞ্চল হ'য়ে আছেন। প্রতিজ্ঞা দ্বারা এই আভাস চৈতন্যের মাধ্যমেই স্থিতপ্রজ্ঞে যাওয়া যায়। প্রমাণ স্বরূপ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করা যায়। ভীষ্ম তাঁর প্রতিজ্ঞার যথাযথ মান রক্ষা ক'রেছিলেন, তাই ভীষ্মকে বলা হয় আভাস চৈতন্য। পূর্ণচৈতন্য হ'ল স্থিতপ্রজ্ঞ, সেই চৈতন্যে যেতে পারলে সমস্ত অস্থিরতা, স্থির হ'য়ে যায়।

আভাস চৈতন্যটি হ'ল মনোরাজ্যের খেলা, প্রারব্ধ তো সেখানে থাকবেই; আর স্থিতপ্রজ্ঞ হ'ল আত্মরাজ্যের খেলা, সেখানে আছে স্থিতি স্থাপকতা। মনোরাজ্য বা আভাস চৈতন্যে সুখ মেলে কিন্তু শান্তি মেলে না। আত্মরাজ্যে শান্তি মেলে, সেখানে তো সুখের কোন প্রশ্ন নেই, কেন না সেখানে মনোরাজ্যের কোন ক্রিয়াকলাপই নেই। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়ে মনোরাজ্যটিকে আমাদের সমর্পণ করতে হবে আত্মরাজ্যের হাতে, তবে সেই রাজ্য তাঁর ইচ্ছাতেই পরিচালিত হবে। চঞ্চল জ্ঞান থেকে স্থিতপ্রজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এইটিই হয়তো সর্ব্বাপেক্ষা সহজ এবং সম্ভাব্য পথ।

আলোচনা সভায় প্রশ্ন উঠেছিল যে অবতারগণ স্থিতপ্রজ্ঞ হ'য়েই জন্মগ্রহণ করেন কিনা। একথার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, অবতার কথাটি সাধারণ মানবমানবীর অবতারণা মাত্র। মনুষ্যত্বের গুণাবলীর প্রকাশ বিকাশ লক্ষ্য ক'রে তোমরাই কাউকে কাউকে অবতার তৈরী কর। যাঁকে তোমরা অবতার তৈরী কর, এ প্রশ্নের উত্তর তিনিই দিতে পারেন, তবে অবতার কি কখনও বলেন যে তিনি অবতার পুরুষ? যাঁকে তুমি অবতার তৈরী ক'রেছ, তাঁকে তুমি অবতার ব'লে মানলেও অন্যে তো না—ও মানতে পারে? জোর ক'রে কি কাউকে কিছু মানান যায়? কাজেই অবতার কথাটি বাদ দিয়ে চিন্তা করাই তো ভাল। তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'ল নিজের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলা। চঞ্চল জ্ঞানই আমাদের জীবনপথকে বিশৃঙ্খল ভাবে

চালাবার জন্য দায়ী। স্থিরভাবে একটি পা-ও আমরা ফেলতে পারি না, টলমল করি। তাছাড়া যে মনোরাজ্যের আমরা অধিবাসী, সে নিজেই তো সঙ্কল্প বিকল্পময় এবং চঞ্চল। তার রাজ্যে বাস ক'রে আমরা কি অচঞ্চল হ'তে পারি? কাজেই যত শীঘ্র পার, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়ে এই রাজ্যেই আত্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর।

গুরুই বাণী—বাণীই গুরু এই প্রসঙ্গে শ্রীমাধব বলেন, গুরুর কোন দেহও নেই, কোন রূপও নেই। গুরুরূপে যে রূপটি তুমি সম্মুখে পেয়েছ তবে সেটি কি? তার অর্থ হ'ল, তুমি লক্ষ ভ্রষ্ট হ'য়েছ, সেই অবস্থায় দেহোপযোগী দেহের মাধ্যমে যাঁকে পেলে তাঁর মাধ্যমে তোমার লক্ষ্যস্থির হবে। কি ভাবে তা হ'তে পারে? গুরুর বাণীতেই তা হওয়া সম্ভব, সেই অর্থেই বলা হয় বাণীই গুরু, গুরুই বাণী অর্থাৎ তাঁর উপদেশ নির্দ্দেশ অনুকরণ ও অনুসরণ করতে হবে।

গুরুর বাণীতে আলো এবং অন্ধকার দুই-ই লুকিয়ে আছে। সেটি কি রকম? গুরুবাণীতে যদি বিশ্বাস না আসে, নির্ভরতা না জাগে তবে সর্ব্বনাশা অন্ধকারে তুমি তলিয়ে যাবে, আর তাঁর বাণীতে দৃঢ় বিশ্বাস ও পূর্ণ নির্ভরতা এলে তুমি আলোর সন্ধান পাবে এবং গুরুবাণী থেকে যত বাণী সৃষ্টি হ'য়েছে সবই তোমার মধ্যে জেগে উঠবে। গুরুবাণী অনুকরণশীল হ'য়ে তুমি জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পার, আবার এই বাণীকে অবজ্ঞা ক'রে তুমি অতল তলে তলিয়ে যেতেও পার। কাজেই এমন বাণীই উচ্চারিত হওয়া উচিত, যে বাণী গুরু অর্থাৎ বর। বাণী যেন সর্ব্বত্র শ্রেষ্ঠত্বের আসন দাবী করতে পারে।

আলোচনা সভায় আরও একটি প্রশ্ন উঠেছিল; সেটি হ'ল—শ্রীমাধব যে সর্ব্বদা ক্রমের পথের নির্দ্দেশ দেন, ঈশ্বর-মিলনে এইটিই কি একমাত্র পথ?

শ্রীমাধব এই প্রসঙ্গে বলেন, ক্রমের পথটিই একমাত্র সর্ব্বভাবে,

সর্ব্বত্র, সর্ব্বজনগ্রহণযোগ্য পথ। একথার অর্থ হ'ল, যে পথই তুমি গ্রহণ কর না কেন, ব্যতিক্রমকে দূরীভূত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্যতিক্রমকে দূর করতে হ'লে ক্রমের পথ ধরেই তোমাকে এগোতে হবে। স্বধর্ম্ম পালন করাকেই বলে ক্রম। পরধর্ম্ম গ্রহণ করাই হ'ল ব্যতিক্রম। তুমি মানুষ, মনুষ্যত্বই তোমার ক্রম, মানুষ হ'য়ে পশুর ধর্ম্ম গ্রহণ করাই তোমার পক্ষে ব্যতিক্রমের কাজ করা হবে। জরায়ুজ হ'য়ে অণ্ডজ বা স্বেদজর ধর্ম্ম গ্রহণ করা অবশ্যই ব্যতিক্রম। সংস্কারে আবদ্ধ হ'য়ে আমরা এই ক্রম ব্যতিক্রমের অর্থকে অতি সংকীর্ণ ভাবে চিন্তা করতে শিখেছি, তাই ভাবি, আমি বৈষ্ণব, আমাকে কেবল কৃষ্ণ নামই করতে হবে, বা আমি শাক্ত, শুধু কালী নাম করার অধিকারই আমার আছে, কিংবা আমি মুসলমান, তাই আল্লা ছাড়া আর কোন নামই আমি মুখে আনতে পারি না, এবং স্বধর্ম্ম বলতে এ ভাবেই আমরা চিন্তা ক'রে থাকি।

প্রকৃতপক্ষে আমরা যে মানুষ এবং মানবিকতাই যে আমাদের স্বধর্ম্ম সেকথা আমরা ভুলে গেছি। মানুষের অবয়ব গ্রহণ ক'রে আমরা জন্মগ্রহণ ক'রেছি বটে কিন্তু আমাদের মনুষ্যত্ব গেছে হারিয়ে এবং সেটাই হ'ল আমাদের জীবন-পথে ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রম থেকে উদ্ধার পেতে হ'লে অর্থাৎ ক্রমে অনুসৃত হ'লে আমাদের মনুষ্যত্বকে ফিরে পেতে হবে; সে কারণেই বিশ্বে যত ধর্ম্ম, এত মত ও পথের সৃষ্টি হ'য়েছে। মনুষ্যত্ব ফিরে পাওয়াই ক্রম, অমানুষ হওয়াটাই ব্যতিক্রম। যে ধর্ম্ম, যে মত, যে পথই তুমি গ্রহণ কর না কেন তাতে কোন ক্ষতি নেই তবে মনুষ্যত্ব তোমাকে ফিরে পেতেই হবে। ক্রমে চলতে না পারলে কেউ মনুষ্যত্ব ফিরে পেতে পারে না, কেননা এরা যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, তাই ক্রমে চলার নির্দ্দেশই সাধু, মহাপুরুষগণ দিয়ে থাকেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পার্থিব দুঃখকষ্টে স্থিতপ্রজ্ঞের প্রতিক্রিয়া

মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক শিষ্যের প্রশ্ন ছিল—স্থিতপ্রজ্ঞের অধিকারী যিনি তাঁর উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পার্থিব দুঃখকষ্ট বা মনুষ্যত্বের অবমাননা কোন প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে কি?

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, তোমরা যে সমস্ত আলোচনা পড় বা শোন তার পরিপ্রেক্ষিতেই তোমাদের মনে নানারকম প্রশ্ন জেগে উঠে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা স্থিতপ্রজ্ঞ কথাটি প্রয়োগ ক'রে থাকি, তাই মনে হয় ব্যক্তি বিশেষই কেবল এই জ্ঞানের অধিকারী হ'তে পারেন প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি মানবমানবীই সকল প্রকার জ্ঞানের অধিকারী, কারুর মধ্যে সে জ্ঞান জাগ্রত হ'য়ে উঠে, আবার কারুর মধ্যে বা থাকে সুপ্ত অবস্থায়, কিন্তু সবার ভাণ্ডেই সব জ্ঞান রয়েছে। অনাদিবহির্মুখতার কারণে সে জ্ঞান আমরা বিস্মৃত হ'য়েছি, তাকে স্মৃতিপথে আনার জন্যই আমাদের একাগ্র সাধনার প্রয়োজন, তবেই সেই সুপ্ত জ্ঞানের পুনরধিকার সম্ভব হবে এবং সেই জ্ঞান জাগ্রত হ'লে দুর্লভ এই মানব জীবন সার্থকতায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠবে। তিনি বলেন, স্থিতপ্রজ্ঞের ক্ষেত্রে অধিকারী কথাটি প্রযোজ্য নয়। যে জ্ঞান শিখতে হয় বা শিখে অন্যদের শেখাতে হয় সেখানে জ্ঞানের অধিকারী কথাটি বলা চলে কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ হ'ল শাশ্বত প্রজ্ঞা বা জ্ঞান যা জন্ম জন্মান্তর থেকে চৈতন্যশক্তির মাধ্যমে আমাদের জীবনস্রোতে প্রবাহিত হ'চ্ছে; যে জ্ঞান অমর, অক্ষয়ী, অবিনাশী, সত্যের সঙ্গে যার অভিন্ন সম্পর্ক। আমাদের মধ্যে যে চৈতন্যশক্তি আছে তার থেকেই বোধশক্তির ও শাশ্বত জ্ঞানের প্রকাশ। এই চৈতন্যশক্তির সাহায্যেই আমরা দেখি, শুনি, বুঝি, আস্বাদন করি

এবং স্পর্শ করি। চৈতন্য থেকেই যদি সব কিছুর বিকাশ, প্রকাশ হয়, তবে এই চৈতন্যশক্তিই তো সর্ব্বকর্ম্মের মূল বা উৎস।

সাধারণভাবে মনে হয় আমার বুদ্ধি দ্বারা, আমার জ্ঞান দ্বারাই সব কিছু হ'চ্ছে কিন্তু সেকথা ঠিক নয়; সবই হ'চ্ছে চৈতন্যশক্তির সহায়তায়। স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থে সেই জ্ঞানকেই বোঝায়, যে জ্ঞান উদয় হ'লে কোন কিছুতেই মানবমানবী বিভ্রান্তিতে পড়ে না। ভূমিকম্পে পাহাড় পর্ব্বত টলটলায়মান হ'লেও স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সুখ দুঃখ কোন অবস্থাতেই বিহ্বল হ'য়ে পড়ে না সর্ব্বাবস্থায়ই সে থাকে ধীর, স্থির।

শ্রীমাধব বলেন, প্রশ্নটি ছিল—স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ টলাতে পারে কিনা বা সে এর কোন প্রতিকারে এগিয়ে আসে কি-না. তিনি বলেন, জগতের কল্যাণ করবার অধিকার বা ক্ষমতা কোন মানুষের নেই—জগতের কল্যাণ সাধন করতে পারে একমাত্র সত্য। জগৎকল্যাণে সত্য মানুষকে মাধ্যম বা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। যে মানবমানবীর মধ্যে নিত্যসত্যের প্রভাব বেশী, আর্ত্তজনের দুঃখ দুর্দ্দশায় তাদের মনে বেদনা অনুভূত হয় এবং তা দূর করবার ইচ্ছা জাগে। আবার যাদের মধ্যে রজঃ ও তমের প্রাধান্য তারা এসব দেখে ভ্রূক্ষেপও করে না। এখানে সত্য বলতে চৈতন্যের কথা বলা হ'চ্ছে। চৈতন্যকে জানার জন্যই স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন, সেখানে কোন চঞ্চলতা বা অস্থিরতার স্থান নেই। মলিনতা যেখানে রয়েছে সেখানে নিত্যসত্যের প্রকাশ বিকাশ জোরদার হ'তে পারে না। সত্ত্বগুণের প্রাধান্য যার মধ্যে আছে, তার হৃদয়ও নির্ম্মল এবং সেখানেই নিত্যসত্যের প্রকাশ বিকাশও উজ্জ্বল; কিন্তু রজঃ ও তমের ক্ষেত্রে নিত্যসত্য স্তিমিত। কাজেই প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির নিজ ইচ্ছায় কোন প্রতিকার করার ক্ষমতা নেই তবে তার হৃদয় ধীর, স্থির ও নির্ম্মল ব'লে

সত্ত্বগুণের প্রভাব তার উপর বেশী থাকে এবং নিত্যসত্য জগতের যে কল্যাণ সাধন করে, অনেক সময় সে তার মাধ্যম হ'য়ে থাকে।

এই নিত্যসত্য ও কূটস্থ চৈতন্য সম্বন্ধে নানা উপমার সাহায্যে শ্রীমাধব আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, আমরা শুনে থাকি বা কখন কখন নিজেরাও বলি, 'সাধুর ঐশ্বর্য্য শুধু পরহিত তরে'। কিন্তু কোন সাধু মহাপুরুষের মুখে কি এই উক্তি কখনও শোনা যায়? যায় না। কেননা তিনি অতি উত্তমরূপেই এটি অনুভব করেন যে, তাঁর মধ্যে যত কিছু প্রকাশ বিকাশ হয়েছে তাতে তার নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নেই, সবই সম্ভব হ'য়েছে একমাত্র নিত্যসত্যের গুণে। সত্যিই তো তাঁর কোন গুণ নেই, তিনি একটি ভাণ্ড বা আধার মাত্র। ভাণ্ড বা আধারের কি অভিমান করা সাজে? দধি ভাণ্ডের আদর ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ তাতে দধি আছে, দধি যখন ফুরিয়ে যায় তখন কি আর কেউ ভাণ্ডের আদর করে? তখন তার স্থান হয় আস্তাকুঁড়ে; তেমনি সাধুর আদর ঐ ঐশ্বর্য্যের গুণে, যে ঐশ্বর্য্য এসেছে নিত্যসত্য থেকে।

এই সত্যের প্রকাশ বিকাশ হয় মানবমানবীর মনুষ্যত্বের মাধ্যমে। যার মনুষ্যত্ব সুপ্ত অবস্থায় থাকে তার মধ্যে সত্যের প্রকাশ বিকাশের কোন সাড়া জাগে না। মানবমানবীর সামান্য দেহ-কোটরের মাধ্যমে নিত্যসত্য ঈশ্বরের প্রকাশ বিকাশ দেখে আমরা তাঁকে কূটস্থ চৈতন্য ব'লে থাকি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্ব্বব্যাপী। কোটর বা মণ্ডল ছাড়া তাঁর প্রকাশ বিকাশের দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

এই কারণেই শ্রীগুরুদেবকে বলা হয় অখণ্ডমণ্ডলাকার এবং গুরুপ্রণামের সময় শিষ্যের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, 'হে গুরুদেব! তুমি অখণ্ডভাবে অনন্তজগৎ পরিব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছ এবং নিজ মহিমাগুণে আমার এই ছোট্ট দেহ-মণ্ডলেও বিরাজ করছ, তোমাকে প্রণাম করি।'

কূটস্থ চৈতন্য বলতে একথাই বোঝা উচিত যে, হস্তপদদ্বয় থেকে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তিনি বিরাজমান কিন্তু আমরা শুনে থাকি বক্ষের মধ্যস্থলে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পরিসরে তিনি বিরাজমান। বিজ্ঞানের যুগে মানুষের পক্ষে একথা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

এই বিশ্বের অনন্ত মণ্ডলে তিনি রয়েছেন—মণ্ডলের মধ্যে তাঁর লীলার প্রকাশ আর মণ্ডলের বাইরে তিনি বিশ্বকূটে বিরাজমান।

আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমাধব বলেন, এই নিত্যানন্দ্য ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে অনুভব করা যায়, কিন্তু প্রকাশ করা যায় না। ব্রহ্ম যিনি সমস্ত অস্তিত্বের অতীত, তাঁকে যে যতটুকু অনুভব করে বা অন্তর্দৃষ্টিতে দর্শন ক'রে প্রকাশ করতে যায় তখন তা আর ব্রহ্ম থাকে না, ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হয় কারণ ব্রহ্মের প্রকাশই যে ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি ব্রহ্ম হলেও কিন্তু ব্রহ্মকে আমরা দেখতে পাইনা।

ব্রহ্মের প্রকাশ বিকাশ রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে আমরা মানবমানবীগণ বিভিন্নরূপ কর্ম্ম ক'রে থাকি। বিভিন্নরূপ কর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যও বিভিন্ন।

মনুষ্যত্বের প্রকাশ বিকাশ ও আত্মপ্রকাশের কারণে বা নিজেকে, ব্রহ্মকে ও প্রপঞ্চকে জানার কারণে যখন মানবমানবী কর্ম্ম করে তাকে বলে পরম কর্ম্ম।

যে কর্ম্মের সাহায্যে দুষ্কৃত কর্ম্মের মধ্যে পড়েও নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তার নাম সুকর্ম্ম। যে কর্ম্ম করলে মনুষ্যত্ব লোপ পায় তাকে দুষ্কর্ম্ম বলা হয়। এমন যে কর্ম্ম যার জন্য লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে আরও অন্যায় কর্ম্মে আমরা প্রলুব্ধ হই তার নাম কুকর্ম্ম। যে কর্ম্মে নিজের কোন লাভক্ষতি নেই অথচ অপরকে ঠকান বা দুঃখ দেওয়া হয় তাকে বলে বিকর্ম্ম। আবার জীবনপথে লাভবান হওয়ার জন্য বা উপার্জ্জনশীল হওয়ার জন্য যে সকল কর্ম্ম আমরা ক'রে থাকি, তার নাম বিষয়কর্ম্ম। শ্রীমাধবের উপদেশ হ'ল,

সংসার জীবন সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করতে হ'লে বিষয়কর্ম্ম প্রত্যেক মানবমানবীকেই করতে হবে; তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, সে কর্ম্ম যেন প্রয়োজনে করা হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা ক্রমের পথেই সমস্ত বিষয় কর্ম্ম ক'রে থাকেন তাই তাঁদের সংসার জীবন কখনও বিষময় হ'য়ে উঠেনা।

আমরা ভাব যে; সাধু, মহাপুরুষগণের মাধ্যমে আমাদের দুঃখ কষ্ট ভগবানকে জানাতে পারলে আমরা শান্তি পাব, কেননা তারা ইচ্ছা করলে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পার্থিব দুঃখকষ্ট ও বিপর্যায়কে দমন ক'রে জগতের কল্যাণ সাধন করতে পারেন। শ্রীমাধব বলেন, এ সমস্ত কথা আমাদের বিষাদে সান্ত্বনা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কিছুই করতে পারেন না। সত্যই একমাত্র জগৎ কল্যাণের কর্ত্তা এবং তাঁদের মাধ্যমে তিনি ক্রিয়মাণ হন।

শ্রীমাধব বলেন, ভগবানের অহেতুক কৃপার কথা আমরা শুনে থাকি। তার অর্থ হল, জন্মগ্রহণ করে আমরা কি করে বেঁচে থাকব তার সমস্ত সুব্যবস্থা তো তিনি আমাদের জন্মের আগেই ক'রে রেখেছেন। আমার চলন, বলন, ক্রিয়াকর্ম্ম সব কিছু যে তাঁরই কৃপায় সম্ভব হ'য়েছে। তাঁর এই অপার করুণার হেতু আমরা খুঁজে পাই না, তাই বলি, তাঁর অহেতুক কৃপা।

শ্রীমাধব বলেন, পাহাড থেকে জল যখন গডিয়ে পড়ে তখন তা থাকে নির্ম্মল, পাহাডের নীচে এসে সে মলিন হয়, সেইরূপ জন্মমুহূর্ত্তে মানবশিশুও নির্ম্মল এবং পবিত্র থাকে কিন্তু পরিবেশের প্রভাবে সে মলিন হয়ে উঠে। জলকে জীবাণুবর্জ্জিত ক'রে পান করতে হ'লে যেমন শোধন ক'রে নিতে হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মানবমানবীর শোধন প্রক্রিয়া সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের মাধ্যমে জেনে নিতে হয়। কিন্তু মানবমানবী শোধনের পথে না গিয়ে অর্থাৎ পরমকর্ম্ম না ক'রে দুষ্কর্ম্ম, কুকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ইত্যাদি করে কর্ম্মের ভোগে

পড়ে। প্রকৃষ্ট জ্ঞান উদয় হ'লে অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ হ'তে পারলে, আমার আমার অস্তিত্ববোধ চলে গিয়ে দেখবে, তুমি কিছুই করছ না, সবই তিনি করছেন এবং ভোগ যা হ'চ্ছে তাও তাঁরই, কেননা তুমি ও তিনি যে অভিন্ন। শ্রীমাধব বলেন, এখন এইটি পরিষ্কার হ'ল যে নিত্যসত্য বা চৈতন্যই সব কিছুর উৎস এবং তাঁকে প্রকৃষ্টভাবে অনুভব করাকেই হৃদয়ঙ্গম করা বলে।

কৃপা প্রসঙ্গে শ্রীমাধব আজ একটি অশ্রুত তত্ত্ব সভায় পরিবেশন করেন। তিনি বলেন, জনৈক ভক্ত ব্যক্তি প্রশ্ন করে, শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন—তিনি কৃপা না করলে এক পা-ও বাড়াতে পারবে না, একথার অর্থ কি?

উত্তরে আমি বলি,—শ্রীশ্রীঠাকুর কি কখন ভুল কথা বলতে পারেন? শ্রীশ্রীঠাকুর ঠিক কথাই তো বলেছেন। এখানে 'তিনি' বলতে ঈশ্বর নন। তাই যদি হয়, তবে তো ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব দোষে দোষী হবেন। এখানে তিনি বললে বুঝতে হবে, তোমার চলার পথে বৈরী যারা তাদের অর্থাৎ রিপুদেরকে। এরা কৃপা না করলে কিছু হবে না। প্রশ্ন উঠে এদের কৃপা পাওয়া যায় কি ক'রে? তার উত্তর হ'ল রিপুদের খোরাক ঠিকমত যোগাতে হবে। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই হ'ল রিপুদের খোরাক তাই তাদের খোরাক তাদের দিয়ে তুমি তোমার পথে নির্বিঘ্নে চলে যাও। উপমা স্বরূপ তিনি বলেন, চোর যেমন চুরি করতে গেলে ট্যাঁকে খাবার বেঁধে নিয়ে যায়, এও তেমনি। গৃহস্থের কুকুরেরা যদি ঘেউ ঘেউ করে তবে তো চুরি করা যাবে না। তখন কুকুরের সামনে খোরাক ফেলে দিলে তারা মনের আনন্দে খেতে থাকবে এবং চোরও সর্ব্বস্ব চুরি ক'রে পালাবার সুযোগ পাবে, তেমনি যে রিপুগণ তোমার চলার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে তাদের খোরাক দিয়ে শান্ত ক'রে রাখ। এখানে ষড়রিপুর খোরাক বলতে শ্রীমাধব বিভিন্ন মূর্ত্তি বা রূপের মাধ্যমে রূপাতীতে যাওয়ার

নির্দ্দেশ দিয়েছেন। রূপের মধ্যে পড়ে থাক্‌লে তো তোমার চলবে না। তুমি যখন একটি রূপের ধ্যান কর তখন রিপুগণ তোমার ধ্যানের রস আস্বাদন ক'রে এবং যতক্ষণ এই রিপুগণ চঞ্চল থাকে ততক্ষণ তারা নানা রূপের খেলা তোমার মধ্যে জাগাবার চেষ্টা করে কিন্তু যখন রিপুগণ তোমার আরাধ্যের রসে মজে যায়, তখন আর তারা তোমার প্রতিবন্ধক হয় না। এইভাবে আরাধ্যের রসে মজে যাবার খোরাক তাদের দিতে হবে, তবেই তুমি রূপাতীত অবস্থায় চলে যেতে পারবে। প্রথমে আসে ধারণা তারপরে ধ্যান। ধারণার সময় তোমার ইন্দ্রিয়ের বিষয় হ'ল একমাত্র আরাধ্য। যখন আরাধ্যই একমাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় তখন রিপুগণ শুধু পদ্মরস আস্বাদন করে। যে রিপুগণ এতদিন তোমার উপর প্রভুত্ব ক'রে এসেছে, তারাই একটু পদ্মমধুর আশায় তখন তোমার দাস হ'য়ে থাকবে। এই আশাকে লোভ না বলে স্পৃহা বলাই সমীচীন।

শ্রীমাধব বলেন, ইন্দ্রিয়ের বিষয় রস হ'ল গোবরের রস। এই গুবরেপোকারূপ ইন্দ্রিয়গণ যদি একবার পদ্মমধুর আস্বাদন পায়, তবে তারা আর কখন গোবরে মুখ দেবেনা।

রিপুগণকে এরূপ কৌশলে দমন করার জন্যই তোমাদের যত সাধ্যসাধনা, যত ধ্যান ধারণা। ভগবানকে পাবার জন্য কোন সাধ্যসাধনার প্রয়োজন নেই, নিজেকে নির্ম্মল কর, পবিত্র কর, তিনি তো নিত্যসত্যরূপে তোমার অনন্তকালের সাথী হ'য়েই আছেন, তাঁকে পাবার জন্য আবার সাধনা কিসের? রিপুগণের কবলে পড়ে অন্ধকার কারাগারে আমরা পচে মরছি এবং আমি যে তাঁর অভিন্ন সত্তা-সেকথা ভুলে গেছি। কারামুক্ত হ'লেই দেখা যাবে তুমি, আমি সবাই তাঁর কাছেই আছি। ভগবান প্রাপ্তির বস্তু হ'লে তা হারিয়ে যেতে পারে বা লাভ করার বস্তু হ'লে ক্ষতি হতে পারে।

ভগবান ও আমি যে অভিন্ন, তাই তাঁকে পাবার জন্য সাধ্যসাধনা

করতে হবে কেন? শ্রীমাধব বলেন, যে রিপুগণ ভগবান ও তোমার মধ্যে ভেদভাব এনে দিয়েছে, খোরাক দিয়ে তাদের দমন কর তবেই ভেদভাব ঘুচে যাবে। খোরাক পেলেই তারা প্রভুভক্ত ভৃত্য হ'য়ে উঠবে।

চৈতন্যরূপে ভগবান নিষ্ক্রিয়। চৈতন্য যখন ক্রিয়মাণ হয় তখন তাকে বলে চেতনা। চৈতন্য হ'ল পুরুষ আর চেতনা প্রকৃতি। শ্রীমাধব বলেন, তোমাদের কোন কর্ম্মেই বাধা দিচ্ছিনা, তবে যে কর্ম্মই কর না কেন সেটি পবিত্রভাবে কর অর্থাৎ ক্রমের পথে কর, ক্রমটাই তাঁর লীলা। ব্যতিক্রমে কিছু ক'রোনা, ব্যতিক্রমটিও তাঁর লীলা বটে তবে সেখানে প্রারব্ধ বা পরিণামের কবলে পড়তে হবে, কিন্তু ক্রমের পথে কোন প্রারব্ধ বা পরিণাম নেই। তত্ত্বের প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করতে হবে, ভাষ্যকারের ভাষায় তাকে বুঝতে গেলে ভেসে যেতে হয়।

অকাল বোধন

মঙ্গলবারের আলোচনা সভায় শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক ভক্তের ক্ষোভকে কেন্দ্র ক'রে শ্রীমাধব সেটিকে প্রশ্নাকারে সভার সামনে উত্থাপন করেন। প্রশ্নটি হ'ল—রাবণকে বধ করার জন্য শ্রীরামচন্দ্র যে রাবণকে দিয়ে অকাল বোধন করালেন, তাতে আমরা কি শিক্ষা পেলাম? সীতার বনবাস, বালীহত্যা, কাব্যের উপেক্ষিতা উর্ম্মিলা ইত্যাদি কাহিনীর তাৎপর্য্য কি?

শ্রীমাধব বলেন, শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে দিয়ে অকালবোধন

করিয়েছেন সে কথা সত্য। কালবোধনের সময় হ'ল বসন্তকাল চৈত্রমাস আর অকালবোধন হ'ল শরৎকালে। এর তাৎপর্য্য কি? একই দুর্গামূর্ত্তি তবে দুই বিপরীত নামে কেন বলা হয়? এর কারণ হ'ল, মানুষ যেমন দিনের বেলা জেগে থাকে এবং রাতে নিদ্রা যায়, শাস্ত্রমতে দেবতারাও তেমনি বছরের ছ'মাস জাগ্রত থাকেন এবং ছ'মাস নিদ্রিত থাকেন। কার্ত্তিক মাসের উত্থান একাদশী থেকে দেবতারা জেগে থাকেন। জাগ্রত অবস্থাটি হ'ল মানুষের জীবনপথ পরিচালনার একটি সুষ্ঠু সময় অর্থাৎ এ সময় তার মনুষ্যত্ব জাগ্রত হ'য়ে উঠে এবং এ অবস্থায় সে যে কর্ম্ম করে সেটি সুকর্ম্ম, তাই এই কালটিও তার পক্ষে সুকাল। আবার যখন তার মনুষ্যত্ব সুপ্ত অবস্থায় থাকে, তখন সে যে কর্ম্মই করুক না কেন সেটিই দুষ্কর্ম্মে পরিণত হয়, তাই সেই কালটি তার পক্ষে অকাল। এ হ'ল মনুষ্যত্বহীন নিদ্রিত অবস্থা—তাই মানুষের পক্ষে অকাল।

অকালবোধন দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র জগৎবাসীকে এই শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, আর কতকাল তোমরা অজ্ঞান অন্ধকারে নিদ্রিত থাকবে? তোমাদের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোল। এ সময় দেবীর পূজা ক'রে, শক্তির আরাধনা ক'রে মনুষ্যত্বের বলে বলীয়ান হ'য়ে উঠ। কেন না মহাপ্রতাপশালী রাবণ তোমাদের ধ্বংস করার জন্য যে উন্মুখ হ'য়ে আছে। নিদ্রিত থাকলে ধ্বংস যে তোমাদের অনিবার্য্য। ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে হ'লে, রাবণকেই আগে ধ্বংস করতে হবে। রাবণ অর্থাৎ আসুরিক শক্তি কখনও নিদ্রা যায় না, সদা জাগ্রত থেকে অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তাই শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে দিয়ে অকালবোধন করালেন। কেননা, অকালবোধন ক'রে মহাশক্তির আশীর্ব্বাদে তোমাদের মনুষ্যত্ব কখনও স্তিমিত হবে না এবং তোমরা সর্ব্বযুদ্ধে জয়ী হ'তে পারবে।

তিনি বলছেন, আমাদের দেহরাজ্যে স্বর্গ—মর্ত্ত্য—পাতালের

রাজা হ'ল মহাপ্রতাপশালী কাম। তার দশটি মাথা এবং কুড়িটি হাত। কামের দশটি মাথা দশদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে রাজ্য পরিচালনা করছে এবং তার কুড়িটি হাত দ্বারা মনুষ্যত্বের বিংশতি প্রকার গুণাবলীকে জাগ্রত হ'তে অনুক্ষণ বাধার সৃষ্টি করছে। আসুরিক শক্তির এই অপপ্রয়োগে শ্রীরামচন্দ্রের মনে বিষাদ জেগেছিল, তাই তিনি কামরূপী রাবণকে দিয়েই অকালে দেবীর বোধন করালেন। আত্মবলীদানের কারণে রাবণ যখন শক্তির উপাসনা করে তখন সে নৃশংস রাক্ষস নয়, উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ বা দেবতার সমতুল্য।

কাম অর্থাৎ কামনা যখন বিষয় কামনা করে তখন সে দানব, যখন রতি কামনা করে তখন রাক্ষস। আবার সেই কামনাই যখন ভগবানকে কামনা করে তখন সে ব্রাহ্মণের পর্যায়ে উন্নীত হয়। কামনা জানে, এই অকালবোধনে তাকেই আত্মাহুতি দিতে হবে। তবু সে পূজা করে। বশিষ্ঠ নিধন যজ্ঞে বিশ্বামিত্র যেমন বশিষ্ঠকেই যজ্ঞের হোতা ক'রেছিলেন এবং সব জেনে শুনেও বশিষ্ঠদেব ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণের জন্য সেই যজ্ঞে পৌরহিত্য করতে রাজী হ'য়েছিলেন, তেমনি নিধন হ'তে হবে—একথা নিশ্চিত জেনেও কামরূপী রাবণ দেবীর অকালবোধন করে, তাই সে ব্রাহ্মণতুল্য। দেবীর অকালবোধন দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র জগৎবাসীকে এ শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন যে, যদি নিষ্কাম হ'তে চাও তবে কামনাকে দিয়ে দেবী পূজার পৌরহিত্য করাও। মায়ের পূজা যখন করে তখন রাক্ষসও পবিত্র হয়, দানবও ব্রাহ্মণে পরিণত হয়। কামনা দেবীপূজায় আত্মাহুতি না দিলে, বিশ্বে কেউ নিষ্কাম হ'তে পারে না।

সারাজগতের মানবমানবী যাতে ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারে, বা তারা যে ঈশ্বরেরই আত্মসত্তা—সে অনুভূতি তাদের আসে, সেজন্যই শ্রীরামচন্দ্র রাবণরূপী কামনাকে দিয়ে দেবীর অকালবোধনে

পৌরহিত্য করিয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র দেখিয়ে গেছেন যে, নিষ্কাম না হওয়া পর্যান্ত সেই নিরঞ্জনকে লাভ করা যায় না। যত পূজা, অর্চ্চনা, বা প্রার্থনাই কর না কেন, তোমার এই পবিত্র যজ্ঞের হোতা হ'তে হবে কামনাকে, তা নইলে নিষ্কাম হবে কি ক'রে? বিভিন্ন ধর্ম্মে যথা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেই নিষ্কাম হবার জন্য বিভিন্নভাবে কামনাই পৌরহিত্য করছে। তাই চিন্তার গভীরে গেলে বোঝা যায়, কামনা কত মহৎ, কত উদার। আত্মাকে জাগাবার জন্য নিজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'তেও সে কুণ্ঠিত নয়।

শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে স্থান পাবার জন্যই তো রাবণের সারাজীবনের এত আয়োজন। আর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রেরও করুণার অন্ত নেই, সীতাদেবীকে উদ্ধারের অছিলায় নিজে পায়ে হেঁটে এসেছেন রাবণের রাজ্যে। রাবণও সামান্য জীব নয়, প্রকৃতপক্ষে সে যে মহাবৈষ্ণব, ত্রিকালজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

সর্ব্বধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে অকালবোধনই হ'ল সমস্ত বিশ্ববাসীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শক্তি বললে সাম্প্রদায়িক ভাব এসে যায়, তাই বোধন কথাটিই এখানে অধিকতর উপযুক্ত। অকালে আরাধনা ক'রে বিশ্ববাসী তার বোধকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করছে এবং নিষ্কাম হবার জন্য কামকে ক'রেছে তার পুরোহিত। প্রশ্নকর্ত্তাকে উদ্দেশ্য ক'রে শ্রীমাধব বলেন, আজ যে আপনি আমার কাছে এসেছেন তার মূলেও আছে রাবণ অর্থাৎ কামনা কেননা সেই তো আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে। রাবণ অর্থে বিশ্বের অজ্ঞান অরণ্যের মধ্যে যে 'রা' শক্তি জাগ্রত, সেই রাবণ। যে শব্দ বিষয়কে বা সম্পদকে আকর্ষণ করে, আবার পরমেশ্বরকে আকর্ষণ ক'রে সাধককে আনন্দ দান করে—সেই তো রাবণ। বিশ্বসংসারটি হ'ল বনতুল্য এবং সর্ব্বক্ষেত্রে তাকে ঘিরে রয়েছে এই 'রা' বা কামনা। জন্মের সুরুতেও এই 'রা' অর্থাৎ খিদে পেয়েছে, খেতে দাও, মৃত্যুকালেও চোখে মুখে এই 'রা'

এরই আভাস অর্থাৎ বাঁচবার কামনা। অজ্ঞান এই বিশ্ববনে 'রা' শক্তি আবার নানাজনকে নানা ভাবে আনন্দও দেয়।

শ্রীমাধব বলেন, সংসারীর সংসার আশা পূরণ হ'চ্ছে বিষয়কে কামনা ক'রে, রতির বাসনা পূরণ করছে নারী পুরুষের মিলনকে কামনা করে, সাধককে আনন্দ দিচ্ছে ঈশ্বরকে কামনা ক'রে। তাই বলি, কামনা কত উদার যে অকালবোধনে সে নিজেকে আহুতি দিয়ে নিষ্কাম হবার পথ প্রশস্ত ক'রে দেয়। চাওয়ার যে রব বা 'রা' সেই ভাবটিই হ'ল কামনা, আর এই 'রা' যে অজ্ঞান বনের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আছে সেই তো রাবণ। বিশ্বের দশদিকে সে কামনার জাল বিস্তার ক'রে বসে আছে—তাই তার দশটি মুখ। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের রাজা সে অর্থাৎ দেহের মধ্যে তিন অবস্থাই তার অধীনে। শক্তির আরাধনা ক'রে যখন সে আত্মাহুতি দেয় তখনই নিষ্কাম হওয়া সম্ভব অর্থাৎ মনুষ্যত্বের পূর্ণজ্যোতি বিকাশ প্রকাশ হয়। কাজে কাজেই, রাবণকে ধ্বংস হ'তেই হবে নইলে আত্মারামের সন্ধান যে কোনদিনই মিলবে না। শ্রীমাধব বলেন, শ্রীরামচন্দ্র যে রাবণকে দিয়ে আহুতি দেওয়ালেন তার প্রকৃত অর্থ হ'ল তোমাদের মধ্যে কূটস্থ চৈতন্যরূপে বিরাজ ক'রে তিনি তোমাদের দিয়ে সবই করিয়ে নেন।

সীতাদেবীর একাকিনী বনবাস প্রসঙ্গে শ্রীমাধব বলেন, গল্পের শাশ্বত তত্ত্ব জানা না থাকলে বড় গোলমালে পড়তে হয়। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, একাকিনী বনবাসে না পাঠালে, অজ্ঞান সন্তানগণ পিতাকে চিনবে কি ক'রে? আমরাই তো সীতামায়ের লব ও কুশরূপ অজ্ঞান সন্তান। মাতা ছাড়া পিতাকে চেনাবার অধিকার আর কার আছে? একথার অর্থ হ'ল শক্তি ছাড়া আত্মারামকে বা পরমপিতাকে কে চেনাতে পারে? আমরা সবাই অজ্ঞানান্ধকাররূপ বিশ্ববনে পড়ে আছি, সেখানে থেকেও যাতে আমরা পিতাকে চিনতে পারি সেজন্য করুণাময়ী মা আমাদের সঙ্গে বনে থেকে, পিতাকে

চিনিয়ে দিয়ে, পিতার কাছে অমাদের পৌঁছে দিয়ে নিজ কর্ত্তব্য পালন ক'রে বিদায় নিলেন। কামনা বাসনা পরিপূর্ণ জাগতিক জীবনে সীতামায়ের একাকিনী বনবাসের দুঃখ দুঃসহ মনে হ'লেও অজ্ঞান সন্তানকে মুক্তির সন্ধান দিতে একাকিনী বনবাসের দুঃখ সহ্য করা শক্তি স্বরূপিনা সাতামায়ের কাছে অতি তুচ্ছ বলেই মনে হয়।

শ্রীমাধব বলেন, শ্রীরামচন্দ্রের বালীবধের মূল তত্ত্ব জানা না থাকলে কাহিনীটি অনুধাবন করা অসুবিধাজনক হ'য়ে পড়ে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বালী ও সুগ্রীব দুই ভাই। উভয়ের মধ্যে কলহ হয়। শ্রীরামচন্দ্র পেছন থেকে বাণ মেরে বালীকে বধ করেন। কিন্তু দেহতত্ত্বের বিচারে প্রশ্ন জাগে স্বাভাবিক যে আমাদের দেহে বালী এবং সুগ্রীব কে? উত্তরে বলা যায়, রাগ বা ক্রোধ হল সুগ্রীব এবং লোভ হ'ল বালী।

লোভের ক্ষমতা অতি প্রচণ্ড। কথিত আছে যে, বালী অর্থাৎ লোভ তার ক্ষমতা বলে লেজ দিয়ে পেঁচিয়ে মহাপ্রতাপশালী রাবণ রাজাকে অর্থাৎ কামনাকে পর্যান্ত একবছর সমুদ্রের তলায় বেঁধে রেখেছিল।

এদিকে সুগ্রীব অর্থাৎ ক্রোধ যখন উত্তেজিত হয় তখন সে কাণ্ডজ্ঞানহীন হ'য়ে পড়ে এবং সাধন ভজন, বিষয় সম্পদ যা কিছু তার সামনে পড়ে সবই ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। কিন্তু ক্রোধ যখন শান্তরূপ গ্রহণ করে, তখন তার নাম হয় রাগ এবং সেই রাগ ঈশ্বরমুখী হ'লেই অনুরাগে রূপান্তরিত হয়। অনুরাগই সুগ্রাব, তাই সে শ্রীরামচন্দ্রের অতি প্রিয়।

সুগ্রীবকে রক্ষা করতে গেলে বালী অর্থাৎ লোভকে আড়াল থেকে ধ্বংস করতে হবে, কেননা সামনে গেলে লোভকে সামাল দেওয়া যে বড় কঠিন। লোভ যেন কোন কারণেই উদয় হ'তে না পারে, তাই উদয় হবার সুযোগ না দিয়ে আড়াল থেকে তাকে ধ্বংস করাই শ্রেয়ঃ।

প্রশ্ন উঠে, কি ক'রে লোভকে ধ্বংস করা যায়? শ্রীমাধব বলেন, একমাত্র শ্রীগুরুর মন্ত্ররূপবাণে লোভ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। লোভের সামনে না যাওয়ার কারণ হ'ল, অনেক সময় দেখা যায় লোভের বস্তু সামনে পেয়েও আমরা সংযম রক্ষা ক'রে চলি বটে কিন্তু তাই বলে লোভ মরে না, তাই আড়াল থেকে তাকে ধ্বংস করাই কর্তব্য। লোভের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র পথ হ'ল শ্রীগুরুর শরণাগত হওয়া, তাহ'লে তিনি আড়াল থেকে লোভকে ধ্বংস ক'রে দেবেন এবং তুমি লোভশূন্য রাজত্বে বসবাস করতে পারবে। লোভ শূন্য না হ'তে পারলে কর্ষণ, আকর্ষণ, বিকর্ষণরূপী কূটস্থচৈতন্য শক্তিই যে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পরমেশ্বর এবং তুমি যে তাঁরই অভিন্ন সত্তা সে অনুভূতি আসা সম্ভব নয়। বালীবধের মূলতত্ত্ব জানার পরে কারুর পক্ষেই হয়তো আর শ্রীরামচন্দ্রকে দোষারোপ করা সঙ্গত নয়।

এরপর শ্রীমাধব উর্ম্মিলা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, তোমার মনে ঈশ্বরের সান্নিধ্য বা আত্মদর্শন করার যে লক্ষণ, তার থেকে উর্ম্মিলাকে তফাৎ রাখতে হবে, কেননা উর্ম্মিলা থাকলে আত্মদর্শন কখনই সম্ভব নয়। দেহতত্ত্বের বিচারে শ্রীমাধব উর্ম্মিলাকে মনের চঞ্চলা প্রকৃতি বা অস্থির প্রবৃত্তি ব'লে চিহ্নিত করেন। লক্ষ্মণের সঙ্গে উর্ম্মিলার বিবাহ হ'য়েছিল বটে, কিন্তু যার কোন জায়গায় স্থিতি নেই, অস্থিরতাই যার প্রকৃতিতে প্রাধান্য লাভ করে তার সাথে মিলন হওয়া যে অসম্ভব। অস্থিরা প্রকৃতি বলেই সে লক্ষ্মণকে সহায়তা করতে পেরেছে। রামানুজ লক্ষ্মণ চঞ্চলা প্রকৃতি উর্ম্মিলার কারণেই আহার, নিদ্রা ও মৈথুনকে অনায়াসে জয় করতে পেরেছে। রামানুজ বলতে এখানে রামের অভিন্ন অংশ অর্থাৎ মানুষের যা কিছু সুলক্ষণ, সবই যে আত্মারামের অভিন্ন ক্ষুদ্র অংশ, সে কথাই বোঝান হ'চ্ছে। মানুষের মধ্যে এই অস্থির প্রকৃতি বা অস্তিত্বশূন্য প্রকৃতিই হ'ল উর্ম্মিলা। ইরূপ যে প্রকৃতি সে কি

কখনও লক্ষ্মণের সঙ্গ পেতে পারে? অর্থাৎ তোমার মধ্যে যখন কোন সুলক্ষণ বা সৎলক্ষণ জাগ্রত হবে তখন তোমার অস্তিত্বশূন্য অস্থির প্রকৃতি কি তার মধ্যে নিজের স্থান ক'রে নিতে সক্ষম হয়?

জীবশিক্ষার কারণে দেখান হ'য়েছে যে, লক্ষ্মণ সুপুরুষ এবং সৎলক্ষণযুক্ত হ'য়েও অস্থির প্রকৃতি উর্মিলাকে বিবাহ ক'রেছিল বটে, তবে কখনও তাকে নিয়ে ঘর করেনি। দেহের মধ্যে স্থির এবং অস্থির, চঞ্চল ও অচঞ্চল উভয় প্রকার প্রকৃতির খেলাই চলে, তবে যেখানে সৎলক্ষণের প্রভাব বেশী সেখানে অস্থির এবং চঞ্চল প্রকৃতিকে যে বিদায় নিতেই হবে।

শ্রীমাধব বলেন, দেহতত্ত্বকে প্রকৃষ্ট ভাবে জানতে হবে, কেননা এই দেহেই সব আছে। তিনি বলেন, যা আছে বিশ্বভাণ্ডে তা আছে দেহভাণ্ডে। এই বিশ্বে যা কিছু দেখ, বা যে সকল পৌরাণিক কাহিনী শোন, সবই এই দেহতত্ত্বে আছে। দেহতত্ত্ব জানা না থাকলে পৌরাণিক কাহিনী পড়ে বা শুনে গোলমালে পড়তে হয়। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের যুগে এসকল পৌরাণিক কাহিনী গ্রহণযোগ্য নয়, তবে আত্মতত্ত্ব জানা থাকলে সবই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে।

শ্রীমাধব বলেন, তোমার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে আত্মদর্শনরূপ পুস্তিকা রচিত হ'য়েছে তাকে নিবিষ্টভাবে পাঠ ক'রে দেখ, সবই জানতে পারবে; যতগুলো জীবনপাতা পেছনে ফেলে এসেছ, সেগুলো একটি একটি ক'রে উল্টে যাও, তোমার পরমকর্ম্ম, সুকর্ম্ম, দুষ্কর্ম্ম, কুকর্ম্ম, বিকর্ম্ম, বিষয়কর্ম্ম প্রভৃতি সবই তো সেখানে লেখা আছে, একটিও হারিয়ে যায়নি। তুমিই তোমার পুস্তকের রচয়িতা, তুমিই তার বিষয়বস্তু, তুমি ছাড়া এ বই সম্বন্ধে আর কি কেউ ভাল জানে? বিগত জীবনের এই কাহিনী পাঠ ক'রে সংশোধিত হবার চেষ্টা কর। বাকী জীবনটুকু হেলায় কাটিয়ে দিওনা।

মনুষ্যত্বের মাধ্যমে আত্মার প্রকাশ বিকাশ

মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্তের প্রশ্ন ছিল,—ঋষিরাজ জনক আপন কন্যা উর্ম্মিলাকে অস্থিরা, চঞ্চলা প্রকৃতি জেনেও কি রামানুজ লক্ষ্মণের সঙ্গে তাকে বিবাহ দিয়েছিলেন? যদি তাই হ'য়ে থাকে তবে এ ঘটনার তাৎপর্য্য কি?

উর্ম্মিলা প্রসঙ্গে প্রশ্নটি উত্থাপিত হ'লেও শ্রীমাধব শ্রীরামচন্দ্রের লীলাপ্রসঙ্গে আনুপূর্ব্বিক এ ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। বিষ্ণুর অনন্ত শয্যার সময় শেষনাগ তাঁর শিয়রে সদাজাগ্রত প্রহরীর কার্য্যে রত ছিলেন। লীলার কারণে তিনি যখন মনুষ্যদেহ ধারণ করার কথা মনস্থ করেন, তখন শেষনাগ তাঁর সঙ্গী হবার জন্য আকুল প্রার্থনা জানান। ত্রেতাযুগেই প্রথম তিনি শ্রীরামচন্দ্ররূপে জগতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং রামানুজ লক্ষ্মণরূপে এই শেষনাগের আবির্ভাবও হয় সেই সময়ে। এদিকে মিথিলায় জনকরাজার পালিত কন্যা সীতাদেবীরূপে স্বয়ং লক্ষ্মীও আবির্ভূতা হন। রাজাজনকের প্রতিশ্রুতি ছিল, সীতার পাণিগ্রহণ করতে হ'লে গুরু পরশুরাম প্রদত্ত হরধনু ভঙ্গ করতে হবে। জনকরাজার সভায় এই হরধনু ভঙ্গ করতে রাবণ ও বিভিন্ন দেশের বহুবীর অকৃতকার্য্য হন। শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বামিত্রের সঙ্গে এলেন অযোধ্যার রাজা দশরথের দুই পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ।

সীতা স্বপ্নে রামের মূর্ত্তি দর্শন ক'রেছিলেন এবং নিজহস্তে সেই মূর্ত্তি গড়ে তিনি পূজা করতেন তাঁর অন্তরের আরাধ্যরূপে। সখীসম ছোট বোন উর্ম্মিলাও মনে মনে তাঁর পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করতেন এই রামচন্দ্রকেই। রাম-লক্ষ্মণ যখন রাজসভায় এলেন তখন এই দেহরূপী শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সীতাদেবী তাঁর স্বপ্নে দেখা রামের মিল

খুঁজে দেখবার জন্য উর্ম্মিলাকে পাঠালেন। উর্ম্মিলা গিয়ে দেখে যে হুবহু সেই মূর্ত্তির মতো রাজসভা আলো ক'রে বসে আছেন অনিন্দ্যসুন্দর শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁরই পাশে অনুজ লক্ষ্মণ। ভীত চকিত মনে সে প্রমাদগণে,—এতো বালক। হরধনু ভঙ্গ করবেন কি ক'রে? এলেনই যদি তবে আরও বড় হ'য়ে এলেন না কেন? সীতাকে গিয়ে একথা বলতে তিনি অবিশ্বাসীর হাসি হেসে বলেন, 'দেখ, যাঁর অঙ্গুলি হেলনে সারাবিশ্ব নিয়ন্ত্রিত, তাঁর আবার ছোট, বড় কি? একদিকে যেমন তিনি সবার উপরে, আর একদিকে তেমনি সবার নীচে।'

এদিকে রাজসভায় পরশুরাম তখন রামকে ডেকে বলেন, 'তুমি এখানে কেন এসেছ, প্রলোভনে? না সুন্দরী সীতার কথা শুনে? না রাজপুত্র ব'লে রাজ অভিমানে এসেছ?' রামচন্দ্র নীরব, কিন্তু লক্ষ্মণের যে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। সে বলে, 'দাদা! আর তো সহ্য হয় না, আপনি এত বড় বীর, তাড়কারাক্ষসীকে বধ ক'রে কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম ক'রে এসেছেন, আর সামান্য এই সন্ন্যাসীর কথা সহ্য করছেন? রাম বলেন, 'ভাই! চুপ কর।' তারপর তিনি পরশুরামকে উদ্দেশ্য ক'রে বলেন, 'বলুন! আমি কি করলে আপনি খুসী হবেন? পরশুরাম বলেন, 'তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি গোখরো সাপের বাচ্চা? বল, কে তুমি?' লক্ষ্মণ সংযম হারিয়ে বলে উঠে, 'গোখরো সাপের বাচ্চা নয়, উনি গোখরো সাপ সৃষ্টি করেন।

পরশুরাম বলেন, 'বেশ তাই যদি হয় তবে হরধনু ভাঙ্গার আগে, আমার এই কুঠারটি তোমার বাণ দিয়ে উঠাও দেখি?' রাম বলেন, 'সে কি! আমি বালক, আর আপনি পূজনীয় ব্যক্তি, আমার পিতার গুরু, আমার পক্ষে কি এটা উঠান সম্ভব? আপনি বরং আমায় শিখিয়ে দিন কি ক'রে এটা উঠান যায়। আর আপনি বলেছিলেন,

আমি প্রলোভনে এসেছি কিনা। কিন্তু প্রলোভন কার হয়? যারা পরধনে অভিলাষী তাদের ক্ষেত্রেই প্রলোভনের কথা উঠে; নিজধন উঠিয়ে নিতে কি কোন প্রলোভনের দরকার হয়? হয় না।

পরশুরাম হতচকিত হ'য়ে উঠেন কিন্তু পুনরায় উপহাসের সুরে ব'লে উঠেন, 'এ সব কথা তোমায় কে শেখাল? বিশ্বামিত্র বুঝি?' রাম উত্তর দেন, 'দেখুন! জগতে শিক্ষা দেওয়া আর শিক্ষা নেওয়া সবারই কর্ত্তব্য। আপনি আমার পিতার গুরু, সেই গুরুশক্তিতেই আমি অনায়াসে এই কুঠারটি উঠাতে পারব জানি, কেন না শিষ্যের মধ্যে গুরুশক্তির প্রকাশ হ'ক এটাই তো গুরুদেবের একমাত্র উচিত অভিপ্রায় ব'লে জানি'. একথা ব'লে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেন, 'লক্ষ্মণ, দাও তো একটি বাণ'? পরশুরাম তাঁর বাঁ পা দিয়ে কুঠারটি চেপে রেখেছিলেন, রামচন্দ্র বাঁ হাতে একটি বাণের আঘাতে সেটি উঠিয়ে দিলেন। পরশুরাম বলেন, 'আমার পুরোশক্তি প্রয়োগ করা হয়নি, এবার হাত দিয়ে চেপে ধরব!' এবারও রামচন্দ্র অনায়াসে সেটি উঠিয়ে দিলেন। পরশুরাম তখন ক্রোধে জ্ঞানহারা হ'য়ে বলেন, 'জনক! এখানে কোন অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে, এ সভায় আমি থাকব না'। এই ব'লে তিনি রাজসভা ত্যাগ করেন। মনে মনে সংকল্প করেন, হরধনু ভঙ্গ ক'রে সীতাকে নিয়ে রাম যখন অযোধ্যায় ফিরে যাবে তখন রামকে ধ্বংস করবেন এবং সেই কারণে শিষ্যসামন্ত নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের ফেরার পথ আগলে ব'সে রইলেন। এদিকে সর্ব্বজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেন, 'লক্ষ্মণ হুঁশিয়ার। পরশুরাম এখনও আমায় চেনেনি, যখন আমার গতিপথে আসবে তখনই সে আমাকে চিনবে।'

এদিকে সীতাদেবী অলিন্দ থেকে সবই লক্ষ্য করছেন। হরধনু হাত দিয়ে টেনে তুলে শ্রীরামচন্দ্র বলেন, 'এটা কি ভাঙ্গতে হবে? হরধনু একবার ভেঙে গেলে আর কিন্তু তৈরী করা সম্ভব নয়, কেননা

নারায়ণ স্বয়ং শিবকে এই ধনুক দিয়েছিলেন এবং তাই শিবের নামানুসারেই ঐই ধনুর নাম হয় হরধনু।'

রাজসভা থেকে দুর্মুখ ব'লে উঠে, 'হরধনু ভেঙ্গে অযোধ্যার সুনামই না হয় রক্ষা কর'। তাই হ'ল। হরধনু ভঙ্গের পর সীতাদেবী রামচন্দ্রকে বরমাল্য প্রদান ক'রে স্বামীত্বে বরণ করেন।

রাজা জনকই সীতাদেবীর বিবাহে সর্ব্বপ্রথম এই বিবাহ প্রথা প্রচলন করেন। এ সময় থেকেই প্রকৃত পিতা কে হবেন সেটি স্থির হয় এবং তখন থেকে পিতৃ পরিচয়ে সন্তান পরিচিত হ'তে থাকে। এর আগে সন্তানের পরিচয় ছিল মাতার পরিচয়ে। তখনকার কালে মুনিঋষিদের থেকে উত্তম বীর্য্য গ্রহণ ক'রে যে সকল নারী উত্তম সন্তান লাভ করতেন, তাদের পরিচয় ছিল মাতার পরিচয়ে এবং তারাই আর্য্য নামে অভিহিত হ'ত, আর যারা যত্রতত্র বীর্য্য গ্রহণ ক'রে সন্তানবতী হ'ত তাদের সন্তানগণই হ'ত অনার্য্য। রাজা জনক এই বিবাহ প্রথা প্রচলন করেন ব'লেই তাঁকে জাতির জনক বলা হয়।

ইতিমধ্যে অযোধ্যার রাজা দশরথ অন্য দুই পুত্র ভরত ও শত্রুঘ্ন সহ সভাসদ্ সমভিব্যাহারে মিথিলায় এসে পৌঁছেছেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতাদেবীর বিবাহের পরে জনকরাজা তাঁর অন্য তিন কন্যার সঙ্গে রাজা দশরথের তিন পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রাজা দশরথ তখন বাকী তিন পুত্রের সঙ্গে জনকরাজের তিন কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হন।

বিবাহের কথা শুনে লক্ষ্মণ বলে, 'দাদা! আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক আছে, আমি বিবাহ করব না।' রাম বলেন, 'ভাই লক্ষ্মণ! তুমি রামানুজ, কখন রামের কথার বিচার ক'রোনা, সব কথাই সর্ব্বদা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করবে।'

রামের কথায় লক্ষ্মণ জনকনন্দিনী উর্ম্মিলাকে বিবাহ করে বটে,

তবে তাকে নিয়ে কখনও ঘর করেনি। দাদার সঙ্গে বনবাসে গিয়ে চৌদ্দ বছর সে অনাহারে, অনিদ্রায় কাটায় এবং মৈথুন থেকেও বিরত থাকে অর্থাৎ এই তিনটিকেই সে জয় করে। কলিযুগে মানবমানবীর অন্নগত প্রাণ তাই এ যুগে এটি অসম্ভব মনে হ'লেও ত্রেতাযুগে যখন তাদের অস্থিগত প্রাণ ছিল তখন আহার, নিদ্রা ও মৈথুন থেকে বিরত থাকা মানবমানবীর পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

তথাপি কি কারণে একদিন লক্ষ্মণের মনে দুঃখ জাগে তাই সে বলে, 'দাদা! আপনি লীলাময়, সারাবিশ্বের খবর আপনার নখদর্পণে কিন্তু লক্ষ্মণের কোন খবর কি আপনি রাখেন? আমি খাই কিনা, ঘুমোই কিনা, মৈথুন থেকেও যে বিরত, সে খবর তো কৈ কখনও আপনি করেন না'?

রাম বলেন 'ভাই! তোমার মনে কি এজন্য ক্ষোভ জেগেছে? তুমি যদি দাদাকে পূর্ণ ব্রহ্মরাম ব'লে জেনে থাক, তবে একথাও জেনে রাখ যে, এর পেছনেও কারণ আছে। মনে তোমার ক্ষোভ হ'তে পারে, তা হ'ক, তাই বলে দাদাকে দোষারোপ ক'রো না, একদিন এর কারণ জানতে পারবে'।

তারপর রাবণের সঙ্গে যখন রামের যুদ্ধ সুরু হ'ল তখন বিভীষণ একদিন এসে বলে, 'আজ ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ করবে, আপনাদের তার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করা বড় কঠিন। ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মার বরে বলীয়ান। সে যুদ্ধে যাবার আগে যজ্ঞ ক'রে আসে, সেই যজ্ঞ যদি কেউ পণ্ড করতে পারে, তবেই তাকে হারান সম্ভব। তাছাড়া শুনেছি, যে চৌদ্দ বছর কোন আহার গ্রহণ করেনি, নিদ্রা যায়নি, মৈথুনাসক্ত হয়নি, এমন জনের কাছেই কেবলমাত্র মেঘনাদ পরাস্ত হ'তে পারে।'

রাম বলেন, 'যজ্ঞ পণ্ড করা তো তেমন কঠিন কাজ নয়, তবে এমন জন কোথায় পাই যে চৌদ্দবছর অনাহারে, অনিদ্রায় কাটিয়েছে এবং মৈথুনাসক্ত হয়নি?'

লক্ষ্মণ তখন এগিয়ে এসে বলে, 'দাদা! আপনি সর্ব্বকারণের কারণ, আপনি না বলেছিলেন, কারণ একদিন আমি খুঁজে পাবই. আজ সেই কারণ খুঁজে পেয়েছি। আমিই তো সেইজন, যে চৌদ্দ-বছর আহার, নিদ্রা, মৈথুন থেকে বিরত রয়েছে? আমিই যুদ্ধে যাব।'

শ্রীমাধব বলেন, এ কাহিনী অবতারণার মূল উদ্দেশ্য হ'ল. আমাদের দেহতত্ত্বের সঙ্গে এর মিল খুঁজে বার করবার জন্য। আগেও তোমাদের বহুবার বলেছি, 'যা আছে বিশ্বভাণ্ডে তা আছে দেহভাণ্ডে।' এখন দেখ দেহতত্ত্বের বিচারে এই মেঘনাদ বা ইন্দ্রজিৎ কে? দেহতত্ত্বে অষ্টপাশই মেঘনাদ। সে কামনা, বাসনারূপ মেঘের ঘনঘটার আড়াল থেকে যুদ্ধ করে। আমরা অন্তরে অনেক প্রকার বাসনার জাল বুনি, কিন্তু যে কর্ম্ম করি তাতে বাসনা সর্ব্বদা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হ'তে পারে না। তাছাড়া যে কোন কর্ম্মই করি না কেন, তা—ও হয় অন্য কর্ম্মের পরিপ্রেক্ষিতে। পূর্ব্বকর্ম্মের বীজ থেকে নূতন একটি কর্ম্মের সৃষ্টি হয়, আবার সেই কর্ম্ম থেকেই আসে ভবিষ্যৎ কর্ম্মের ফললাভ। তবে কোন্ কর্ম্ম থেকে যে আমার বর্ত্তমান কর্ম্মটি সৃষ্টি হ'চ্ছে সে হদিস আমরা জ্ঞাত নই।

দৃষ্টমান জগতের বর্ত্তমান বুদ্ধিদ্বারা আমারা একথাই ভাবি যে, পুরুষকার দ্বারা যে কর্ম্ম করি তাতেই ফল সৃষ্টি হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বকর্ম্মের বীজ থেকেই বর্ত্তমান কর্ম্ম সৃষ্টি হচ্ছে তবে সেটি কোন পূর্ব্বকর্ম্ম তা আমাদের জানা নেই।

শ্রীমাধব বলেন, তুমি যদি সর্ব্বদা সুকর্ম্ম করার চেষ্টাও কর, তাও তার সঙ্গে কিছু দুষ্কর্ম্ম জড়িত হ'য়ে পড়ে, কেননা সবই তো সুকর্ম্ম হয় না। সেই কারণেই সুখদুঃখের ফলভোগ করতে হয় এবং সুকর্ম্ম এবং দুষ্কর্ম্মের পরিমাণ অনুযায়ী সুখদুঃখের ফলভোগের ও তারতম্য হয়। সুশিক্ষা পেয়েছ ব'লে সুকর্ম্ম করছ, তাহ'লে সুশিক্ষাকে সুকর্ম্মের বীজ বলা তো ভুল নয়।

শ্রীমাধব বলেন, কুকর্ম্মের ভাগে একরকম ফল হয়, আর সুকর্ম্মের ভাগে ফল হয় অন্যরকম যাকে বলে দুষ্কৃতি ও সুকৃতি। একেই আমরা বলে থাকি ভাগ্য। দুটি ভাগের ধারা থাকাতে ভাগ্য কথাটি বলা হয়।

সনাতন ধর্ম্মে এটাকে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ফলের সঙ্গে যুক্ত করা হয় কিন্তু শ্রীমাধব পূর্ব্বজন্মের কথা না ব'লে বলেন, বর্ত্তমান জন্মে যে কর্ম্ম করছ তাকেই ভাগ ক'রে দেখ না কেন? আলোচনা সভায় কর্ম্মে পুরুষকারের প্রভাবের প্রশ্ন উঠেছিল, তার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, সর্ব্বজীবের মধ্যেই পুরুষকার আছে। মানবমানবীর মধ্যে যখন মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয় তখনই তার পুরুষকারের প্রকাশ বিকাশ সম্ভব। আমি মানুষ; আমার আচার, আচরণ, রীতি, নীতি হবে মানবীয়; মনুষ্যত্বের এই অস্তিত্ববোধ নিয়ে যে চলে সেটিই তার পুরুষকার। নারীপুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষকার আছে। পুরুষকার সারাবিশ্বে এক। যার মধ্যে মনুষ্যত্বের অস্তিত্ববোধ নেই সে দুর্ব্বল, সে কাপুরুষ।

শ্রীমাধব বলেন, এখন দেখ আমাদের পূর্ব্বআলোচনার সঙ্গে দেহতত্ত্বের দিক থেকে এর যোগ কোথায়?

দেহতত্ত্বের বিচারে রাম হ'লেন আমাদের আত্মারাম। আর লক্ষ্মণ কে? আত্মার লক্ষ্মণ একমাত্র মনুষ্যত্বের দ্বারাই প্রকাশ বিকাশ হয়। রামানুজ লক্ষ্মণ হ'ল মনুষ্যত্বের বিংশতি প্রধান গুণাবলী সম্পন্ন তাই সে আহার, নিদ্রা ও মৈথুনকে জয় করতে পেরেছিল এবং সেই কারণেই অস্থির মতি উর্ম্মিলা কখনও তার অন্তরে স্থায়ী আসন অধিকার করতে পারেনি বরং দূরে থেকেই সে মনুষ্যত্বের প্রকাশ বিকাশকে জয়যুক্ত হ'তে সহায়তা করেছে। মনুষ্যত্বের মাধ্যমে আত্মার লক্ষণ প্রকাশ বিকাশের অধিকারী বলেই জগতে মানবজাতি সবার উপরে স্থান পেয়েছে। দেহতত্ত্বের বিচারে কাম, ক্রোধাদি ষড়রিপু এবং অষ্টপাশরূপী মেঘনাদই মনুষ্যত্বের আড়াল থেকে ইন্দ্রের

সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আমাদের সকল ঘনীভূত বাসনা, সব আশাভরসাকে ধূলিস্যাৎ ক'রে দেয়। যেমন অষ্টপাশের একটি হ'ল জুগুপ্সা অর্থাৎ পর নিন্দায় মুখর, তার কাছেও ইন্দ্রকে পরাজিত হ'তে হয়। অষ্টপাশ কখনও সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না।

এখন প্রশ্ন উঠে তবে কি এমন জন কেউ নেই যে এই মেঘনাদরূপী অষ্টপাশকে পরাজিত বা ধ্বংস করতে পারে ?

শ্রীমাধব বলেন, আত্মার যে লক্ষ্মণ সেই একমাত্র পারে মনুষ্যত্বের প্রকাশ বিকাশ দ্বারা অর্থাৎ জাগ্রত পুরুষকার দ্বারা এই অষ্টপাশকে ধ্বংস করতে। মানুষ যে. মানবিকতাই তার ধর্ম্ম তাই সে সবারই মঙ্গল কামনা করে। আত্মার লক্ষণ হ'ল, মনুষ্যত্বের বিংশতিপ্রকার নীতি, আচার, আচরণ এবং গুণাবলী অর্জ্জনেই সে তুষ্ট, কোন কিছু ভোগের আকাঙ্ক্ষা তার নেই।

চৌদ্দবছর কাল বনবাসের তাৎপর্য্য হ'ল জীবনের প্রতিপদ থেকে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত সে কোন কিছু ভোগের বাসনা করে না, এটি হ'ল তার সংযম সাধনার কাল, তাই আহার, নিদ্রা ও মৈথুন থেকে সে বিরত। সংযম সাধনা ক'রে মনুষ্যত্বের যে সকল গুণাবলী সে অর্জ্জন ক'রেছে তার জয় সর্ব্বক্ষেত্রে, এই মনুষ্যত্বই হ'ল লক্ষ্মণ।

কলিযুগে মানবমানবীর প্রাণ হ'ল অন্নগত তাই তাকে গ্রহণ করতে হবে আতিশয্যহীন ক্রমের পথ। বর্ত্তমান যুগে পরিমিত আহার, নিদ্রা ত্যাগ ক'রে ও মৈথুনাসক্ত না হ'য়ে মানবমানবী জীবন কাটাতে সক্ষম নয়; সে কারণেই এ যুগে ক্রমের পথে সংসার করায় পুরুষকারের কোন ব্যাঘাত ঘটে না, ব্যতিক্রমের পথে পা বাড়ালেই ব্যাঘাত ঘটে। এ যুগে ক্রমের পথে চলাই হ'ল মনুষ্যত্ব বা পুরুষকার বিকাশ প্রকাশের একমাত্র উপায় আর ব্যতিক্রমে চললে মনুষ্যত্বহীনতা বা কাপুরুষতা মানবমানবীকে সর্ব্বনাশের পথে ঠেলে দেবে। আহার, নিদ্রা, মৈথুন পুরুষকারের চরিতার্থের বিষয় নয়, এদের সংযত করতে পারাটাই মনুষ্যত্বের বা পুরুষকারের জয়।

জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রার্থনার রূপ

মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্তের প্রশ্ন ছিল—আমরা যখন প্রার্থনা করি তখন তাকে ভাষায় রূপদান করি, কিন্তু অনেক সময় এমন কথাও মনে হয় যে, ভাষায় প্রকাশিত না হ'লেও আমার অন্তরের প্রার্থনা তো ঈশ্বরের অজানিত নয়? এই মনোভাবটিকে কি প্রার্থনা বলা যায় না?

আলোচনার প্রারম্ভেই শ্রীমাধব অতি সংক্ষেপে উত্তরের সার-মর্ম্মটি সভার সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রার্থনা ভাষায় প্রকাশ করলেও প্রার্থনা, আবার মনে মনে সেই ইচ্ছা থাকাও প্রার্থনা।

প্রশ্নটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রার্থনা প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম আমাদের চিন্তা ক'রে দেখা উচিত যে, প্রার্থনার উৎপত্তি কোথা থেকে, এর প্রয়োজন কি বা কেন আমরা প্রার্থনা করি? আপাত দৃষ্টিতে ক্ষুধা থেকে অভাবের সৃষ্টি এবং অভাব পূরণার্থে প্রার্থনার আয়োজন। সর্ব্ব প্রকারের ক্ষুধাই অভাব আনয়ন করে। প্রথম যেদিন জন্মেছি সেদিনও ক্ষুধা ছিল, অভাবটি সেখানে ছিল খাদ্যের এবং সেই অভাব পূরণার্থে যে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম সে নিয়েছিল কান্নারূপ. কেননা মুখে তখন কোন ভাষা যে ফোটেনি। এই ক্ষুধা বহুপ্রকারের হ'তে পারে যথা দৈহিক ক্ষুধা, ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা, মনের নানাবিধ ক্ষুধা ইত্যাদি। ভাল জিনিষ খেতে বা দেখতে ইচ্ছা করাটাও একটা ক্ষুধা, এবং এই ক্ষুধার পিছনে সর্ব্বদাই কোন না কোন অভাব রয়ে গেছে। সেই অভাব পূরণার্থে আমরা প্রার্থনা করি। যাঁর কাছে আমরা প্রার্থনা জানাই তাঁকে কিন্তু জানিনা, চিনিনা কখন দেখিওনি; অথচ প্রার্থনা করি।

প্রথম অবস্থায় প্রার্থনার সময় আমাদের কোন প্রতীক মূর্ত্তি বা আকারের প্রয়োজন হয়, কেননা আমরা ভাবি ইনিই আমাদের সব অভাব পূরণ করতে পারেন।

জাগতিক ক্ষেত্রে কোন প্রতীক মূর্ত্তিকে আরাধ্য হিসাবে গ্রহণ ক'রে প্রার্থনা জানানের রীতিই বেশী প্রচলিত।

আধ্যাত্মিক জগতেও অভাব বোধেই আমরা প্রার্থনা করি তবে সে প্রার্থনার রূপ হ'ল নামগান, স্তবস্তুতি, জপতপ ইত্যাদি। মানুষের মনে যখন অনুশোচনা জাগে যে, পৃথিবীতে মানুষ হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রেও স্রষ্টাকে জানা, চেনা, বোঝা হ'লনা তখন সেই অভাব বোধ থেকেই প্রার্থনা সুরু হয়। সুতরাং প্রার্থনার দুটি পথই মানবমানবীর কাছে খোলা আছে, একটি জাগতিক, অপরটি আধ্যাত্মিক।

জাগতিক অভাব পূরণের জন্য আমরা প্রার্থনা ক'রে থাকি পাওয়া না পাওয়া পরের কথা। তবে আমরা মনে ভাবি যা কিছু পাই তা প্রার্থনা করেই পাচ্ছি, সেকারণেই মসজিদে, মন্দিরে, গীর্জ্জায় দিনের পর দিন ভেটের অন্ত নেই। এ চিন্তা আমাদের আসেনা যে, যা পেলাম সেটা কি পাবার ছিল, না প্রার্থনা ক'রে পেলাম। শ্রীমাধব বলেন, প্রার্থনা ক'রে যদি সব পাওয়া যেত তবে প্রার্থনা ক'রে অন্যকে অমর ক'রে তুলতে বা নিজে অমরত্ব লাভ করতে পারছি না কেন? কাজে কাজেই বলা চলে যে অভাবের কারণে মনের আকুলতা ও ব্যস্ততার উপশমের জন্য বা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হ'তে আমরা প্রার্থনা করি।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত অর্থাৎ পৃথিবীতে যতদিন আমাদের বাস তার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই সে পরম দয়ালু ঈশ্বর আমাদের জন্মাবার আগেই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে, পূর্ব্ব থেকেই যদি সব ব্যবস্থা থেকে থাকে, তবে চেষ্টা বা

উপার্জ্জনের কি প্রয়োজন, ঘরে বসেই তো সব পেতে পারি? শ্রীমাধব বলেন, প্রয়োজনের উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা চেষ্টা এবং উপার্জ্জন তোমাকে করতে হবে। উপমাস্বরূপ তিনি বলেন, রসপূর্ণ খেজুর গাছ তাঁরই সৃষ্টি কিন্তু সময়মত চেষ্টা করে গাছ কেটে সেই রস তো তোমাকেই আহরণ করতে হবে! জমি চাষ ক'রে বীজ বপন করলে তবেই জমির ফসল কৃষক ঘরে তুলতে পারে, এজন্য চাই কর্ম্মের উদ্যম, অদৃষ্টের উপর ভরসা ক'রে থাকলে চলেনা। তাই আমরা মনে করি যা কিছু পাই, সে সবই হ'ল কর্ম্মের বিনিময়ে।

শ্রীমাধব বলেন, ঈশ্বরতত্ত্ব দিয়ে বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করলে বুঝতে পারবে বিনিময় কথাটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিনিময়ের প্রশ্ন সেখানেই উঠে যখন কিছু পেতে হ'লে তোমাকে তার বদলে কিছু দিতে হয়। বিনিময়ে কিছু পাবার আশায় তো ঈশ্বর তোমার জীবনধারণের সব ব্যবস্থা করে রাখেন নি। তিনি পরমদয়ালু; তাই সন্তানের সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য পূর্ব্ব হ'তেই তিনি সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন, তিনি চান কর্ম্ম ক'রে তোমরা তাঁর অকৃপণ এবং অযাচিত দানের বস্তু আহরণ ক'রে জীবনপথকে ক্রমের পথে পরিচালনা কর, তাই এক্ষেত্রে কর্ম্মকে বিনিময় হিসাবে চিন্তা করা অনুচিত হবে।

ব্যতিক্রমে কর্ম্ম ক'রে আমরা যখন সংসারের তপ্ত তেলে ভাজা ভাজা হই, তখন নিজ অপরাধকে স্মরণ ক'রে শান্তির জন্য তাঁরই কাছে প্রার্থনা জানাই। জাগতিক জগতে এর থেকেই প্রার্থনার উৎপত্তি বা সৃষ্টি। আমাদের ধারণা দেবদেবীগণ প্রার্থনায় তুষ্ট হ'য়ে আমাদের অভিষ্ট সিদ্ধির পথে সহায়ক হন, তাই তাঁদের কাছে প্রার্থনা জানাই যে, আমি অতি দীন, অতি হীন, আমার কোন শক্তি নেই, তুমি তোমার শক্তি দ্বারা আমাকে চালিয়ে নাও। যতক্ষণ

চাওয়া পাওয়ার অতীত না হ'তে পারি ততক্ষণ এ প্রার্থনা থাকবেই, কেননা অশান্তিপূর্ণ মায়াজগতে ক্ষণিকের জন্য হ'লেও মনে খানিকটা শান্তি তো আসে ; জীবন পথে এই শান্তির প্রয়োজন যে বড় বেশী।

শ্রীমাধব বলেন, সংসার ক্ষেত্রে বাপ-মায়ের কাছেও যদি অতি শান্ত, নম্র এবং মধুর ভাবে কিছু প্রার্থনা করি তখন তাঁরাও যেমন দ্বিরুক্তি না ক'রে প্রার্থনার বস্তুটি দিয়ে থাকেন, তেমনি দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা ক'রে যদি কিছু পাই তবে মনে করি তিনি তুষ্ট হ'য়েছেন, তাই জোড়া পাঁঠা বলি দিতেও দেরী হয় না।

শ্রীমাধব বলেন, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর তোমাকে এ জগতের রঙ্গমঞ্চে পাঠিয়েছেন নিখুঁত অভিনয় ক'রে যাবার জন্য এবং যে ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য তিনি তোমায় পাঠিয়েছেন ; তৎ উপযোগী আহার, বিহার, পোষাক পরিচ্ছদই তোমাকে দিয়ে থাকেন। তাই দেখি এ সংসাররূপ নাট্যশালায় কেউ বা রাজা আবার কেউ বা ফকির। এ জগতে ধর্ম্ম আমাদের ধারণ করছে আর কর্ম্ম পরিচালনা করছে। জাগতিক ভাবে আমরা মনে করি কর্ম্মের বিনিময়েই আমরা সব কিছু পাচ্ছি কিন্তু সেটা ঠিক নয়। আমরা ভেবে দেখি না যে কর্ম্মটা হ'ল জীবনপথ পরিক্রমা করবার জন্য এবং ধর্ম্ম জীবন-পথকে ধারণ ক'রে আছে। মানুষের ক্ষেত্রে মনুষ্যত্ব এবং মানবতাই হ'ল ধর্ম্ম, আর পশুর ক্ষেত্রে পশুত্বই তার ধর্ম্ম। পূর্ব্বকর্ম্মের পরিপ্রেক্ষিতে পরের কর্ম্মটিও নির্দ্ধারিত হয়।

শ্রীমাধব বলেন, একথা বলতে গিয়ে বহুপূর্ব্বের একটি প্রশ্ন মনে পড়ে। প্রশ্নটি ছিল, পর পর জন্মে কর্ম্মফলের উপর নির্ভর ক'রে কেউ রাজা এবং কেউ ভিখারী হ'তে পারে সেটা মানি, কিন্তু প্রথম জন্মের আগে তো আমার কোন কর্ম্ম ছিল না, তবে সে জন্মে কেন কেউ রাজা, কেউ ফকির হয় ?

এ প্রশ্নের উত্তর হ'ল, এটিই তো ঈশ্বরের অপূর্ব্ব লীলা, তিনি যে

নাট্যশালার নটবর, তাই যাকে যে ভূমিকায় মানাবে তাকে সেই ভাবেই তিনি সাজান। তোমাদের নাটকে যেমন যাকে যে ভূমিকায় মানানসই, তাকে সেই ভূমিকা দাও, কেউ রাজা, কেউ ভিখারী, কেউ বা মৃতসৈনিক; এও তেমনি। মৃতসৈনিক বলতে এ কথাই বলছি যে, এমন লোকও এ জগতে বহু আছে যাঁরা সংসারের কোন কাজেই লাগে না, কেবল আসে আর যায়।

ঈশ্বরও প্রথমে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে আমাদের সংসারের রঙ্গমঞ্চে পাঠিয়েছেন তারপর যার যার কর্ম্ম অনুযায়ী তার ভবিষ্যৎ কর্ম্মের সৃষ্টি হ'য়েছে। পরিবেশের প্রভাবে আমরা নানারূপ কর্ম্ম ক'রে থাকি এবং কর্ম্মের ধারা অনুযায়ী সে সকল কর্ম্ম সুকর্ম্ম, কুকর্ম্ম, দুষ্কর্ম্ম, বিকর্ম্ম, বিষয়কর্ম্ম প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হয়। এই সকল কর্ম্ম করতে করতে কোন মানবমানবীর মনে প্রশ্ন জাগে, কে আমি যে এ সকল কর্ম্ম করছি, কার নির্দ্দেশেই বা কর্ম্ম করছি, তিনি কে? এই আত্মসমীক্ষা ও আত্মানুসন্ধান করতে গিয়েই সে অনুশোচনায় জর্জ্জরিত হ'য়ে পড়ে এবং শক্তিময়ের পদে আত্মসমর্পণ ক'রে প্রার্থনা জানায়। এটিই হ'ল আধ্যাত্মিক পথের প্রার্থনা বা প্রকৃত প্রার্থনা। এই প্রার্থনা হ'ল কৃতজ্ঞতা বোধে, এখানে কোন চাওয়া পাওয়া নেই। ঈশ্বর কত দয়াময়, কত করুণাময় যে না চাইতেই তিনি সব দিয়ে রেখেছেন, এই অনুভূতি যখন মানবমানবীর আসে তখন তার আর কি কিছু চাইবার থাকে? জগত পারাবার ডিঙ্গিয়ে একমাত্র তাঁর সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষায়ই তখন সে দিন গোনে। মনে হয় যুগযুগান্ত ধ'রে চেয়েও কি কেউ তাঁকে পেয়েছে? আমি তো তাঁরই। তাঁর ও আমার মধ্যে তো কোন প্রভেদ নেই। পূর্ণচৈতন্যরূপে আমার প্রতিটি অনু পরমাণুতেই তো তিনি বিরাজ করছেন? পার্থিব জগতের চাওয়া পাওয়া আমাকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ক'রে রেখেছে। এই বোধ যখন মানবমানবীর মধ্যে আসে, তখনই তার অজ্ঞানতা দূর

হ'য়ে যায় এবং স্থিতপ্রজ্ঞ হ'য়ে সে দেখে, যাঁকে এতদিন চেয়েছি, তিনি তো পূর্ণভাবে আমাকেই ঘিরে আছেন, আমি ব'লে তো আমার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছি না? সবই যে তিনি।

শ্রীমাধব বলেন, তবে পার্থিব জগতে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের কাছে বা দেবীদেবীর কাছে প্রার্থনা তো করতেই হবে। পার্থিব জগতকে অবজ্ঞা ক'রে অপার্থিব জগতের সন্ধান পাওয়া যায় না। মনোরাজ্যের মধ্যেই যেমন আমাদের আত্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে হয়, এও তেমনি। পার্থিব জগতে থেকেই অপার্থিব জগতের সন্ধান করতে হবে। এ কারণেই সাধু, গুরু ও বৈষ্ণবের সঙ্গ ক'রে তাঁদের নির্দ্দেশ মত চলতে পারলেই পূর্ণ চৈতন্যের আভাস পাওয়া যায় অর্থাৎ যাঁর মধ্যে পূর্ণ চৈতন্য এসেছে এমন জনের উপদেশ নির্দ্দেশই মেনে চলতে হয়। পূর্ণ চৈতন্যের লক্ষণ কি? শ্রীমাধব বলেন, গাভীর বাটে দুধ এলে সে যেমন বাছুরকে খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে, কেননা দুধের ভার যে সে সহ্য করতে পারে না; বা গাছে ফল পাকলে গাছ যেমন নুয়ে পড়ে ফল পেড়ে তাকে হাল্‌কা ক'রে দেবার জন্য, সেরকম পরিপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে যাঁরা এ জগতে আসেন তাঁরাও সেই জ্ঞান জগতের মানবমানবীর মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে হাল্‌কা হ'তে চান। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীমাধব শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা উল্লেখ করেন। এই জ্ঞানের পিপাসা যাদের আছে তারাই তা কুড়িয়ে নিয়ে অপার্থিব জগতের দিকে এগিয়ে যায়। কোন্ দিন যে কার জ্ঞানের পরিপূর্ত্তি হবে সেকথা কেউ বলতে পারে না।

শ্রীমাধব বলেন, গুরুই তোমার বৈষ্ণব, গুরুই তোমার সাধু। গুরু নিজেকে তোমার মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছেন এটাই তো তাঁর বৈষ্ণবতা। এর অর্থ কি? এর অর্থ হ'ল মন্ত্রই গুরু, গুরুই মন্ত্র। যে মন্ত্রে অনন্ত বিশ্বের বীজ লুকিয়ে আছে, আমার যোগ্যতা থাক আর না থাক, সেই মন্ত্র তিনি আমার কানে দিয়েছেন। নিজেকে

এভাবে উজাড় ক'রে দেওয়া যে কত বড় বৈষ্ণবতা সেকথা একবার ভেবে দেখ দেখি।

আর তিনি আমার কাছে সাধু কখন?

তাঁরই ইচ্ছায়, তাঁরই সাধুতার প্রভাবে আমার সব অসাধুতা লুপ্ত হ'য়ে সাধুতা জেগে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে তিনি আমার সাধু, কেননা 'সাধুর ঐশ্বর্য্য শুধু পরহিত তরে।' সাধু হবার এই অপূর্ব্ব সুযোগ পেয়েও আমরা সভাসমিতিতে আমাদের অবাঞ্ছিত কার্য্যকলাপকে সাময়িক ঘুম পাড়িয়ে রেখে সাধু সাজি, আবার সুযোগ বুঝে তাদের আপনকর্ম্মে উত্তেজিত করি।

শ্রীমাধব বলেন, পার্থিব জগৎ থেকে আমাদের সুরু করতে হবে, জগতে যতক্ষণ আছ ততক্ষণ চাওয়া পাওয়ার প্রার্থনারও বিরাম নেই, তবে অভাবের সেবা হ'ব মানবজন্ম যখন লাভ ক'রেছ তখন মনুষ্যত্বের গুণাবলী অর্জ্জন ক'রে অপার্থিব জগতে যাবার চেষ্টা কর। পার্থিব জগতের পরিণাম হ'ল বদ্ধতা অন্ধতা, অজ্ঞানতা, তাকে অতিক্রম ক'রে যাওয়াই মনুষ্যত্বের জাগরণ। অপার্থিব জগতের পরিণতি হ'ল প্রজ্ঞাশীল হওয়া, মুক্তি ও মোক্ষ লাভ করা।

তিনি বলছেন, "তাঁকে" পাবার জন্য তোমাদের সাধন ভজনের প্রয়োজন নেই। যে অন্ধকারে তোমাদের আকণ্ঠ নিমজ্জিত, সেই অন্ধকার দূরীভূত করার কারণেই সাধন ভজন। অন্ধকার কেটে গেলে দেখতে পাবে, তিনি তোমাদের কাছেই আছেন।

পার্থিব জগতে দ্বৈতজ্ঞানের প্রভাব আর অপার্থিব জগতে অদ্বৈত-জ্ঞানের প্রভাব। যতক্ষণ দ্বৈতজ্ঞানে আছ ততক্ষণ সাধন ভজন, পূজাপার্ব্বণ, প্রার্থনা সবই করতে হবে। ক্রমে এই পার্থিবজ্ঞান লুপ্ত হ'য়ে যখন অপার্থিব জ্ঞান জেগে উঠবে তখন পুরো জগতটাকেই অপার্থিব ব'লে দেখবে। অপার্থিব জগতের ধর্ম্ম হ'ল দুইকে এক দেখা আর কর্ম্ম হ'ল জগতকে অভিন্ন ভেবে কর্ম্ম করা। পরিপক্ব এই

জ্ঞান নিয়ে মানুষ তখন অতিমানব হয় এবং সাধু, গুরু, বৈষ্ণব ও মহাপুরুষরূপে সাধারণ মানবমানবীকে ঐ পথে আকর্ষণ করাই হয় তাঁর একমাত্র কর্ম্ম।

অপার্থিব জ্ঞান কেউ কাউকে দিতে পারে না। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে সভায় একটি প্রশ্ন উঠেছিল,—তবে যে শুনি, শ্রীশ্রীঠাকুর নরেনকে ছুঁয়ে দিলেন, আর তাতেই নরেন অপার্থিব জ্ঞানের অধিকারী হ'ল ?

এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, এ সমস্ত কথা শুনতে ভাল, বলতে ভাল, লিখতে ভাল। এর অর্থ কি জান ? শ্রীশ্রীঠাকুর এমন একটি অমুখবাণী নরেনের কানে দিলেন যে, তার অপার্থিব জ্ঞানের চৈতন্য হ'ল। তোমরা যে অনেক সময় বল, 'আমার আধার তৈরী নয়, তাই কিছু পাচ্ছি না'। এ তো আধারের উক্তি। অবশ্য এ সান্ত্বনা নিয়েই আমরা বেঁচে আছি। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর সবাইকে সমভাবে দেন, যার যখন সময় হয়, সে তখন উপলব্ধি করে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমাধব একটি সরস কাহিনীর অবতারণা করেন। কাহিনীটি এইরূপ :—

নৈমিষারণ্যে একবার ষাট হাজার মুনিঋষির মধ্যে ক্ষোভ জাগে ক্ষোভের কারণ হ'ল, যুগযুগান্ত ধরে কঠোর সাধন ভজন ক'রেও আমরা কিছু পেলাম না, আর পাঁচ বছর বয়সের ধ্রুব শ্রীহরির দর্শন পেল। এত বড় অবিচার। সাধন ভজন সব বন্ধ ক'রে দাও।

নারায়ণ ভাবেন, 'সর্ব্বনাশ! এরা সাধন ভজন বন্ধ ক'রে দিলে জগদবাসীর শিক্ষার কি উপায় হবে? তাই তিনি নারদকে নৈমিষারণ্যে পাঠান। নারদের কাছে মুনিঋষিগণ সবিস্তারে মনের দুঃখ জানায়। নারদ বলেন, আমিও তো সেই দুঃখে বৈকুণ্ঠ ত্যাগ ক'রে চলে এসেছি, নিষ্ঠাভরে এত সাধন ভজন ক'রে তোমরা কিছু পেলে না, আর পাঁচ বছরের বালক ধ্রুব দর্শন পেয়ে গেল ? তবে

শেষবারের মত তোমরা আমার সঙ্গে নারায়ণের কাছে চল, দেখি তোষামোদ ক'রে কিছু করা যায় কি না।'

মুনিঋষিগণ বলে, 'না আর নয়, তোষামোদ তো কম করিনি। সাধন ভজনটাই তো তোষামোদ? তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সংসারে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, কেউ বা ভাবে, 'সংসারে ফিরে গিয়েই বা কি হবে? না হ'লাম সন্ন্যাসী, না হ'লাম সংসারী।' নারদ বলেন, 'তোমরা চল তো একটু আমার সঙ্গে'। আসার পথে একটি গুহা পড়ে, তার কাছে এসেতেই যেন সমস্ত মন আনন্দে ভরপুর হ'য়ে উঠে। মনে হয় এমন একজন এখানে সাধনা ক'রে গেছে যে, তার সাধনা গুহার প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে। নারদ মুনিঋষিদের বলেন, 'তোমরা তো সবাই ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞের দৃষ্টিতে দেখ, কে এমন জন? আমিও দেখছি'। নারদসহ মুনিঋষিগণ সবাই দেখেন যে, গুহার আসনে বসে আছে ধ্রুব। সে যেন বলছে, 'তোরা আর কত সাধনা ক'রেছিস? আমি যে কত বছর সাধনা ক'রেছি তার হয়ত্তা নেই, শেষবারে এসে রাজার ঘরে জন্মেছি'। তখন তারা ভাবে, 'তাই তো! এর সাধনার বছর যে গুণে শেষ করা যায় না। আমরা যা ভেবেছি তাতে আমাদের অপরাধ হ'য়েছে, আমাদের অজ্ঞানতা এখনও কাটেনি এই গুহার রজ গায়ে মাখি, তাতে যদি অজ্ঞানতা কেটে যায়'।

সংসাররূপ নাট্যশালায় জীবাত্মাভাব ও ঈশ্বরভাব

মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় প্রশ্ন ছিল—ঈশ্বর যে মানবমানবীকে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করতে পাঠান, এটা কি তাঁর পক্ষপাতিত্ব নয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, ঈশ্বরের নাটাশালায় আমি নাটক করতে এসেছি এবং যাকে যে ভূমিকায় তিনি উপযুক্ত মনে ক'রেছেন তাকে সেই ভূমিকায়ই অভিনয় করতে দিয়েছেন, এই বোধ যদি মানবমানবীর আসে, তবে যে কোন ভূমিকায় অভিনয় করতেই সে আনন্দ পায়; হ'ক সে রাজার ভূমিকা বা ভিখারীর ভূমিকা। তার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে, অভিনয়টি যেন যথাযথ হয়, আপ্রাণ সে চেষ্টাই সে ক'রে থাকে।

জাগতিক ক্ষেত্রে উঁচুদরের অভিনেতা হ'তে পারলে ভাল রোজগার হয়, পুরস্কার মেলে, আর যে অভিনেতা নাটকের চরিত্র ঠিকমত ফোটাতে পারে না, দর্শকের দরবারে তার জোটে ধিক্কার ও তিরস্কার। সংসাররূপ রঙ্গমঞ্চে এই অভিনয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই মানবমানবীর ভবিষ্যৎ কর্ম্মের সৃষ্টি হয়।

সভায় প্রশ্ন উঠেছিল ভিখারী বা কৃষকের চরিত্র অভিনয় করা রাজার ভূমিকা থেকে তো অনেক কঠিন। তার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, ভাল অভিনেতা হ'লে তারা যে কোন চরিত্রই অতি সুন্দরভাবে অভিনয় করতে পারে। যেমন আদর্শ নারী চরিত্র ফুটে উঠে, নারী যখন সংসারে স্বামী, সন্তান সন্ততি, আত্মীয় পরিজনের সেবায় আত্মনিয়োগ করে।

শ্রীমাধবের উপদেশ হ'ল, মানবমানবীর এমন কর্ম্ম করা উচিত নয় যার ফলে দুঃখভোগ হয়। যে কর্ম্ম পরিণামশীল নয়, সে কর্ম্মই তাদের করা উচিত। যখন মানবমানবীর এই বোধ জাগবে যে, সংসার নাটাশালায় সে দুদিনের অতিথি মাত্র, নাটকের পরিসমাপ্তি হ'লেই সে আপন ঘরে ফিরে যাবে, তখন আর সংসারের সুখ দুঃখ তাকে স্পর্শ করতে পারে না, কেননা সে যে জানে ক'দিন পরে এই সংসার নাটাশালা থেকে পুত্রকন্যা, আত্মীয় স্বজন সবাইকে ফেলে সে বিদায় নেবে।

শ্রীমাধব বলেন, এই প্রসঙ্গে সেদিন বলেছি যে, এই নাট্যশালায় ঈশ্বর নিজে নায়ক সেজে নাটক করেন। সে কিরকম জান?

নিষ্ক্রিয়ভাবে পরমাত্মারূপে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে রয়েছেন আবার জীবাত্মারূপে তিনি ক্রিয়মান।

জীবের জীবত্ব পরমাত্মার অভিন্ন সত্তা। এই সত্তা যখন জ্ঞান, বুদ্ধি ও চেতনার দ্বারা ক্রিয়মান হয় তখন তাকে বলে জীবাত্মা। এই জীবাত্মাভাব যখন লুপ্ত হ'য়ে যায় তখন আত্মা কিন্তু আত্মাই থেকে যায়, কেননা আত্মার তো কোন ক্ষয় নেই। এই সমস্ত গুহ্য তত্ত্ব জানার জন্যই সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের সঙ্গ করা উচিত। তাঁদের বাণী শুনে যখন প্রকৃত জ্ঞান হয় তখনই বোঝা যায় যে, আত্মা কোন সুখ দুঃখ ভোগ করে না, জীবাত্মাভাবই এই সুখ দুঃখ ভোগ করে।

ঈশ্বর বলেছেন 'আমি যা কিছু করছি সবই আমার নিজের আনন্দের জন্য, জীবের জন্য নয়।' জীবের যদি দুঃখ হয় যে, সংসারে এসে শুধু দুঃখভোগই করছি, তখন যদি সে ভাবে যে, আমিই অনন্তরূপে, অনন্তভাবে, অনন্ত চরিত্র গ্রহণ ক'রেছি, আমি ছাড়া জগতে আর কিছু নেই, জীবও আমি শিবও আমি, তবে তো আর তার দুঃখ পাবার কিছু কারণ থাকে না। প্রকৃতিরূপে আমি ধারণ করি, পুরুষস্বরূপে আমি ধারণ করাই। পরমপুরুষ, বিরাটপুরুষ, সাধারণ পুরুষ, এ তিন পুরুষই যে আমি। পরমপুরুষ বলতে আমি পরমাত্মা, আর সমগ্র বিশ্বের সমষ্টি আমি, তাই আমি বিরাটপুরুষ। বিরাট অর্থে বিশ্বসৃষ্টির পর আমার এই বিশ্বরূপ দেহে কীটপতঙ্গ, পশুপাখী, স্থাবরজঙ্গম, সবারই স্থান রয়েছে, আমি তাদের সকলের সমষ্টি তাই আমি বিরাট।' শ্রীমাধব বলেন, হিরণ্যগর্ভে অণ্ডরূপে বিরাটপুরুষের সৃষ্টি। সেই অণ্ডে সৃষ্টি হ'ল চব্বিশ তত্ত্ব, নয়টি দ্বার এবং অনন্ত লোমকূপ, কিন্তু ক্রিয়মাণ হ'ল না। সমস্ত কিছু প্রবেশের পথ থেকেও ক্রিয়া নেই। চক্ষুদ্বারে দৃষ্টিশক্তিরূপে, নাসিকাছিদ্রে

গন্ধরূপে, জিহ্বায় রসরূপে, কর্ণে শ্রবণশক্তিরূপে এবং ত্বকে স্পর্শরূপে প্রবেশ ক'রেও ক্রিয়মাণ হ'তে পারল না। কিন্তু যখন হৃদয়গর্ভে চিত্তের মাধ্যমে চৈতন্যশক্তিরূপে প্রবেশের পথ পেল তখনই চেতনা জাগ্রত হ'য়ে ক্রিয়মাণ হ'ল অর্থাৎ চৈতন্য ছাড়া ক্রিয়া নেই।

ঈশ্বর বল্‌ছেন; 'এই বিশ্বনাট্যশালায় আমি নটবর। এ বিশ্বে আমিই যে সব, আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমি নিজে বহু হ'য়ে এই অনন্ত বিশ্বরূপে সেজেছি, আমার আনন্দের জন্য বিশ্বের এই খেলা-ঘরকে মনের মত ক'রে সাজাই, আমি তো কারুর আপেক্ষিক নই!'

শ্রীমাধব বলেন, 'আমিই সব,' এই ভাবটিই বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ। তুমি যে ঈশ্বরেরই অভিন্ন সত্তা এই বোধ যদি মানবমানবীর গোড়াতেই এসে যায় তবে যে বিশ্বসংসার অচল হ'য়ে যাবে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য যে 'নেতি নেতি' ভাবের কথা বলেছেন তাও এই একই কথা। সংসারে যখন এসেছ তখন ন্যায়ের পথ এবং ক্রমের পথ ধরেই তোমাকে চলতে হবে। দেহবুদ্ধি ও ঈশ্বর বুদ্ধিকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলনা। দেহবুদ্ধি নিয়ে সংসার কর আর অন্তরে ঈশ্বরবুদ্ধি বা ঈশ্বরভাব রাখ, তবেই একদিন তুমি যে তাঁর অভিন্ন সত্তা সে কথা উপলব্ধি ক'রে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পৌঁছাতে পারবে। ভূতেন্দ্রিয় মনোময় দেহকে ক্রমের পথে এবং নিষ্ঠার সহিত যারা পরিচালনা করতে পারে, তারাই এ জগতসংসারে পাকা অভিনেতা। যে কোন ভূমিকায়ই তারা উৎকৃষ্ট অভিনয় করতে সক্ষম। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে সংসারধর্ম্ম পালনের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। সংসারে থেকেও তাঁকে স্মরণ, মনন, ধ্যান ধারণা করতে বাধা কোথায়? বর্ত্তমান যুগে সংসার ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। পাকা অভিনেতা হ'য়ে সংসারে অভিনয় কর আর অন্তরে কৃষ্ণভাবে ডুবে থাক। অন্তরে যেন জীবভাব না থাকে। জীবভাবটি হ'ল বাহ্যিক সংসার পরিচালনার জন্য; চিত্তে জীবভাবের স্থান নেই। জীবত্বভাব অর্থাৎ

ভূতেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া যতক্ষণ আছে মনের ক্রিয়াও ততক্ষণই থাকবে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হ'ল মনাতীত অবস্থা, তাই সেখানে মনের কোন ক্রিয়াকর্ম্ম নেই।

শ্রীমাধবের মতে আমরা যখন সংসারে এসেছি তখন সুচারুরূপে সংসার ধর্ম্ম পালন করাই আমাদের কর্ত্তব্য. সে স্থলে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হওয়াটাই ব্যতিক্রম। উপমা স্বরূপ তিনি বলেন, নারায়ণ সাক্ষী ক'রে যে স্ত্রীকে তুমি গ্রহণ ক'রেছ, তাকে ভরণপোষণ না ক'রে ঈশ্বর অন্বেষণে সন্ন্যাস গ্রহণ করা তো ব্যতিক্রমের কাজ হবে। আগেকার যুগে সন্ন্যাসী বা সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের প্রতি লোকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল কিন্তু মনের সঙ্কীর্ণতার প্রভাবে সে ভাব আমাদের লুপ্ত হ'য়ে গেছে। কাজেই বর্ত্তমান যুগে সাধারণ মানবমানবীর পক্ষে সন্ন্যাস নেবার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে। শ্রীমাধব বলেন, এ যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাই বাইরে নিষ্ঠার সহিত সংসার করা এবং অন্তর্সন্ন্যাস গ্রহণ করাই বিধেয়।

তিনি বলেন, সন্ন্যাস নেবার প্রকৃত কারণ হ'ল রিপুদমন। সংসারে থেকেও এটি করা যায়। ভোগের বস্তু সম্মুখে থাকতেও যার ভোগের স্পৃহা থাকে না, সেই তো প্রকৃত সন্ন্যাসী। রিপুদমনের জন্য বনে জঙ্গলে, গুহায় যাবার আজ আর প্রয়োজন নেই। আগেকার যুগে অবশ্য এর প্রয়োজন ছিল, কেননা সংস্কারপূর্ণ রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদির জন্য সংসার ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হ'ত। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস নেবার কারণও ছিল এই সমাজ পরিবেশ। তিনি যখন প্রবলভাবে আধ্যাত্ম আলোচনা ও নামের প্রচার করতে লাগলেন, তখন ভক্তদের কাছ থেকে চাল, ডাল প্রভৃতি নানা সামগ্রী ভেটরূপে আসতে থাকে। তাতে এক শ্রেণীর লোক নানা বাহানা দেখিয়ে তাঁর উপর অত্যাচার সুরু করে। তখন মহাপ্রভু ভাবেন, এভাবে চললে আমি বিষয়ী ব'লে প্রমাণিত হব

এবং যে উদ্দেশ্যে আমার জগতে আসা, তা পণ্ড হ'য়ে যাবে, তাই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

শ্রীমাধব বলেন, ক্রম কথাটি হ'ল বিশ্বজনীন, আপেক্ষিক নয়। তাই তিনি সংসারে সর্ব্বদা ক্রমে চলবার উপদেশ দিয়ে থাকেন। যাঁরা নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে আমাকে লালন পালন ক'রেছেন, তাঁদের সেবা করা এবং যারা আমার আশ্রিত তাদের প্রতিপালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এখানে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি বা সমাজ-নীতি প্রভৃতি কোন নীতিরই স্থান নেই। এটি হ'ল মনুষ্যত্বের প্রকাশ।

সভায় প্রশ্ন উঠেছিল; শ্রীশ্রীঠাকুরের আমলেও কি সন্ন্যাস নেওয়ার প্রয়োজন ছিল? এ কথার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে থেকে নরেনের বিবেক বৈরাগ্য এসেছিল। তাই তিনি বিবাহ করেন নি এবং সন্ন্যাস বেশ নিয়েছিলেন। তাঁর অনুকরণ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্য শিষ্যরাও সন্ন্যাস নিয়েছিলেন কিন্তু তাই ব'লে স্বামীজী কাউকে সন্ন্যাস নিতে বাধ্য করেন নি। দশের ও দেশের সেবা করাই যাদের জীবনের মূলমন্ত্র তারা অনেকে বিবাহ করে না, তবে সংসারে সবাই বিবাহ না ক'রে থাকবে, এমন তো হ'তে পারে না। ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডী পেরিয়ে বৃহৎ বিশ্ব-সংসারের ভার যারা বহন করতে চায়, তারা ক্ষুদ্র সংসারে প্রবেশ করে না, কারণ তাতে সংসার ধর্ম্ম তো সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব হয় না।

বর্ত্তমান যুগ হ'ল অন্তর্সন্ন্যাসের যুগ। তোমার অন্তর যে সন্ন্যাসী সে কথা যেন তোমার ইন্দ্রিয়ও না জানে বা তোমার পুত্রকন্যাও টের না পায়। এটি অভ্যাসযোগ দ্বারা সম্ভব। আত্মীয় পরিবার সকলের সঙ্গেই তোমার আচরণ হবে ত্রুটিহীন, কর্ত্তব্যে কোন অবহেলা থাকবে না, বাহ্যিকভাবে যার যা প্রাপ্য তাকে তা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং অন্তরে তুমি হবে সন্ন্যাসী।

শ্রীমাধব বলেন, আমাদের মন অন্ধ, ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় সে চলে, তাই সে অস্থির এবং চঞ্চল। মনস্থির করার অর্থ হ'ল মনের একাগ্রতা এবং এটিকেই সঙ্কল্প বলা চলে। সঙ্কল্প দুইভাবে হ'তে পারে—১) আধ্যাত্ম বিষয়ে ২) ও জাগতিক বিষয়ে।

আধ্যাত্ম বিষয়ে আমরা সঙ্কল্প করি, দিনান্তে একবার অন্তত ঈশ্বরের নাম করব, তাতে যেন কোন বাধা না আসে।

জাগতিক বিষয়ের সঙ্কল্পের মধ্যে পড়ে বাড়ীঘর, ধনসম্পদ, স্ত্রী, পুত্রকন্যার প্রতি কর্ত্তব্য করা।

কাজেই সঙ্কল্পের সাহায্যেই আমাদের মনের একাগ্রতা আনতে হবে। যে সমস্ত চিন্তা বা কর্ম্মের দ্বারা মনে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, জ্ঞান ও যোগের দ্বারা তাদের নিরোধ করতে হবে। মনের স্বভাবই চঞ্চলতা, গতিশীল বায়ুর ন্যায়, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত্ত বায়ু যেমন শান্তি ও আনন্দ দান করে, ক্লান্তি দূর করে, তেমান মনের স্বাভাবিক চঞ্চলতা সাধন পথে তেমন ক্ষতিকারক নয়। তবে উত্তাল বায়ু যেমন ঘূর্ণিঝড়ের আগমন সংকেত জানিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করে তেমনি মনে যদি চাঞ্চল্যকর ঝড়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তবে আধ্যাত্ম সঙ্কল্পও বানচাল হ'য়ে যেতে পারে। মনের স্বাভাবিক চরিত্রকে বা আদি প্রকৃতিকে নিরোধ করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়; তবে মনের মধ্যে চাঞ্চল্যকর যে ঝড়ের সৃষ্টি হ'তে পারে তাকে নিরোধ করার জন্যই বহুধা সাধ্য সাধনা।

শিক্ষাক্ষেত্রে সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের অবদান

মঙ্গলবারের আলোচনা সভায় প্রশ্ন ছিল লোক শিক্ষায় সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের অবদান কি?

আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমাধব বলেন, প্রকৃষ্ট ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, সাধারণ জাগতিক জীবনে পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয় স্বজন অর্থাৎ যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁরা সকলেই কনিষ্ঠদের কল্যাণ কামনায় নানা উপদেশ নির্দ্দেশ দিয়ে থাকেন। বড যাঁরা তাঁরা ছোটদের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। আমরা যাতে জীবনপথ সুশৃঙ্খলভাবে এবং সুখে শান্তিতে কাটাতে পারি সেজন্য তাঁরা সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন হ'য়ে থাকেন। শিশুকে পিতামাতা, দাদা দিদি বুলি শেখান, বস্তু জ্ঞান এনে দেন এবং যতদিন না সে পূর্ণবয়স্ক হ'চ্ছে ততদিন বিদ্যায়তনে নানা বিদ্যায় অধ্যয়নরত থেকে সফল জীবন যাপনের নানা শিক্ষা সে গ্রহণ করে। তাই বলা যায় জীবনপথের প্রস্তুতি পর্ব্বে যত রকমের অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা সবই সে পায় বডদের কাছ থেকে। পিতামাতা, ভাইবোন, পাড়া-প্রতিবেশী, সাধু, গুরু, বৈষ্ণব, শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, সবারই উদ্দেশ্য হ'ল একটি এবং সেটি হ'ল শিশু ও মানবমানবীর জীবনপথকে সত্য এবং সুন্দরের পথে পরিচালিত করা।

কাজেই দেখা যায় সব শিক্ষাই আমরা পেয়ে থাকি যাঁরা বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান এবং চিন্তাধারায় শ্রেষ্ঠ তাঁদের থেকে। সাধারণ জাগতিক অবস্থা থেকে গুরু পর্য্যন্ত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অবস্থা পর্য্যন্ত শিক্ষার এই একই ধারা। বয়োজ্যেষ্ঠ যাঁরা, সমাজের ক্ষেত্রে তাঁরা সামাজিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ধর্ম্মগুরুর কাছে আমরা ধর্ম্মশিক্ষা পেয়ে থাকি। ঋষিদের কাছে যাগযজ্ঞাদির শিক্ষা পাই। এইভাবে সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ঋষিনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সব নীতিতেই শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

এ শিক্ষা যে কেবল মানুষের ক্ষেত্রেই দেখা যায় তা নয়, পশু পাখীরাও তাদের পিতামাতা এবং সগোত্রীয় পশুপাখীর কাছে শিক্ষা পায়, তবে মানুষ যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে পাঁচটি নীতির উপর নির্ভরশীল,

তাদের সে ধারা নেই। তবুও মানুষের মত পশুপাখীর জীবনেও আহার, নিদ্রা এবং মৈথুন আছে। মৈথুন না থাকলে সৃষ্টি লোপ পায়, আহার না থাকলে দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'তে পারে না, নিদ্রা না থাকলে শরীরের ক্ষয়পূরণ সম্ভব হয় না। কাজেই সব জীবেরই এসব আছে। মানুষের মধ্যে এই আহার, নিদ্রা এবং মৈথুনের ক্ষেত্রে কখন কখন পশুবৃত্তি বা পশুস্বভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে একটি বিষয়ে মানুষ পশুকুল বা পক্ষীকুল থেকে উন্নততর জীব। সেটি হ'ল মানবমানবীর অন্তরে ঈশ্বরানুভূতিরূপ যে বৃত্তি আছে, অন্যের সেই বৃত্তির অধিকার আর কোন জীবের নেই। এই ঈশ্বরবৃত্তি মানবমানবীকে সর্বজীবের শ্রেষ্ঠ জীব. এই সম্মানে ভূষিত করেছে। এই বৃত্তি দ্বারাই মানুষ প্রমাণ করতে সক্ষম হ'য়েছে যে, মনুষ্যত্বই ঈশ্বরের শক্তি সত্তা এবং ঈশ্বরের সমস্ত লীলা একমাত্র মানবমানবীই প্রকাশ করতে পারে।

জীবনপথে সরল এবং উন্নত ধারায় চলার সূত্রপাত যেমন আমরা বড়দের কাছে পাচ্ছি, তেমনি বিপথে চলার সূত্রও তাদের কাছেই পাই। বড় এবং শ্রেষ্ঠ যাঁরা, তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের মঙ্গল চান, আমাদের প্রকৃত মানুষ ক'রে গড়ে তুলতে চান, আমরা সৎপথগামী হই এটিই তাদের একমাত্র কামনা থাকে। আবার আর একদল বয়োজ্যেষ্ঠ আছে যারা নিজেরাও চলে এবং সেই দল যাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেজন্য অবশ্য দশজনকে বিপথে টেনে আনবার চেষ্টায় কুশিক্ষার বীজ বপন করে।

মনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, তবে তো জাগতিক শিক্ষা দ্বারাই জীবনপথ সুখময় ক'রে তোলা হয়? শ্রীমাদেব বলেন, তা যায়, তবে তার পরিধি সীমিত।

জাগতিক ক্ষেত্রে পিতামাতার শিক্ষা অনেক দিক থেকেই উপকারী এবং সহায়ক. কেননা আমার জগতে আগমনের সূত্রও

তাঁরা এবং প্রথম গুরুও যে তাঁরাই। আবার অধ্যয়ন গুরুর কাছে শিক্ষা পাই, তাতে আমাদের উপার্জ্জনশীল হ'তে সাহায্য করে এবং সমাজে আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে চলতে সহায়তা করে।

কিন্তু এই জাগতিক জীবনের সুখ এবং আনন্দই তো আমাদের পূর্ণানন্দের স্বাদ মেটাতে পারে না তাই পূর্ণানন্দের খোঁজে আমরা অধ্যাত্ম জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। অধ্যাত্ম জীবনে পরম ও চরম শিক্ষা লাভ করা যায় সাধু, গুরু, বৈষ্ণব ও অবতারগণের উপদেশ নির্দেশ পালন ক'রে। তাঁরা যে শিক্ষা দেন, তাতে অন্ধকারময় কূপ থেকে আলোতে যাবার পথ প্রশস্ত হয়। কাজেই জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় প্রকারের শিক্ষাই মূল্যবান এবং স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী এই উভয় প্রকার শিক্ষাই প্রাধান্য লাভ করে।

শ্রীমাধব বলেন, কখন কোন্ শিক্ষা মনের থেকে বাদ দেব এবং কোন্ শিক্ষা গ্রহণ ক'রে অন্ধতা থেকে মুক্ত হ'তে পারি সেই সমস্ত ভাগ ক'রে দেখে সেইভাবে চলা প্রয়োজন। আবার যে শিক্ষায় বিপথগামী হ'য়ে পরিণাম ভোগ করছি তার বীজ উৎপাটন করাও কি কর্ত্তব্য নয়? তাই যদি কর্ত্তব্য হ'য়ে থাকে, তবে তাকে কি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা যায়?

শ্রীমাধব বলেন, হ্যাঁ, তা যায়। সাধুর উপদেশমন্ত্র এবং নামরসে বিপথগামী শিক্ষার বীজ বিনষ্ট হয়। তবে কোন্ কোন্ মন্ত্রে তা সম্ভব, সে খবর সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের কাছে জেনে নেওয়া উচিত। কেননা আগাছার বীজ তুলে জমি পরিষ্কার করতে হয়। তা নইলে ব্রহ্মবীজমন্ত্র পেলেও আশে পাশে আগাছার বীজও বাড়তে থাকে। একদিকে সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের উপদেশমন্ত্রে তোমার মধ্যে যেমন উত্তম গাছের বীজ বেড়ে চলেছে, তেমনি ষড়রিপু অষ্টপাশের বৃত্তিতে আগাছার বীজও আপনা থেকেই অঙ্কুরিত হ'চ্ছে। একই সঙ্গে যদি

আগাছার বীজও অঙ্কুরিত হ'তে থাকে তবে উত্তম গাছ আশানুরূপ বৃদ্ধি পেতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ফুলে ফলে সুশোভিত হ'য়ে উঠতে পারে না। আগাছায় সারের প্রয়োজন নেই, সে আপনি বেড়ে উঠে, ষড়রিপু ও অষ্টপাশই তার সারের কাজ করে কিন্তু ব্রহ্মবীজে সারের প্রয়োজন আছে। সাধু, গুরু এবং বৈষ্ণবের উপদেশ মন্ত্রই এক্ষেত্রে সারের যোগান দেয়। সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের বাণী ব্রহ্মবীজের সার স্বরূপ, আর দীক্ষামন্ত্র হ'ল সুবৃক্ষের বীজ।

শ্রীমাধব বলেন, বিপথগামী ব্যক্তি সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের শিক্ষা গ্রহণ করে না। রিপু ও অষ্টপাশগুলি তো নীজে সার রয়েই গেছে, তাই তাদের বৃদ্ধিও হয় প্রবল পরাক্রমে। শ্রীমাধব বলেন, সেজন্য ভাল ফসল পেতে হ'লে জমিনের যত আগাছা সব তুলে পরিষ্কার করতে হয়, তবেই শস্য সবল হবে এবং উৎপন্ন শস্য থেকে উপযুক্ত পরিমাণ ফসল পাওয়া যাবে। উপমা স্বরূপ তিনি বলেন, যেমন সর্ষের ফলন ভাল হ'লে তার থেকে প্রচুর সর্ষের তেল পাওয়া যায়।

গুরু বীজমন্ত্র যখন অঙ্কুরিত হয় তখনও মাঝে মাঝে আগাছা অর্থাৎ ষড়রিপু ও অষ্টপাশ তাকে ঢেকে ফেলবার চেষ্টা করে ব'লে আমরা বিপথগামী হই এবং সেইরূপ কর্ম্ম ক'রে থাকি, যার ফলে আমি ও আমার বোধ থেকে মুক্ত হ'তে পারি না। দেহ-মন্দিরের কৃষক আমি, এই সংসার ও পুত্র পরিবার আমার, আমিই কর্ত্তা এই অহং ভাব যতদিন মানবমানবীর মনে প্রভাব বিস্তার করে, ততদিন গুরুর কাছে বীজমন্ত্র পেয়েও সে ভগবৎপথী হ'তে পারে না। তাই দেহ-জমিনের আগাছাকে নির্মূল ক'রে উপযুক্ত ফলনের জন্য আমাদের প্রস্তুত হ'তে হবে। অর্থাৎ আগাছারূপী ষড়রিপু ও অষ্টপাশের কবল মুক্ত হ'তে পারলে গুরু বীজমন্ত্র অঙ্কুরিত হ'য়ে 'আমি ও আমার' ভাব চলে যাবে এবং ব্রহ্মবীজরূপ সুবৃক্ষ ফুলে ফলে

সুশোভিত হ'য়ে উঠবে। তখন দেখা যাবে প্রকৃতপক্ষে এ জমিনের কৃষক আমি নই, স্বয়ং গুরু।

প্রশ্ন আসে, তিনিই যদি জমিনের প্রকৃত মালিক এবং কৃষক তবে আমার সাধন ভজন বা সার দেবার কি প্রয়োজন ?

শ্রীমাধব বলেন,- তিনি মালিক একথা জেনেও সাধন ভজন আমাদের করতেই হবে, কেননা এই সাধন ভজনের দ্বারাই আগাছাকে উপড়ে ফেলা যায়। অনাদিকালের বহির্মুখতারূপ যে আবর্জ্জনা জমে আছে তা তো আমাকেই পরিষ্কার করতে হবে। আমিত্ব বুদ্ধিতেই যখন আবর্জ্জনার সৃষ্টি তখন সেই আমিত্ব বুদ্ধির কাঁটা দিয়েই সে আবর্জ্জনা তুলতে হবে. কেননা আমিত্ব বুদ্ধিকেই আমরা ভালবাসি, এটা আমাদের সয়ে গেছে। শাস্ত্ররূপ অস্ত্রের সাহায্যে এই আমিত্ব বুদ্ধির আবর্জ্জনাকে কর্ত্তন করতে হবে। মন্ত্রও অস্ত্র, বেদের বিধানও অস্ত্র, গুরুমন্ত্রও মহাঅস্ত্র। 'আমি ও আমার' বুদ্ধি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ভাবতে হবে ঈশ্বরই মালিক, তিনিই কৃষক, আমাকে তাঁর কাছে পৌঁছাতে হবে। সেখানে পৌঁছাতে হ'লে স্তরে স্তরে সাধু, গুরু, বৈষ্ণব ও শাস্ত্রের নির্দ্দেশে এগিয়ে চলতে হয়। জীবনপথের ক্রমবিশেষ উপদেশ নির্দ্দেশই একমাত্র আলো।

জীবনের প্রথম পদক্ষেপে আমরা পাই পিতামাতার শিক্ষার আলো, তারপর আসে শিক্ষাগুরুর অধ্যয়নের আলো, এবং শেষ পর্য্যায়ে গ্রহণ করি সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের উপদেশ নির্দ্দেশরূপ আলো। বিভিন্ন পর্য্যায়ের দীপশিখা একে একে রাতের নিষ্প্রভ আলো কাটিয়ে দিনের সূর্য্যালোকে আমাদের পৌঁছে দিচ্ছে। দিনের সূর্য্যালোক হ'ল ঈশ্বরানুভূতি আর রাতের আলো হ'ল সাধু, সন্ত, বৈষ্ণব এবং শাস্ত্রের উপদেশ নির্দ্দেশ।

শ্রীমাধব বলেন, সুশিক্ষা ও সৎশিক্ষা এ দুটি কথা এক নয়। আমাদের যতরকম কুশিক্ষা আছে তাকে দূরীভূত করতে যে শিক্ষা

আমরা গ্রহণ করি তাকেই সুশিক্ষা বলা চলে, আর সংশিক্ষা বলতে, সত্যপথের শিক্ষা। সংশিক্ষা পেয়েও যদি মানবমানবী অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তবে তাকে অসৎ শিক্ষা বলা যায়।

শ্রীমাধব বলেন, যতদিন আমরা পার্থিব জগতে আছি, ততদিন সৎ এবং অসৎ পাশাপাশি চলতে থাকবে। কারণ অসৎ এর পরিণামস্বরূপ যে শাস্তি সেই শাস্তি মানুষকে সৎ পথে নিয়ে যায়, তা নইলে মানুষ সৎ হ'তে পারত না। একজনের দুঃখদৈন্য বা পরিণাম দেখে অসৎ পথ থেকে কেউ বা ফিরে আসে, আবার পরিণাম ভোগ ক'রে কারো কারো চৈতন্য জাগ্রত হয়।

সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, পরিণাম থেকেই ভয়ের সৃষ্টি এবং অপরের ভয়াবহ পরিণামের কথা চিন্তা ক'রে অনেকেই সৎপথানুগামী হয়।

জগৎ-বৃক্ষ

গত মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্তের একটি প্রশ্ন ছিল—সাধনার বিভিন্ন স্তর কি?

সাধনার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে এক মঙ্গলবারের আলোচনা সভাতেই শ্রীমাধব এই প্রশ্নের মীমাংসা দিয়েছেন। অনেক সময় দেখেছি শিষ্য এবং ভক্তরা প্রকাশ্যে কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করলেও, তাদের মনে যে সব জিজ্ঞাসা উঁকি ঝুঁকি মারে, শ্রীমাধব তাঁর আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান দিয়ে থাকেন।

সেই পরিপ্রেক্ষিতেই হয়তো আজকের আলোচনার প্রারম্ভে তিনি সুরু করেন যে, জগৎটি একটি বৃক্ষস্বরূপ। বৃক্ষটি অতি অদ্ভুত।

সাধারণ বৃক্ষের স্বাভাবিক প্রকৃতি হ'ল তার মূল বা শিকড় থাকে মাটির নীচে, আমাদের দৃষ্টির অগোচরে এবং কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতি থাকে মাটির উপরে। জগৎ বৃক্ষটি কিন্তু তার বিপরীত, তার শিকড় থাকে উপরের দিকে অর্থাৎ উর্দ্ধমুখে এবং কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা, পাতা, ফুল ফল হ'ল নীচের দিকে।

এই বৃক্ষের সৃষ্টি হয় পরম সত্য হতে কিন্তু সত্যযুগটি এই বৃক্ষের শিকড়স্বরূপ, তাই সত্যযুগই হ'ল তার মূল বা শিকড়। ক্রমান্বয়ে জগৎ-বৃক্ষে সৃষ্টি হ'ল কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা, পত্র পল্লব, ফুল, ফল অর্থাৎ ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগ।

মূল থেকে যখন কাণ্ডের উৎপত্তি হ'ল তখন তার নামকরণ হ'ল ত্রেতা, কেননা কাণ্ডের তিনটি শাখা অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ সম্পন্ন।

দ্বাপর যুগে জগৎ-বৃক্ষে শাখাপ্রশাখা, পত্র পল্লব ও ফুল পর্যন্ত প্রস্ফুটিত হয়েছে। পূর্ণ অবতারীর পূর্ণ লীলা রূপ নিয়েছে এই দ্বাপর যুগে। এই যুগের ফুল ঝরে গিয়ে যে কলি (কড়া) রূপ নিয়েছে সেটিই হ'ল কলিযুগ। আবার এই কলি যেদিন ফলে রূপায়িত হ'য়ে পরিপক্কতা লাভ করবে এবং বৃক্ষ থেকে খসে পড়বে সেদিনই কলিযুগের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

শ্রীমাধব বলেন ব্রহ্মাণ্ডসহ সমস্ত জীব নিয়েই এই ফল। সম্পূর্ণ বৃক্ষটি বীজের মধ্যে নিহিত ছিল। সত্যের মধ্যেই ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি সূক্ষ্মভাবে লুকিয়ে ছিল তাই সত্যযুগে ছিল কেবল মূল বা শিকড়।

সত্যযুগের মানুষ সত্ত্বের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল, তাই সত্যযুগকে বলা হয় পূর্ণ সত্যের যুগ অর্থাৎ চারপাদই সত্য। সে যুগে অধর্ম্ম ব'লে কিছু ছিলনা, মানব মানবীর স্মরণশক্তি এবং শ্রুতিশক্তিও ছিল প্রখর, তাই সব কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখা সম্ভব হ'ত। তার পরের

যুগ অর্থাৎ ত্রেতা যুগে সত্ত্বের প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম তাই মানব-মানবীর মধ্যে ধর্ম্মের প্রভাব ছিল বার আনা ও অধর্ম্মের প্রভাব অধিকার ক'রে নিল চার আনা অংশ, সেজন্য ত্রেতাকে একপাদ পাপ ও তিনপাদ পুণ্য বলা হয়।

তারপর আসে দ্বাপর; সেখানে পাপ ও পুণ্যের অংশ হ'ল আধাআধি, আর কলিযুগে একপাদ পুণ্য এবং তিনপাদই পাপ। এটি হ'ল শাস্ত্রীয় বিচার।

সত্যযুগের পুরাণ পাঠে জানা যায় যে অনাচার, ব্যভিচার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এসব সে যুগেও ছিল তবে এ যুগের মত প্রকট নয়। শ্রীমাধব বলেন ত্রেতাযুগেও রাজা এবং ভিখারী সবই ছিল। দ্বাপর যুগের অনাচার, অত্যাচার, ব্যভিচারের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। বিশ্ববিখ্যাত ভগবদ্গীতা তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রশ্ন জাগে, কলিযুগে কি ধর্ম্মের কোন প্রভাবই নেই, অধর্ম্মের প্রভাবে কি সারা বিশ্ব ছেয়ে গেছে?

শ্রীমাধব বলেন সত্যযুগে অধর্ম্ম যদি আদৌ না থাকে, তবে ধর্ম্মের প্রশ্ন উঠে কি ক'রে? তবে শাস্ত্রের কথা কি মিথ্যে? শ্রীমাধব বলেন শাস্ত্রের কথা মিথ্যা নয়। সে সকল যুগের ষোল-আনাই পুণ্য ছিল অথবা তিনভাগ বা আধাআধি পুণ্য ছিল, এ কথার প্রকৃত অর্থ হবে কি?

শ্রীমাধব বলেন, এর অর্থ হ'ল সে যুগে যারা ধর্ম্মাত্মিক তারা ধার্ম্মিকই ছিল তবে যাদের ধর্ম্মে বা ভগবানে বিশ্বাস ছিল তাদের ষোলআনা বিশ্বাসই ছিল, কোন দ্বিধা বা সংশয় ছিল না। তিনি বলেন এই পরিপ্রেক্ষিতেই বলা হয় যে, সত্যযুগে ষোলআনাই পুণ্য ছিল, পাপ ছিল না অর্থাৎ যারা ভগবৎপথী ছিল তারা ষোলআনা বিশ্বাস নিয়েই ধর্ম্মপালন করত।

শ্রীমাধব বলেন, কলিযুগে অভাব, অনটনে পড়ে লোক পাপ করে,

চুরি ডাকাতি করে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে অভাব অনটন এত তীব্র ছিল না, তবে ষড়রিপু ও অষ্টপাশের কবল থেকে সে যুগের লোকও মুক্ত হ'তে পারেনি।

ওখনকা'র যুগে যারা ধর্ম্ম পথ অনুসরণ করে চলত তাদের ভগবানে পূর্ণবিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল, কোন বিচার ছিল না। এ যুগে এক পা এগোতেই লোকে কেবল বিচার করে।

শ্রীমাধবের মতে জগতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জীবনপথে বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হ'য়েছে। যাদের ছোট সংসার, সন্তান সন্ততি কম তাদের সংসারে তেমন অভাব, অনটন ও বিশৃঙ্খলতার সম্মুখীন হ'তে হয় না কিন্তু যাদের পরিবার বড়, বহু সন্তান সন্ততির ভরণ পোষণের যোগান দিতে হয়, তাদের সংসারে যত ভাবনা, চিন্তা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাই তিনি বলেন জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যুগ পরম্পরায় মানবমানবীর জীবনপথও জটিলতর হ'য়ে উঠেছে এবং সে কারণেই ধর্ম্মবিশ্বাসও ক্রমশ শিথিল হ'য়ে পড়েছে।

এই কারণেই অন্তর্বিচারে দেখা যায় কলিযুগে মানবমানবীর মধ্যে চার আনা ধর্ম্ম বিশ্বাস ও ধর্ম্ম নির্ভরতা আছে আর বাকী বারোআনাই অধর্ম্মে ছেয়ে গেছে। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সংসারে মানবমানবীর মনে ধর্ম্মের প্রতি এই অনাস্থার কারণ হ'ল লোক সংখ্যা বৃদ্ধি, জাগতিক জীবনের অভাব, অনটন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিশৃঙ্খল জীবনযাপন।

শ্রীমাধব বলেন, এ যুগে যে বার আনা বিশৃঙ্খলা আমাদের জীবনপথকে বিষময় ক'রে তুলছে, ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত ক'রেছে, সেখানে যদি ঈশ্বর নিজগুণে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে না আনেন তবে আর কারো দ্বারা সেটি সম্ভব নয়। তিনি নিষ্ক্রিয় হ'লেও পাঞ্চভৌতিক মনোময় দেহের মধ্যে বিকাশ প্রকাশ হ'য়ে এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতেও শৃঙ্খলা স্থাপন করতে পারেন, কেননা এখানে

তিনি সক্রিয়। শ্রীমাধবের মতে এই কলিযুগেও আমাদের ভয় পাবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের উপদেশ নির্দ্দেশ মত আন্তরিকভাবে গুরুপথে বা ঈশ্বরপথে চলতে পারলেই আমরা অন্ধকার থেকে আলোতে পৌঁছাতে পারব।

ছোট বড উভয় প্রকার সংসারেই বিশৃঙ্খলা আছে তবে বড সংসারে বিশৃঙ্খলা বেশী তাই সেটি লোকের চোখে পড়ে। জগতে জনসংখ্যা যত বাড়ছে বিশৃঙ্খলাও তত প্রকট হ'চ্ছে। বড পরিবারে অভাব, অনটন ও অকুলন লেগেই থাকে এবং সেই কারণে তারা যদি বিশৃঙ্খলার শিকার হয় তবে তাদের কি দোষ দেওয়া যায়? এটাই আজকাল পাপ বলে গণ্য হয়।

সত্যযুগে কোন অভাব ছিলনা। মাঠে ধান কেটে ফেলে রাখলেও কেউ নজর দিত না, আর আজ একথা আমরা চিন্তাই করতে পারি না।

লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কীটপতঙ্গ, পশুপাখীরও বংশ বৃদ্ধি হ'চ্ছে এবং মানবমানবীর জীবনে বিশৃঙ্খলা ঘটানর জন্য তারাও অনেকাংশে দায়ী।

ফসলের ফলন আগের থেকে যদিও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তাহ'লেও লোকসংখ্যার অনুপাতে তা নগন্য।

পূর্ব্বে নানাভাবে সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করা হ'ত। মেয়েরা পর্দ্দানশীন ছিল অর্থাৎ তাদের আব্রু ছিল। এই আব্রুর ভালমন্দ দুটি দিকই আছে। একদিকে এটি ছিল তাদের বন্দীদশা অপরদিকে এই আব্রু শৃঙ্খলা রক্ষার সহায়ক ছিল। সে যুগে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান, সেবাপূজা ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধর্ম্মের লোক একত্রিত হ'য়ে উৎসবের আনন্দে অংশগ্রহণ করত, কারুর মধ্যেই কোন রেষারেষির ভাব ছিল না।

শ্রীমাধব বলেন, জগতে বিশৃঙ্খলা আসার কারণ প্রধানতঃ তিনটি।

১) জনবহুলতা ২) সৃষ্টির কারণে আমাদের পুণঃ পুণঃ জগতে আগমন ৩) কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি ষড়রিপুর আধিপত্য।

জনবহুলতার কারণে মানুষে মানুষে বৈষম্য বেড়ে গেছে, কেউ কোটিপতি কেউবা পথের ভিখারী। লোকের অভাব বৃদ্ধির কারণেই দাসবৃত্তির সৃষ্টি। মানুষে মানুষে প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক স্থাপিত হ'য়েছে। কিন্তু এ মনোভাব তো জগতের মঙ্গল সাধনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। জনসাধারণ তাই আজ সজাগ হ'য়ে উঠেছে, মানুষে মানুষে কোন তফাৎ আজ আর তারা মানতে চায় না, তাদের মত হ'ল এ জগতে সবার সমান অধিকার।

তাই দেখি ধনীও দান ধ্যান ক'রে নিজেকে উদার এবং মহান বলে প্রতিপন্ন করার জন্য পথ খোঁজে। আমাদের দেশে এমন মহাপুরুষও আছেন যাঁদের কাছে গরীবের ঠাঁই মেলে না। তাঁদের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করার অধিকার আছে কেবল ধনীদের। ধনীদের দানে তাঁরা যে হাসপাতাল, বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করেন সেখানেও গরীবদের কোন স্থান সঙ্কুলান হয় না।

বিত্তবানেরা এক একটি অনুষ্ঠানে অজস্র টাকা ব্যয় ক'রে থাকেন, সেই টাকার কিছু অংশও যদি অভাব গ্রস্থদের অভাব মেটাতে এবং ঔষুধপত্র ও চিকিৎসার জন্য খরচ করা যেত, তবে জগতের কত মঙ্গল হ'ত।

শ্রীমাধব বলেন, মহাপুরুষগণ বিত্তবানদের ভুল পথে চালনা করছেন সেকথা বলা ঠিক নয়, তবে তাঁরা যদি শিষ্য ভক্তদের ভাবধারার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন, তাহ'লে সুনামের আকাঙ্খায় তারা দান-ধ্যান থেকে বিরত থাকে।

সাধনার স্তর সম্বন্ধে শ্রীমাধব আলোচনা সভায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা গুরুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ করার সুযোগ পাচ্ছ বা সেবাপূজা নিয়ে আছ অথবা গ্রন্থসঙ্গ করছ তারা

নিজ নিজ অবস্থা বিচার ক'রে দেখ। মনদর্পণে নিজের পূর্ব্বাবস্থা এবং বর্ত্তমান অবস্থার ক্রিয়াকলাপের চিত্র পাশাপাশি রাখলেই দেখতে পাবে উন্নতির পথে তোমার কতটা পরিবর্ত্তন এসেছে। এভাবে নিজেকে খতিয়ে দেখতে অভ্যাস করলে অর্থাৎ আত্মসমীক্ষার ভাব মনে জাগরূক থাকলে একদিন না একদিন আমিত্ব নাশ হবেই। আমিত্ব নাশ হ'লে, গুরুময় বা ঈশ্বরময় হওয়া যায়। জাগতিক ক্ষেত্রে পরিপক্ক প্রেমাবস্থায় যুবক যুবতী যেমন একে অন্যকে ছাড়া থাকতে পারে না বা প্রেমাস্পদের নিন্দাবাদ সহ্য করতে পারে না, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও তেমনি পরিপক্ক প্রেমাবস্থায় সাধক আরাধ্যের নিন্দা সহ্য করতে পারে না। এভাবে নিজেকে যাচাই ক'রে নিতে হবে, তবেই নিজের সাধন স্তর বুঝতে পারবে। আত্মানুসন্ধান করতে করতে মনে হবে, যিনি সীমাহীন, তাঁকে কি ক্ষুদ্র ও সীমিত জ্ঞান বুদ্ধি নিয়ে জানা বা বোঝা যায়? তখনই আরাধ্যের প্রতি অনুরাগ আসে এবং প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

শ্রীমাধব বলেন, তোমার অন্তর মলিন না পরিষ্কার সেকথা তোমার চাইতে আর কি কেউ ভাল জানে? বস্ত্র যদি মলিন হয় তবে তার দুর্গন্ধ কি লুকানো যায়? কাজেই চিত্তশুদ্ধির আয়োজন যে তোমাকেই করতে হবে।

শ্রীমাধব বলেন, প্রকৃষ্ট ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে ভগবানের কোন রূপ নেই। তোমরা যে রূপে তাঁকে দর্শন কর সে যে তোমাদেরই দেওয়া রূপ। তোমার ধ্যানে এটিই উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর,—'আমার ইচ্ছায় কিছুই হয় না। শ্বাসপ্রশ্বাসের বায়ু, পিপাসার জল প্রভৃতি সব কিছুর মূলেই হ'ল প্রকৃতি'। প্রকৃতি একবিধ। একবিধ থেকে এলো ত্রিবিধ অর্থাৎ সত্ত্ব—রজঃ—তমঃ। একে আর তিনে মিলে চতুর্ব্বিধ। চতুর্ব্বিধ থেকে পঞ্চবিধ অর্থাৎ পঞ্চভূত। পঞ্চবিধ থেকে চতুর্ব্বিংশতিবিধ। এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব নিয়েই আমাদের দেহ।

তাহ'লে দেখা যায় মূলে সেই এক। এই যে তত্ত্ব সমষ্টি এদের প্রত্যেকটির মধ্যে প্রত্যেকটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি তত্ত্ব না থাকলে সব অচল হ'য়ে যাবে। এই যে এক বহু হ'য়ে আছেন, এক আত্মা থেকে এত জীবাত্মা, "আমি" যে জীব আমার মধ্যেও সেই আত্মা বিরাজ করছেন, সেই আত্মাকে উপলব্ধি করাই হ'ল ঈশ্বরদর্শন।

এটিও একটি দর্শন অর্থাৎ উপাখ্যান। দর্শন অর্থে আমরা বুঝি দেখা। ঈশ্বরকে তাই হস্তপদ বিশিষ্টরূপে আমরা রূপ দিয়েছি, প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোন রূপ নেই।

আমাদের চিন্তাধারায় তাঁকে আমরা কায়ারূপে প্রত্যক্ষ করতে চাই, তাই হস্তপদবিশিষ্ট রূপ দিয়ে থাকি। প্রশ্ন উঠে, যারা গাছ বা পাথর পূজা করে তারা হাত, পা কোথায় পাবে? গাছ বা পাথরের মধ্যেও তারা নানা ভাবে রূপ দিয়ে থাকে, গাছকে বা পাথরকে সাজায়, তিলক কাটে, সিঁদুর দেয়, আরও কত কি করে।

শ্রীমাধব নিজেই প্রশ্ন তোলেন,—মা কালী কি মানুষমূর্ত? তিনি কি কারো গর্ভে জন্ম নিয়েছেন যে তোমরা তাঁকে মানুষের রূপ দিয়েছ? যিনি বিশ্বগর্ভিণী, তাঁর আবার রূপ কি? তবুও বলি, রূপের প্রয়োজন হ'ল অরূপকে জানবার জন্য। তোমরা যে ত্রিসন্ধ্যা জপ কর তার প্রকৃত কারণ কি? গুরুদেবের আদেশ তোমরা গুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্র জপ কর। কিন্তু তোমাদের চিন্তা ক'রে দেখা উচিত ঐ বীজমন্ত্রে কি রহস্য লুকিয়ে আছে।

প্রকৃষ্ট বৈষ্ণব

গত মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি—এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, মানুষের পাশব নিবৃত্তি

তখনই আসতে পারে, যখন তার প্রবৃত্তি দমন হয় এবং প্রশ্ননিবৃত্তির এই ভাবটিকে তিনি বলেন 'মহাভাব'।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীমাধব বলেন, মনে পড়ে আজ ভোরবেলা এক শিষ্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম সম্বন্ধে তার দ্বন্দ্বের মীমাংসা চায়, বলে, 'সাধু মহাপুরুষদের মুখে শুনি ভগবৎ পথে যেতে হ'লে সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত, পুঁথি পুস্তকেও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি দেখি, অথচ আপনার উপদেশ নির্দ্দেশ হ'ল—সংসারে থেকে ক্রমের পথে চল, ব্যতিক্রমের পথ পরিহার কর, এটিই ভগবৎ সন্ধানের শ্রেষ্ঠ পথ। ব্যতিক্রমের পথে না গেলে মনুষ্যত্ব ফিরে পাবে এবং এই অনুভূতি আসবে যে মনুষ্যত্বই ঈশ্বরের অভিন্ন সত্তা। আবার গীতায় আছে কর্ম্ম সন্ন্যাসের কথা, কারুর কারুর মতে বৈরাগ্য না এলে ভগবৎ পথে এগোনো যায় না। এত মতের ও পথের মধ্যে কোনটি আমরা অনুসরণ করতে পারি, কোনটি আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে'?

এ কথার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, যে কথা শুনেছ, যা পড়েছ সবই ঠিক এবং আমি যে কথা বলি তাও ঠিক। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় তাঁরা যা বলেছেন এবং আমি যা বলি এ দুটি কথার অর্থ বিপরীত। কিন্তু যদি জ্ঞানে বিচার কর তবে দেখবে সংসারে কেউ কারুর নয়, তুমি যাদের অতি নিকট বা অতি আপনজন বলে মনে কর, তারা এবং তুমি সবাই তাঁর অর্থাৎ ঈশ্বরের। তাঁরই সৃষ্টিলীলা পূরণার্থে এক একটি সংসার প্রসার লাভ ক'রেছে। বিবাহের আগে তুমি ছিলে একা, বিবাহ ক'রে হ'লে দুজন, তারপর জন্ম হ'ল পুত্রকন্যা। এই স্ত্রী, পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজন সবাইকে নিয়ে একটি সংসারের পরিবেশ সৃষ্টি হ'ল। এই সংসারকেই তোমরা মনে কর, আমার সংসার, আমার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, আমি এদের কর্ত্তা, এই ভাবে ডুবে থাক, তাই ঈশ্বরের রস আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হও।

ঈশ্বর-রস আস্বাদন করতে হ'লে ভাবতে হবে, এই সংসারে আমি একা, এখানে কারুর সঙ্গে কারুর সত্যিকারের কোন সম্পর্ক নেই, তা যদি থাকত তবে যখন এ জগতে এসেছিলাম তখন কেউ কেন আমার সঙ্গে আসেনি, আবার যাবার সময়ও তো কেউ সঙ্গে যাবে না। সত্য কথাটি হ'ল—'একাকী এসেছি, একাকী যেতে হবে কেউ তো সঙ্গে যাবে না'। এ তো মেলা বা উৎসবে যাওয়া নয়, যে বহুলোক সঙ্গে নিয়ে গেলে, আবার উৎসব শেষে তাদের নিয়ে ঘরে ফিরে এলে! অস্থায়ী মানবজীবনের যাতায়াত পথে কেউ তোমার সঙ্গী নেই, কাজেই প্রকৃতপক্ষে কেউ তোমার নয়, এ শুধু মায়াসাগরে ডুবে থাকা।

তবে এরও প্রয়োজন আছে, এই মায়াই তোমাকে সংসারে বেঁধে রেখেছে, সন্তান সন্ততিকে লালন পালন ক'রে মানুষ ক'রে তুলতে প্রবুদ্ধ করছে।

ত্যাগের প্রশ্ন যদি উঠে তবে বলি, তোমার কি আছে যে তুমি ত্যাগ করতে পার? যার কিছু নেই তার ক্ষেত্রে কি ত্যাগের প্রশ্ন উঠে? জাগতিক এই মায়ার সংসারে যারা তোমায় ঘিরে আছে, তুমি তাদের সেবক মাত্র, তার চাইতে আর তো বেশী কিছু নও! সংসারে কেউ যদি তোমার না হ'য়ে থাকে, তবে একা তুমি থাকবে কি ক'রে? তখনই মন খুঁজে দেখতে চাইবে, তবে তুমি কার? বা কে তোমার প্রকৃত আপনজন? এই অনুসন্ধিৎসাই তোমায় জানিয়ে দেবে যে তুমি ঈশ্বরের অভিন্ন সত্তা। আত্মানুসন্ধানের বিচারে এই ভাব যার আসে তাকেই শ্রীমাধব প্রকৃষ্ট বৈষ্ণব বলেছেন।

শ্রীমাধব বলেন, সাধন পথে শ্রীবৃদ্ধি পেতে হ'লে বৈষ্ণবতার ও অলঙ্কারের প্রয়োজন আছে তবে একটি পর্য্যায়ে এসে এই অলঙ্কারকেও ত্যাগ করতে হয়, কেননা অলঙ্কারটিও যে একটি সংস্কার। সংস্কার মুক্ত হ'তে পারলেই প্রকৃষ্ট বৈষ্ণবতা আসে!

তখন মনে হয়, 'আমি যাদের সেবার নিমিত্ত, সেই নিমিত্তও হ'ল আমার সর্ব্বকর্ম্মের মূল। সংসারে পুত্রকন্যা, পরিজনের নিমিত্ত যদি আমি হ'য়ে থাকি, তবে তাদের অবহেলা করলে তারা অসহায় বোধ করবে, অমানুষ হবে, নানা বিপর্যায়ের সম্মুখীন হবে। আমাকে উপলক্ষ্য ক'রেই যখন ঈশ্বর তাদের জগতে পাঠিয়েছেন তখন আমার সর্ব্বময় কর্ত্তব্য হ'ল তাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভরণপোষণ করা।

শ্রীমাধব বলেন, তোমার পিতামাতাও তো তোমাকে তাঁদের সাধ্যমত ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ক'রেছেন, কেননা সংসার জীবনে তোমার উপর যারা নির্ভরশীল তাদের কারণে যথাযোগ্য কর্ম্ম ক'রে যেন সেই কর্ম্মের ফল যথাযথ তাদের বুঝিয়ে দিতে পার। কর্ম্মের ফল আশ্রিতদের প্রাপ্য অনুযায়ী বুঝিয়ে দেওয়াও তো কম বড় ত্যাগ নয়!

তোমার মনে যদি এই ভাব আসে যে, নির্ভরশীল ও আশ্রিতদের দেখা তোমার কর্ত্তব্য, তখন আর তোমার কোন মোহ থাকতে পারে না। মোহাচ্ছন্ন বা মোহান্ধ হ'য়ে চলাই দুঃখ বা ধ্বংসের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রকৃষ্ট বৈষ্ণবতার উদ্ভবে মোহান্ধতা এবং মায়া পিশাচীর কবল মুক্ত হওয়া যায়।

শ্রীমাধব বলেন, বৈরাগ্যের কারণে আজ যদি তুমি সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ কর তবে তোমার আশ্রিতদের দুরবস্থার সীমা পরিসীমা থাকবে না। চিন্তা ক'রে দেখ তাঁর পথে যাবার কারণে, তাঁরই সৃজিত জীবদের চরম দুর্দ্দশায় ফেলে কেউ যদি বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাতে কি ঈশ্বরের অনুমোদন থাকতে পারে? পারে না। কেননা এ যে কর্ত্তব্য কর্ম্মে ফাঁকি দিয়ে পলায়ন মনোবৃত্তিরই সামিল।

তিনি বলেন, যদি প্রশ্ন উঠে ঈশ্বরের কারণে পূর্ব্বে মুনিঋষিরা তো নৈমিষারণ্যে গিয়ে সাধনভজন করতেন? তার উত্তরে বলতে হয় যে,

তাঁদের সংসার আমাদের তুলনায় আরও কত বড় ছিল না কি? প্রতিটি মুনিঋষির আশ্রমে শত শত ছেলেমেয়ে আশ্রয় নিত এবং তাদের মানুষ ক'রে তোলার দায়িত্ব নিতেন এই মুনিঋষিগণই। আশ্রম বালকবালিকার খাওয়া পরা, শিক্ষাদীক্ষা, নিয়মশৃঙ্খলা ও সাধনভজনের ভার মুনিঋষিগণের উপর ন্যস্ত ছিল-কাজেই তাঁদের সংসার ছিল বিশ্বসংসার।

এ সময় সভায় একটি কথা উঠে—আমাদের সংসারে যেমন নানামত এবং জটিলতা দেখা দেয়, তাঁদের সংসার তো সেরকম ছিল না!

এ কথার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, সংসারে যেমন বহুমতের লোক আছে, তেমনি আশ্রমেও বহুমতের লোক থাকত। আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য রাজবাড়ী থেকে মুনিঋষিদের কাছে ভেট আসত, তাই যে সকল রাজপুত্র আশ্রমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য আশ্রমবাসী হ'ত, তাদেরও বিশেষ মান দেওয়া হ'ত। রাজনীতি থেকেও ঋষিনীতিকে তখন উঁচু স্থান দেওয়া হ'ত, তাই বলি তাঁরাও আমাদের চাইতে কম জটিল সংসার করেননি!

এই প্রসঙ্গে শ্রীমাধব একটি কাহিনীর অবতারণা করেন। কাহিনীটি এইরূপ :—

রাজপুত্র দেশ পর্য্যটনে বেরিয়েছে। তার লক্ষ্য হ'ল বনে বনে, আশ্রমে আশ্রমে ঘুরে বেড়ান। একটি আশ্রমে এসে সেখানকার নিয়মশৃঙ্খলা দেখে সে মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে। বাঁশী বাজলেই ছেলেমেয়েরা যে যার নির্দ্দিষ্ট কাজে আত্মনিয়োগ করে—মেয়েরা কেউ ফুল কুড়ায় কেউ বা মালা গাঁথে আবার কেউ পূজার আয়োজন করে; ছেলেরাও বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে, জল আনে, গোচারণে যায়, স্তোত্র পাঠ করে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। এই ভাবে শৃঙ্খলার মাধ্যমে নীতি শিক্ষা পূজা, জপতপ সবই হয়। রাজপুত্র ভাবে শৃঙ্খলাইতো শান্তির দূত,

এই আশ্রমিক শিক্ষা লাভ করতে পারলে ভবিষ্যতে শৃঙ্খলার সহিত রাজ্যশাসন এবং পরিচালনা করতে পারব, প্রজারাও সুখে শান্তিতে বাস করতে পারবে ; তাই সে পিতার কাছে এসে আশ্রমবাসী হবার আবেদন জানায়।

পিতা বলেন, 'এ বেশ ভাল কথা; তবে রাজার ছেলে হ'য়ে তুমি কেন আশ্রমে যাবে। আশ্রমকর্তা রাজপুরীতে এসে তোমায় শিক্ষা দিয়ে যাবেন।'

পুত্র বলে, 'পিতা! আপনার নীতি আমি যথাসম্ভব শিরোধার্য করছি, ঋষিনীতি শিক্ষা না করলে রাজনীতি যথার্থভাবে পরিচালনা করা হয় তা সম্ভব হয় না।'

পিতা উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে উঠেন, 'তবে কি তুমি বলতে চাও, আমার মধ্যে ঋষিনীতি নেই?'

পুত্র শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়, 'তা থাকলে আশ্রমবাসী হ'তে কি আমায় বাধা দিতেন?'

পিতাকে হার মানতে হয়, বলেন 'বেশ! তুমি যেটা ভাল ব'লে মনে করছ তাই কর, তবে এমন কর্ম ক'রো না যাতে আমরা দুঃখ পাই।'

পুত্র বিনীত ভাবে বলে, 'না বুঝে যদি কষ্ট পান তবে তা সংশোধনের ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু বুঝলে আনন্দ পাবেন সেকথা নিশ্চিত জানুন।'

যাক্, পিতার অনুমতি নিয়ে রাজপুত্র ঋষির আশ্রমে গেল। তখনকার দিনে রাজরাজড়ারা মুনিঋষিদের আশ্রমের সকল ব্যয়ভার বহন করতেন। এটা ছিল তাদের রাজনীতির অন্তর্গত।

এক্ষেত্রেও আশ্রমটি রাজ্যের অন্তর্গত ব'লে রাজাই আশ্রমের সব খরচ বহন করেন। আশ্রমের সমস্ত ব্যয়ভার পিতা বহন করেন ব'লে রাজপুত্রের মনে মাঝে মাঝে অহঙ্কার হ'ত। হঠাৎ একদিন

তার মনে হয়, 'পিতা আশ্রমের ব্যয়ভার বহন করেন ব'লে আমার এই অহঙ্কার তো ঠিক নয়? পিতার কারণেই আশ্রমপিতা ও আমাকে বিশেষ মান দিয়ে থাকেন। আমার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হ'ল ঋষিনীতি শিক্ষা করা, অর্থের অহঙ্কার নিয়ে চললে তো আমি উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করতে পারব না, কাজেই অপরাপর আশ্রমবাসীদের মতই আমাকেও চলতে হবে।'

তারপর থেকে সে আশ্রমের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মতই থাকে, খায়, কাজকর্ম করে, রাজপুত্র ব'লে বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধা সে গ্রহণ করে না। আশ্রমপিতা ভেবে অবাক হন, রাজপুত্র কেন অন্য আর পাঁচজন আশ্রম শিক্ষার্থীর মত চলছে, তার জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হ'য়েছে তা সে গ্রহণ করে না কেন? একথা তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে আশ্রমপিতাকে বলে, 'আপনি যে আমাকে অন্য আশ্রমবাসীদের থেকে বিশেষ মান দেন, তা কি অন্তর থেকে, না পিতা আশ্রমের খোরাক যোগান ব'লে? এভাবে আমাকে মান দিলে আমার শিক্ষা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে না।'

আশ্রমপিতা সহাস্য বদনে বলেন, 'আমি জানতাম, একদিন তোমার দৃষ্টিভঙ্গী বদলাবে। যতদিন না বদলায়, ততদিন তোমায় এইভাবে মান দেওয়া হ'য়েছে। তুমি যা বুঝেছ সেই মতই চল

সেদিন থেকে রাজপুত্র একেবারে আশ্রমবাসে ডুবে গেল আশ্রমপিতা সেটি লক্ষ্য ক'রে বলেন, 'দেখ বাবা! সংসার ছুটোই। ঐ সংসার সুচারুরূপে পরিচালনা করবার জন্যই সংসারে তুমি শিক্ষা নিতে এসেছ, এখন তোমার শিক্ষা সমাপ্ত, কাজেই তোমার নিজের সংসারে কি এবার তোমার ফিরে যাওয়া উচিত নয়?'

রাজপুত্র বলে, 'উচিত, কিন্তু মন যে চাইছে না।' আশ্রমপিতা বলেন, 'মনের এই অনিচ্ছাটাও একটা মোহ। আশ্রমেরও অনেক মোহ আছে, এখানকার পরিবেশ, সাধন ভজন, জপ তপ এ সবই

এক একটি মোহ। এক একজনকে এক এক রকম মোহ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। তোমায় একপক্ষকাল সময় দিচ্ছি, ভেবে দেখ কোন মোহে তুমি এখানে আটকে থাকতে চাইছ।'

রাজপুত্র বসে বসে কেবলভাবে, 'কি আমার মোহ? আমি কি বনের পশুপাখীর মোহে আকৃষ্ট হয়েছি? তা তো নয়? তাহ'লে তো সর্ব্বক্ষণ তাদের নিয়েই কাটাতাম? চিন্তা ক'রে সে কোন কূলকিনার পায় না, কিসে তার মোহ? একপক্ষকাল অতিক্রান্ত হ'তে হঠাৎ সে উত্তর খুঁজে পায়। আশ্রমপিতাকে গিয়ে বলে, 'উত্তর আমি খুঁজে পেয়েছি, আশ্রমিক শিক্ষার মোহ আমায় আকৃষ্ট ক'রেছিল, সে শিক্ষা আজ আমার সমাপ্ত হ'য়েছে. আপনার অনুমতি হ'লে আমি ঘরে ফিরে যাই, আর তো আমার এখানে থাকার প্রয়োজন নেই?'

আশ্রমপিতা বলেন, 'আগত সংসার পরিচালনার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হ'য়েছিল তা যখন সম্পূর্ণ হ'য়েছে, তখন মোহে আবদ্ধ হ'য়ে না থেকে, তুমি ঘরে ফিরে যাও এবং আশীর্ব্বাদ করি প্রাপ্ত শিক্ষার সদ্ব্যবহার কর।'

শ্রীমাধব বলেন, আমাদের সংসারে নানারকম রস রয়েছে। আশ্রমের যে সংসার সেখানে সু-রস ভিন্ন কু-রস নেই, সেখানে মানুষ, পশু সব একসঙ্গেই বাস করে, কিন্তু যে সংসারে আমরা দিনাতিপাত করি, সেখানে যেমন সু-রস আছে তেমনি আবার আসুরিক রসও আছে। এত রকমারি রসের মধ্যে বিরাজ ক'রেও তুমি যদি তোমার শম, দম, তিতিক্ষা ও ত্যাগের দ্বারা সমস্ত বৈরীরসকে উপেক্ষা ক'রে ইষ্টরসে ডুবে যেতে পার, তবেই তুমি প্রকৃষ্ট বৈষ্ণব হ'তে পারবে। সংসারের কর্ত্তব্য অবহেলা ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে যে বৈষ্ণবতা প্রদর্শন করে, তাকে বৈষ্ণবতা না ব'লে বৈষ্ণবের অলঙ্কার বলাই ভাল। সে বৈষ্ণবতা হ'ল সুনামের জন্য, শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জনের জন্য।

প্রকৃষ্ট যে বৈষ্ণব, তার শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হবার সাধ থাকতে পারে না। সংসার রসে থেকেই যে তার বৈষ্ণবতা পরিপক্ক হ'য়েছে।

শ্রীমাধব বহুবার তাঁর আলোচনা সভায় অন্তর্সন্ন্যাসের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমার আশেপাশে যারা আছে তারা, এমন কি তোমার ইন্দ্রিয়গণও যেন তোমার সন্ন্যাসের কথা টের না পায়। বাহিরে কর্ত্তব্যকর্ম্মে তোমার কোন ত্রুটি কেউ খুঁজে পাবে না কিন্তু অন্তরে তুমি থাকবে সন্ন্যাসী।

সাধু, মহাপুরুষদের সংসার যখন প্রস্ফুটিত হয় অর্থাৎ চারিদিকে তাদের পরমতাপের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠে, তখন সাধারণ জীব পতঙ্গের মত সেই আগুনে ঝাপিয়ে পড়ে। সাধু, মহাপুরুষদের লক্ষ্য থাকে, একটি পতঙ্গেরও যেন পাখা বা ডানা না পোড়ে, তারা যাতে রক্ষা পায় এবং শান্তি পায়, সর্ব্বতোভাবে সে চেষ্টাই তাঁরা ক'রে থাকেন।

আশ্রিতকে রক্ষা করার ক্ষমতা যাঁর আছে তিনিই তো প্রকৃত আশ্রয়দাতা। সে ক্ষমতা যার নেই তিনি আশ্রয় দিলেও শেষ-রক্ষা করতে পারেন না।

শ্রীমাধব বলেন, যে সকল সাধু, মহাপুরুষ বৈষ্ণবতার গুণে গুণী তাদের আগুনে ঝাঁপ দিলে পতঙ্গের একটি ডানা বা পাখাও পুড়বে না, গায়ে একটি আঁচড়ও লাগবে না কিন্তু সুনামের কারণে যারা বৈষ্ণবের মত আচরণ করে তাদের আগুন ক্ষণস্থায়ী, একদিন সে আগুন নিভে যাবেই।

সাধ্য ও সাধন

মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করেন—আমরা মনুষ্যজীবন লাভ করেছি, আমাদের সাধ্য কি এবং তার পরিপূরণার্থে সাধনই বা কি ?

আলোচনার প্রারম্ভে শ্রীমাধব বলেন, অদ্ভুত প্রশ্ন ক'রে বসেছ— মানবের সাধ্য কি এবং সাধন কি ?

তিনি বলেন, উপহাস করছি না, এ প্রশ্নে আমি একেবারে নিরানব্বই-এর ধাক্কায় পড়ে গেছি। পৃথিবীতে যে সাধ্যসাধন রীতি চালু আছে তাতে দেখা যায়, প্রায় নিরানব্বইটি সাধ্যবস্তু এবং তদনুযায়ী সাধন পথও নিরানব্বইটি। কিন্তু এটি কি হ'তে পারেন কারণ প্রকৃতপক্ষে সাধ্যবস্তুও একটি মাত্র এবং সাধন পথও একটি তথাপি মানবের সাধ্যসাধনের বাহারের অন্ত নেই। কারো সাধ্যবস্তু কালা, কারো কালী, কারো গণেশ, কারো সাকার, কারো বা নিরাকার। এ নিয়েই আমরা জীবন কাটাই। যেটি তোমার সাধ্যবস্তু তার থেকে তোমার পাশের লোকটির সাধ্যবস্তু আলাদা। তোমার সাধন পথের সঙ্গে পাশের লোকের সাধন পথেরও কোন মিল নেই এমন কি তোমার পিতার সাধ্যসাধনের সঙ্গেও তো তুমি সর্ব্বদা একমত নও। এসব কি তবে কেবলই বিভ্রান্তি ? না, তা নয়। যিনি আমাদের সাধ্য তিনি একও বটেন আবার বহুও বটেন এখন দেখা যাক্, প্রকৃষ্ট বিচারে মানবের সাধ্য ও সাধন কি ?

এই বিচারে দেখা যায়, সারাবিশ্বে মানবজাতির সাধ্যবস্তু হ'ল সত্য অর্থাৎ ঈশ্বর, আর সাধন হ'ল সেই সত্যেরই ক্রম। এই ক্রমের অর্থ কি ? এর অর্থ হ'ল, স্থান, কাল, ও পাত্রানুসারে মানবিকতার সহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই হ'ল ক্রম এবং সেটিই মানবের সাধন।

সত্যই যখন ঈশ্বর, সত্যই যখন অনন্তবিশ্বের জ্যোতি—প্রাণ—সম্পদ, সত্যই যখন অনন্ত সবিতার সবিতা, তখন সত্যই একমাত্র সাধ্যবস্তু বলে গণ্য। আর সত্যের ক্রম হ'ল সাধন। আমরা মানবমানবীগণ সত্যেরই সত্তা, কাজেই যে বস্তুর আমরা সত্তা, সেই বস্তুই তো আমাদের একমাত্র সাধ্য হওয়া উচিত।

শ্রীমাধব বলেন, অনন্তবিশ্বের যিনি স্রষ্টা তিনি সত্য হ'লেও আর

সব কিছু কিন্তু মিথ্যা নয়। নশ্বর এবং অস্থায়ী ব'লে, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ যাকে মিথ্যা ব'লে গেছে, সে সব কিছুকেই আমি বলছি সত্যের সত্তা, সুতরাং এই বিচারে মিথ্যা বলে কিছু নেই।

শ্রীমাধব বলেন, এই মিথ্যা বলার কারণ কি? এর কারণ হ'ল যার কোন অস্তিত্ব আমরা খুঁজে পাই না, আজ আছে কা'ল নেই, তাই তাকে মিথ্যা বলা হয়। কিন্তু যারা অস্তিত্ব খুঁজে পায়, তারা জ্ঞানে মিথ্যাই সত্য হ'য়ে উঠে; তাই বলি, মিথ্যা বলে কিছু নেই।

নশ্বর দেহকে, অস্থায়ী সংসারকে, মায়াকে আমরা মিথ্যা বলে থাকি, কেননা তার স্থায়িত্ব আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। বাস্তব জগতে, বাস্তবিক অবস্থাকে বজায় বা স্থির রাখতে হ'লে সত্য এবং মিথ্যার সীমারেখা টানতেই হয়, নইলে জীবনপথ যে অচল হ'য়ে যাবে। তাই তিনি বলেন, বাস্তব জগতে সত্য মিথ্যা মেনে চলতে হবে। আর প্রকৃষ্ট বিচারে অর্থাৎ বাস্তব জগতের আওতার বাইরে যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের বিচারে, সত্যই হ'ল বীজ। এই সত্যবীজ যখন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অসংখ্য অণু-রূপে প্রকৃতি সংযোগে প্রাণ-সঞ্চারের দ্বারা বিস্তার লাভ করে তখন তাকে বলে জীবাণু। জীবাণু হ'ল আপেক্ষিক। বীজ থেকে জীবাণু পর্যন্ত তাতে সত্য এবং মিথ্যা একসূত্রে বাঁধা।

অসংখ্য অণু, পরমাণু রূপে সত্য বা ঈশ্বর সারাবিশ্বে বিরাজিত।

সত্যবীজের এই অণু পরমাণুই খাদ্য, জল, বাতাস বা পঞ্চভূতের মাধ্যমে প্রাণী বা জীবদেহে বীর্য উৎপাদন করে দেহের সংস্কার অনুযায়ী বীজের এক বা দুই অথবা পাঁচ ছয়টি অণু, প্রকৃতি সংযোগে জীবাণুরূপে পরিণত হয় এবং বাকীগুলো নির্গত হ'য়ে যায়। তাহ'লে দেখা গেল, বীজের অণু হ'ল সত্য। সেই সত্য যখন প্রকৃতির সহায়তা পায় তখন তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। সত্যবীজের অণু ও পরমাণু, হাওয়া, বৃক্ষ, পাথর, এমনকি মৃতকাষ্ঠেও আছে।

সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে আছে ব'লেই আজ আমরা পৃথিবীতে চারটি জাতির সৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি।

এক সত্যের সত্তা চার ভাগে বিভক্ত হ'ল—যথা উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, ও জরায়ুজ। এটিই হ'ল সৃষ্টিতত্ত্বের গোড়ার কথা। আর সংস্কার বশে আজ আমরা রাশি রাশি জাতি সৃষ্টি ক'রেছি। তাই জাগতিক লাভলোকসান এবং ক্ষতিপূরণের কারণে যে সংস্কারের সৃষ্টি হয়, সেই সংস্কারের মাপকাঠিতেই আমরা সাধ্যসাধনের মূল্যায়ণ করি। সংস্কারের উর্দ্ধে গিয়ে সাধ্যসাধনকে বোঝার ক্ষমতা আমাদের হারিয়ে গেছে; কেনন মনুষ্যত্বের জাগরণ ভিন্ন সংস্কার থেকে মুক্তি নেই।

শ্রীমাধব বলেন, সত্তাকে শ্রদ্ধা করা বা মান দেওয়া কিন্তু সংস্কার নয়। সন্তান পিতামাতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করবে, সে তো তার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাকে সংস্কার বলা যায় না কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশীকে অতিরিক্ত শ্রদ্ধা দেখান বা দেবদেবীতে প্রগাঢ় ভক্তি ও মান প্রদর্শন সংস্কারের পর্যায়ে পড়ে, কেনন এতে যে লাভলোকসানের প্রশ্ন জড়িত। এ সমস্ত সংস্কার ভুলে গিয়ে যেদিন 'আমি তাঁর সত্তা', এই বোধে সত্তাকে মান দিতে পারবে সেদিনই সত্তানুভূত হবে। এতে কোন সংস্কার নেই। পিতামাতাকে মান দেওয়াই সত্তাকে মান দেওয়া। শক্তির সঙ্গে সংযোগ না হ'লে সত্তা প্রকাশিত হয় না। শক্তিই হ'লেন মা।

সাধনভজনের ধারা ও ব্যক্তি, নারী, দেশ, কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্ন হ'তে পারে কিন্তু মানবজাতির সাধ্য বস্তু যে সত্তা, এখানে দেশ, কাল, পাত্রভেদে কোন বৈষম্যও নেই, কোন বিচারও নেই, কেননা সত্যের রূপ যে অবিকৃত, সে রূপের কখন কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

সংস্কারযুক্ত ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন আছে। আমাদের মনে রাখতে

হবে যে, সমস্ত গুরু মিলিয়ে একই গুরু। আমার গুরু বা তোমার গুরু ব'লে আলাদা কিছু নেই। সমস্ত গুরুর সমষ্টিই যে সত্য সেকথা আমাদের স্মরণে রাখা উচিত।

শ্রীমাধব বলেন, তবে তোমরা যে সাধন-ভজন নিয়ে আছ তা কি মিথ্যা? না, তা নয়। বাস্তব জগতের পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োজন অবশ্য আছে। বাস্তব জগতে যে, যে পথ নিয়ে আছ—সেটিই সত্য। এরূপ সাধন-ভজনের দ্বারাই তোমরা এগিয়ে যেতে পারবে। তবে প্রকৃষ্ট বিচারে অর্থাৎ জ্ঞানের বিচারে সত্যই একমাত্র সাধ্যবস্তু এবং সত্যের ক্রমই হ'ল সাধন পথ। সত্যে পৌঁছে দেখা যায় যে, বাস্তবজগতে সংস্কারযুক্ত ধর্মেরও প্রয়োজন আছে। সত্যের ক্রম সারাবিশ্বেই এক, তবে সংস্কারযুক্ত সাধনায় স্থান, কাল ও পাত্রানুসারে এই ক্রম এক এক জায়গায় এক এক রূপ নেয়। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সাধ্যও একটি এবং সাধনপথও একটি, সেখানে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। সেই সাধন দ্বারাই মূল সত্যে বা সাধ্যে পৌঁছান যায়।

শ্রীমাধব বলেন, সারাবিশ্বে সাধনপথ একটি হ'লেও সাধনা কিন্তু বহুধা।

যে নিরপরাধী তার জন্যই সাধন, তার জন্যই সত্যের ক্রমে চলার নির্দেশ। উপমাস্বরূপ শ্রীমাধব বলেন, তুমি তোমার ছেলেমেয়েকে মানুষ কর এটা ক্রম, আবার তোমার সন্তান সন্ততি যে তোমার সেবা করে সেটাও ক্রম, এখানে ব্যতিক্রম কিছু নেই। পশুপাখীর মধ্যেও এই ক্রম আছে, পশু হ'য়েও সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে তাদেরও কত না চেষ্টা, প্রয়োজনে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও তারা পিছপা হয় না, সন্তানকে বুকে ক'রে আকড়ে থাকে। সারাবিশ্বে ক্রমের রূপ এক। ক্রম হ'ল স্বতঃস্ফূর্ত সত্য এবং সাধনও স্বতঃস্ফূর্ত।

আর সাধনা হ'ল মনের মালিন্যতা দূর করার জন্য, কেননা সাধনা

অর্থ, তোষামোদ করা। যে অপরাধী, অপরাধ স্খালনের জন্য সেই তো তোষামোদ ক'রে থাকে। তাই সাধনা বহুপ্রকারের হ'য়ে থাকে; তাই দেখি কেউ কালীর সাধনা করে, কেউ বা শিবের সাধনা করে, কেউ আবার বিষ্ণুর সাধনা করে। শ্রীমাধব বলেন, এটি ভগবানের সৃষ্ট নয়, এটি তোমাদেরই তৈরী। ক্রম বা সাধন শিখিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই কারণ সত্য নিজে সেখানে প্রকট, পথের নিশানা তিনিই দেন,—'ওরে! তোরা আমার পথে চ'লে আয়।' সাধনার বহু-পথেও তিনি। আমরা নিজেরা বহুরূপে আছি ব'লে তাঁকেও বহুরূপে চাই, তাই এক হ'য়েও তিনি বহুরূপে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে বহুরূপী হ'যে আছেন। সাধনার ক্ষেত্রে ঈশ্বরপথ প্রদর্শন করেন গুরু।

শ্রীমাধব বলেন, নিজের মধ্যে খুঁজে দেখ, তবেই সাধনপথ ও সত্যের সন্ধান পাবে। বৃক্ষের মূল যে পরম সত্য, কাণ্ডই যে সাধন সে খোঁজ আমরা ক'জন করি, আমরা তাঁকে খুঁজে বেড়াই বিশ্বের নানা মঠে, মন্দিরে, গির্জায়, মসজিদে। মনুষ্যত্বের জাগরণই সাধন, বিংশতি প্রকার মনুষ্যত্বের গুণাবলীর প্রকাশ বিকাশই ধর্ম্ম। আমাদের সব সাধনা, সব আরাধনাই যে সাধনে যাবার জন্য, সে চিন্তা আমাদের মনে জাগে না তাই জন্মজন্মান্তর সাধনায় পড়ে থাকি। সাধ্যবস্তুর সঠিক খবরও আমাদের জানা নেই। যাঁর খবর জানা নেই, মূর্ত্তিরূপে, শিলারূপে তাঁকে সৃষ্টি ক'রে, মনের যত প্রার্থনা, যত নালিশ, তাঁকে নিবেদন করি।

শ্রীমাধব বলেন, যতদিন আমরা বাস্তবজগতে আছি ততদিন এসব করতেই হবে। বাস্তবজগতে যা কিছু বাস্তবিক; তাই বাস্তব সত্য অর্থাৎ যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ সেটি সত্য। তুমি যে আরাধ্যকে পূজা কর এটিও বাস্তবিক সত্য। এ বাস্তবিক সত্য কিন্তু চিরকাল থাকে না। যে সূর্য্যকে ধ্যান কর তা একদিন নস্যাৎ হ'য়ে যাবে, যে মূর্ত্তিপূজা করছ তা একদিন গলে গিয়ে মাটিতে মিশে যাবে,

যে গণেশ বা ব্রহ্মার চরণে ভোগ নিবেদন করছ তারও পরিণাম আছে, তাও নষ্ট হ'য়ে যাবে। পরিণাম নেই কেবল সেই পরম সত্যের। এখন বোঝা গেল যে বাস্তবিক সাধনার দ্বারা মিথ্যা থেকে তুমি সত্তায় পৌঁছাতে পার। বাস্তব সত্যের সন্ধান, বাস্তবিক সত্য লাভ ক'রেই মনে করে যে মহাপুরুষের পর্যায়ে উন্নীত হ'য়ে গেছে, তাই পরম সত্যের সন্ধান তার হয় না পরমসত্য থেকে দূরেই থেকে যায়।

চোখ বুজে নাই যাব [illegible] ভাবে চরণ টলমল করে এবং তাই দেখে আমরা অভিভূত হ'য়ে পড়ি, প্রকৃতপক্ষে আসল সত্যের দ্বারে কাছেও কেউ তার পৌঁছায় নি [illegible] ভাল করুন এটি [illegible] পৌঁছাবার [illegible]।

শ্রীমাধবের উপদেশ হ'ল, [illegible] কর, [illegible] এবং সাঙ্গ সাধনে পৌঁছাবার চেষ্টা কর উচিত। [illegible] তা হবার নয় কারণ সংস্কারের ভয় আছে [illegible] পাথর কাটা

একথা যেন আমরা কখনও না ভুলি, ঈশ্বর আত্মারূপে নির্বিকার সাক্ষীস্বরূপ অন্তরে থেকে আমাদের সব ক্রিয়াকলাপই নিরীক্ষণ করেন, তাঁকে ফাঁকি দেওয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়।

আলোচনা সভায় আর একটি ছোট্ট প্রশ্ন ছিল,— যোগবলের সাহায্যে নিদ্রা জয় করা যায় কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, তোমরা যে যা-ই করনা কেন, একটু যোগযুক্ত হ'য়ে কর। তুমি মানুষ, কাজেই তোমার ব্যবহার বা আচরণ হবে মানবোচিত। যদি মনুষ্যত্বের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে নিদ্রা যাও, তবে সময়মত ঘুমাবে এবং সময়মত জাগবে। তোমার আহার বিহারও হবে মানবোচিত। পশু বা দানবের মত আহার তো মানুষের পক্ষে শোভা পায়না, তাতে বদহজম হবে। মানবের বিহারের যে সংজ্ঞা রয়েছে, সেই সংজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত হ'য়েই তোমার বিহার করা উচিত, তার বাইরে নয়।

নিদ্রা হ'ল দেহের ধর্ম্ম। দেহের ধর্ম্ম দেহ অবশ্য করবে। দেহের ধর্ম্মের সঙ্গে দেহাতীত পরমেশ্বরের যোগ কোথায়? দেহ পড়ে ঘুমালেও কোন ক্ষতি নেই, কেননা যিনি দেহাতীত অবস্থায় পৌঁছেছেন, তিনি সর্ব্বদাই তো ঈশ্বর বা সত্যের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। নিদ্রা জয়ের প্রকৃত অর্থ ইহাই।

যোগের কতগুলো ক্রম পদ্ধতির সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে না পারায় আমরা বুঝতে ভুল করি। সারাজীবন জেগে বসে থাবার জন্য যোগ-পদ্ধতি নয়। পদ্ধতির প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'ল দেহাতীত অবস্থায় পৌঁছান। যতদিন দেহাতীত অবস্থায় যেতে না পারছ, ততদিন এই পদ্ধতি পালন করতে হবে অর্থাৎ যেখানে পৌঁছছ সেখানেই থেমে থেকো না, এগিয়ে যেতে চেষ্টা কর। মনের নিরুদ্ধ অবস্থার নামই যোগ, এই যোগে যদি জীব পৌঁছায় তখন আর নিদ্রার প্রশ্নই থাকে না।

শাশ্বত সত্য ও বাস্তব সত্য

এই মঙ্গলবারে পূর্ব্ব আলোচনার সূত্র ধরে জনৈকা ভক্ত শ্রীমাধবকে প্রশ্ন করেন—আপনি দুটি সত্যের কথা বলেছেন; একটি সত্য অর্থাৎ ঈশ্বর, আবার বলেছেন বাস্তব-সত্য, এই দুই সত্যের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, একটি সত্যের অর্থ হ'ল অনাদি শাশ্বত সত্য। বাস্তব সত্য হ'ল অনাদি শাশ্বত সত্যের প্রতিবিম্ব, এই পরিপ্রেক্ষিতে অনাদি শাশ্বত সত্য এবং বাস্তব-সত্য এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তবে বাস্তব বুদ্ধি নিয়ে যখন আমরা বিচার করি

তখন পার্থক্য দেখি, কেননা আজ যা সত্য ব'লে প্রতীয়মান হয় কাল তা মিথ্যা ব'লে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু প্রকৃষ্ট জ্ঞানের বিচারে অর্থাৎ বাস্তবাতীত অবস্থায় পৌঁছে গেলে দেখা যায়, দুই-ই সত্য, কোন পার্থক্য সেখানে নেই।

প্রকৃষ্ট জ্ঞানের বিচারে দেখা যায় নাশ ব'লে কিছু নেই। বাস্তব বুদ্ধিতে যাকে সত্য ব'লে অনুভূত হয়, বাস্তবাতীত জ্ঞানে দেখি সে সবই শূন্য, তাকে বলে ব্যোম। এই ব্যোমের মধ্যেই যে কত পৃথিবীআদি, গ্রহ, নক্ষত্র স্থান পেয়েছে তার সঠিক হদিস্ আজও কেউ ক'রে উঠতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যোমে বা শূন্যেই সব ঝুলে রয়েছে। যে মহামহাশূন্য এই ব্যোমের উৎস সেই মহামহাশূন্য আজও বিজ্ঞান জগতের কাছে অজানিত।

পঞ্চভূতের একটি হ'ল ব্যোম। ভূত অর্থ অতীত। এই ব্যোমও যে কত অতীত তা কারুরই জানা নেই।

মহাশূন্য বা মহাকাশকে কেউ কেউ আবার ব্রাহ্মীচিত্ত ব'লে প্রকাশ ক'রেছেন অর্থাৎ একে বলা হয় দৃশ্যমান জগতের চিত্ত।

ব্রহ্ম এবং প্রকৃতির সংযোগের যে প্রকাশ তার নাম হ'ল ব্রাহ্মী অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তি। প্রকৃতপক্ষে সত্য হ'ল মহাশূন্য, তার কোন রূপ নেই। মহাশূন্য থেকে দৃশ্যমান বাস্তব জগতে যা কিছু দেখা যায় সে সবই সৃষ্টি হ'য়েছে। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ নক্ষত্র এসবই এক একটি সৃষ্টি। সবই একদিন না একদিন নিপাৎ বা নাশ হ'য়ে যাবে, তবে নাশ হ'য়েও কিন্তু মহাশূন্য বা সত্যেই থাকবে। এই মহাশূন্যের নাম কেউ দিয়েছে ভূমা আবার কেউ বা দিয়েছে সত্য। এই এক সত্য যখন বহু হয় তখন সেই একের নাম হয় ঈশ্বর। এক মহাসত্যেরই বহু নাম।

শ্রীমাধব বলেন, তোমরা যতক্ষণ নিজেকে না জানবে অর্থাৎ 'আমি কে' সেটি না জানতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম কি? প্রপঞ্চ

কি তাও জানা যাবেনা। আমি কে, ব্রহ্ম কি, প্রপঞ্চ কি এ সবই উপনিষদের কথা, তার মধ্যে 'আমি কে' সেটি আগে জানতে হয়।

শ্রীমাধব বলেন, আমরা কার সাধনা করছি, কেন সাধনা করছি সে সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃষ্ট ধারণা নেই, তাই এই সাধনাকে তিনি বলেছেন নিরুদ্দেশের পথে অন্ধের পথ চলা। এই সাধনাকে তিনি করণকর্ম্ম আখ্যা দিয়েছেন, এটি কারণ-কর্ম্ম নয়।

কারণকর্ম্মটি তবে কি ?

শ্রীমাধব বলেন, তুমি যে কারণে পৃথিবীতে এসেছ সেই কর্ম্ম সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করার নামই কারণ-কর্ম্ম। সংসারে ক্রমে চলাটি হ'ল কারণ-কর্ম্ম।

যাঁরা তোমাকে পৃথিবীতে এনেছেন অর্থাৎ তোমার পিতামাতা এবং যাঁর আশ্রয়ে তুমি আছ যেমন তোমার গুরুদেব, তাঁদের সেবাযত্ন করা এবং তোমার আশ্রিত যারা অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, তাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা,—এটি হ'ল কারণকর্ম্ম এছাড়া আর যে সমস্ত কর্ম্ম তুমি ক'রে থাক, সে সবই হ'ল করণকর্ম্ম। ষড়রিপু, অষ্টপাশাদির প্ররোচনায় পড়ে, ক্রমের কর্ম্ম করতে আমরা ভুলে যাই।

আমার উপার্জ্জনের অর্থ আশ্রিতদের সেবায় নিয়োগ না ক'রে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতায় ব্যয় করি, এটি ক্রম নয়, এটা অন্যায়, এটা ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রমের কর্ম্মের ফেরে পড়ে যখন দুঃখ, অভাব ও রোগব্যাধিতে বিপর্যস্ত হ'য়ে উঠি, তখন তাগিদে পড়ে 'হা ! গোবিন্দ ব'লে কাঁদি'। সেই তাগিদের রসদ যাঁর কাছে মেলে অর্থাৎ পরিত্রাণের আশা পাই, তিনিই তখন আমাদের সাধ্যবস্তু, আমাদের ভগবান হ'য়ে উঠেন। যাঁর কাছে গিয়ে অভাব বা দুঃখকষ্টের উপশম হয় তাঁকেই গুরুপদে বরণ করি। শ্রীমাধব বলেন, একে কি সত্যিকারের গুরুকরণ বলা যায় ? তিনি বলেন, যাঁকে গুরুর আসনে

বসাবে তাঁর কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ উপদেশ নির্দ্দেশ গ্রহণ কর ; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে গুরুর কাছে আমরা যাই ব্যাধি নিরাময়ের জন্য, ক্ষুধা-নিবৃত্তির উপায় খুঁজতে, ত্রাস ও বিপদ হ'তে উদ্ধার লাভের আশায়।

সত্যের সত্তা হ'য়ে যখন আমরা প্রকাশ হই তখন আমাদের মধ্যে ষড়রিপু ও অষ্টপাশের সৃষ্টি হয়। ষড়রিপু ও অষ্টপাশের তাগিদেই আমরা সকল কর্ম্ম ও সাধন ভজন সব কিছু করি। ইন্দ্রিয়ের বিষয় চরিতার্থতার জন্য ষড়রিপু ও অষ্টপাশের অধীনে আমরা আবদ্ধ হ'য়ে থাকি এবং সেই তাগিদেই সাধন ভজন ক'রে কিন্তু কি করছি সে বিষয় আমাদের সম্যক্ জ্ঞান নেই। কারণকর্ম্ম দ্বারা যদি সাধন পথে চলতে পারি, তবেই প্রকৃত পিতার সন্ধান পেয়ে যাব। পিতার সন্ধান পেলেই মাতাকেও পাওয়া যাবে, কারণ একের মধ্যেই যে দুই লুকিয়ে আছেন, সেকথা ত আমাদের জানা নেই। আমি কে তা জানিনা তাই পিতার পরিচয়ও আমার কাছে অজানা।

শূন্যতাকে আমাদের জানতে হবে অর্থাৎ অন্তর নিষ্কলুষ হ'লেই অন্তরে শূন্যতা আসবে। অন্তরকে অখিলতা শূন্য করতে হবে এই শূন্যতার গুণ কি, ক্রিয়া কি ?

প্রথম গুণ হ'ল ভালমন্দ নির্বিশেষে সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহকে মহাকাশ আপন শূন্যতার মধ্যে স্থান দিয়েছেন এবং সমস্ত ভূতের তাণ্ডব নিজগুণে সহ্য ক'রে যাচ্ছেন, এটিই তাঁর মহত্ব। মহাকাশের অনুকরণে আমরাও যদি এই দেহরূপ ঘটাকাশে সংসারের সমস্ত তাণ্ডব সহ্য ক'রে ভালমন্দ নির্বিশেষে সবকিছুকে আশ্রয় দিতে পারি, তবেই আমাদের অন্তরের পবিত্রতা প্রকাশ পাবে। তবে কাম, ক্রোধাদি এই অবস্থায় স্থিত থাকতে দেয় না একদিনে না হ'লেও অভ্যাসযোগ দ্বারা ক্রমে ক্রমে এই অবস্থায় স্থিত হওয়া যায়।

শূন্যতার দ্বিতীয় গুণ হ'ল — প্রসারতা। এ নরমানবীর মধ্যেও সেই প্রসারতার প্রয়োজন আছে। অনুকরণ ও অনুশীলন দ্বারা

মহাশূন্যের স্বভাবের এই প্রভাবতা যদি আমাদের ঘটাকাশে আসে তবে মহাশূন্যকে অনুভব করা যায়। শ্রীমাধব বলেন, সত্যের কোন রূপ নেই, মহাশূন্যেরও কোন রূপ নেই তাই মহাশূন্যকে দিয়ে সত্যের উপমা দিয়েছি।

শ্রীমাধব বলেন, সত্যই সবাইকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। মহাশূন্যও জগতের সবাইকে আশ্রয় দিচ্ছে। ভেবে দেখ, আমাদের দেহের মধ্যেও তো কত শূন্যতা রয়েছে, যার দৌলতে আহার করছ, দেখ্‌ছ, শুন্‌ছ, সব করছ! এই শূন্যতাও যে সেই মহাশূন্যেরই সত্তা, তাঁরই সৃষ্টি। তা'হলে এই উপমা দিয়ে সত্যের একটি সংজ্ঞা পাওয়া গেল যে, সত্য হ'ল পরমশূন্য।

মহাশূন্য বা পরমশূন্যকে কেউ কেউ আবার পুরুষ বলেছেন, কেননা এই মহাশূন্য সৃষ্টি করতে, প্রকাশ করতে বা নানারূপে রূপায়িত হ'তে পারে, তাই এঁকে ঈশ্বর বলা হয়। তবে আমরা যাকে মহাশূন্য বলি, তাও একদিন নস্যাৎ হ'য়ে যাবে। 'আমি কে', সেটি না জানা পর্যন্ত কারণ-কর্ম্ম সম্ভব নয়। আজ পর্য্যন্ত যত করণকর্ম্ম করছি, শাস্ত্র মেনে চলছি, মন্ত্র উচ্চারণ করছি, ইতিহাস পর্য্যালোচনা করছি, তা সবই করছি ষড়রিপু ও অষ্টপাশের তাগিদে। এর দ্বারা কিন্তু তাঁকে অর্থাৎ সত্যকে জানা যাবে না। তবে তাঁকে জানবার একটি মন্ত্র আছে। সে মন্ত্রটি কি? সেটি হ'ল, যে গুরুকে একান্ত বলে জানে, গুরু ভিন্ন যার দ্বিতীয় কোন বোধ নেই, সে-ই মন্ত্র দ্বারা সত্যকে জানতে পাবে। যারা 'আমিকে' জানেনা তারাও রিপুগণ ও অষ্টপাশের তাগিদে গুরুমন্ত্র জপ করে কিন্তু তারা যদি কারণকর্ম্ম দ্বারা একান্তভাবে সেই মন্ত্রকে জপ করে, তবে 'আমি কে' সেকথা জানতে পারবে। 'আমি কে' জানতে পারলে, তাঁকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে বা সত্যকে জানাও কঠিন নয়; তখন আর সাধ্যসাধনার প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর হ'তে যে সে অভিন্ন, একথা জানলে অনন্ত

শান্তি ও আনন্দের সন্ধান পাবে। এখার চিন্তা করে দেখ, এটা কোন্ পর্য্যায়ের কথা। যতদিন অনাদিকালের বহির্মুখতা নিয়ে আছ, ততদিন করণকর্ম্ম দ্বারাই সাধনা করে যেতে হয়।

শ্রীমাধব বলেন, ভেবে দেখ, আজকের এই আলোচনার কণামাত্রও যদি কেউ বুঝে থাক, তাহ'লে কি মনে এই অনুশোচনা আসেনা যে, আমরা কি করছি? জীবনভোর আমরা তেলের প্রদীপই শুধু জ্বালাচ্ছি না কি? সেই তেলের আলো শুধু আমাদের মসীলিপ্তই ক'রে তুলেছে। তবে সত্যের আলো যদি কারুর মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে থাকে, তবে সেই আলো উজ্জ্বল দীপ্তিই দান করে, কালিমা লেপন করে না।

শ্রীমাধব বলেন, পঞ্চভূতের একভূত যে ব্যোম তার পুরো তথ্য আজও বিজ্ঞান জগতের কাছে অপ্রকাশ্য, তাই পরম মহাশূন্য বা পরম মহাকাশের কথা তারা পাবে কোথায়? একমাত্র অধ্যাত্ম বিজ্ঞানই এর হদিস্ দিতে পারে।

পরম মহাশূন্য হ'তে প্রকৃতি নির্গত হ'য়েই পঞ্চমহাভূতে বিজড়িত হ'য়েছে। সৃষ্টির উপাদান, 'পরমশূন্য' থেকে বিচ্ছুরিত হ'য়ে এই ব্যোমে এসেছে এবং মহাপ্রকৃতির এমনই মহত্ব যে, তিনি সেই উপাদানকে গর্ভে ধারণ করেন। মুনিঋষিগণ এটি অনুভবে জানতে পেরে এর নামকরণ করলেন মহৎতত্ত্ব।

যে একের মধ্যে বহুসংখ্যা, সমস্ত চরিত্রই যার এক, একাবধ যার সব কিছু এমন যে মহত্ব তাকেই বলে মহৎতত্ত্ব। দ্বিবিধ হ'লে আর মহৎ থাকে না, তখন তার নাম হয় অহঙ্কার। মন এবং বুদ্ধি, এই দুই অবস্থা যুক্ত হ'য়ে প্রকাশ পাবার যে বেগ সৃষ্টি হয় তাকে অহঙ্কার বলে। অহঙ্কার থেকে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিবিধগুণের প্রকাশ। ত্রিবিধ থেকে সমস্ত উপাদান সংগ্রহ ক'রে হ'ল চতুর্ব্বিধ—চতুর্ব্বিধের মধ্যে পড়ে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় কিন্তু দেহের জ্ঞানেন্দ্রিয়

নয়, এটি বিশ্বের জ্ঞানেন্দ্রিয়। বিশ্বের যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তার নাম ভূমাপুরুষ। তারপর পঞ্চবিধের মধ্যে পড়ে বিশ্বের পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়। ষষ্ঠবিধের মধ্যে হ'ল মন এবং বুদ্ধি। এ সবকিছুর মধ্যে অন্তরায়ে সর্ব্বদাই এক আছে অর্থাৎ ব্রহ্ম সবার মধ্যে চলেছে এবং অন্তরায়ে চলেছে ব্রহ্মের একত্বভাব। ষষ্ঠবিধের পর সপ্তমে রূপরস পরিপূর্ণ হ'য়ে গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি প্রকাশ হ'তে লাগল। সপ্তমে পরিপক্কতা আসে তাই বলে সাতমাসের সন্তান ও বাঁচতে পারে, সাতমাসে গঠনের পরিপূর্ণতা এসে যায়। অষ্টমে সুপ্রকাশ হয় আর নবম ও দশমে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ হয়।

শ্রীমাধব বলেন, এইভাবে বিশ্লেষণ দ্বারা 'আমি কে' সেকথা জানতে হবে। ঈশ্বর বা সত্যের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি তার জ্ঞান প্রয়োজন। 'আমি কে' এবং তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক তা জানতে পারলেই নিজেকে এবং ঈশ্বরকে জানা যায়।

যিনি আমাকে প্রসব ক'রেছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই কি আমার মা। 'আমি কে' জানতে পারলে আমার মাকেও জানা যাবে এবং মা-ই বাবাকে চিনিয়ে দেবেন। তাছাড়া আমরা যে কোন স্ত্রীলোককে 'মা' সম্বোধন করি সে তো সৌজন্যবোধে-তাই নয় কি? এখন দেখা গেল, সত্য বলতে আমরা যে সত্যকে বুঝি বা যে সত্যকথা বলি তা কার তাগিদে। প্রকৃত সত্য কি তা আমরা জানি না। যে সত্যের কথা আমরা বলে থাকি তা হ'ল বাস্তব সত্য কারণ বাস্তব জগতের বাইরের যে জ্ঞান তা তো আমাদের নেই। বাস্তব সত্যও সেই পরম সত্যেরই প্রকাশ বিকাশ তা না জানা পর্য্যন্ত এই সত্যের মান বাস্তব জগতেই সীমাবদ্ধ। 'আমি কে' জানতে পারলে এই সত্য আর থাকে না, কেননা সেই 'আমি' যে মহাশক্তি বা পরম সত্যের সত্ত

জাগতিক ক্ষেত্রে 'আমি' বলতে আমরা বুঝি এই বাস্তব দেহটাকে—এই বাস্তব দেহটা কিন্তু 'আমি' নয়। এটি একটি খাঁচা

মাত্র। এই খাঁচাটি যখন জীর্ণ হ'য়ে যাবে, অচল হ'য়ে যাবে, দেহভার বহনের শক্তি হারিয়ে ফেলবে তখন হেলায় এই দেহ-খাঁচা ছেড়ে আমিরূপ প্রাণপাখী উড়ে চলে যাবে অন্য খাঁচায়। তাহ'লে দেখা যায় আমাদের সীমিত জ্ঞানে এই বাস্তব সত্যকে নিয়েই আমরা মসগুল আছি।

শ্রীমাধব বলেন, বাস্তবজগতে বাস্তব বুদ্ধি নিয়ে এই আলোচনা করা অনুচিত কারণ তাতে ভুল বোঝাবুঝি হ'তে পারে। বাস্তবজগতে বাস্তব বুদ্ধি নিয়ে স্থান, কাল বিশেষে এই সত্য প্রকাশ করা বাতুলতা. তাই বলি বাস্তবজগতে যতদিন আছ ততদিন বাস্তববুদ্ধি নিয়ে চলাই ভাল। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়. সত্য বা ঈশ্বরকে ডাকাটাও বাতুলতার মধ্যে পড়ে। কারণ সারাবিশ্বে সর্বপ্রমাণ স্থানও নেই. যেখানে তিনি নেই. কাজেই তাঁকে ডেকে আলাদা করছ কেন,—এতো দ্বৈত জ্ঞান। তিনি পরমশূন্য, পরমসত্য— অনন্তবিশ্বকে তিনি তাঁর মধ্যে স্থান দিয়েছেন, তাঁর বাইরে তো কিছু নেই।

শ্রীমাধব বলেন. তোমার অস্তিত্ববোধ যতক্ষণ না শূন্য হবে ততক্ষণ সে মহাশূন্যের সংবাদ তো তুমি পাবে না। এই শূন্য অর্থে শূন্যের স্বভাব অনুশীলন করা। শূন্যের স্বভাব হ'ল' ভালমন্দ, দোষী নির্দোষী সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকা, সকলকে আশ্রয় দেওয়া। তোমাকেও তা অনুকরণ এবং অনুশীলন করতে হবে। সরলতা, নম্রতা. সহিষ্ণুতা, উদারতা ও প্রসারতা ইত্যাদি গুণাবলীর সাহায্যে শূন্যের সান্নিধ্যলাভ সহজ হয়। শূন্যের কোন শত্রু নেই, আমাদেরও শত্রুমুক্ত হ'তে হবে।

শ্রীমাধব বলেন, সত্যের বা ঈশ্বরের এ ব্যাখ্যা গীতাতেও আছে বাস্তবজগতে বাস্তব বুদ্ধি দ্বারা এ সব আলোচনা গ্রহণ করা খুবই কঠিন. তবে এ সমস্ত কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে কুসংস্কাররূপ ব্যাধি

থেকে মানুষ সহজে মুক্তি পেতে পারে। কুসংস্কারের মধ্যেই আমাদের জন্ম; সর্ব্বজীব নির্ব্বিশেষে এই কুসংস্কার রোগে ভুগছে, তার থেকে আমাদের মুক্ত হ'তেই হবে। আজকের আলোচনায় অন্ততপক্ষে কুসংস্কার থেকে মুক্তির পথও যদি আমরা খুঁজে পাই, তবেই এ আলোচনা সার্থক।

মহৎতত্ত্ব ও জড়জ্ঞান

গত মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় বিশেষ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি।

শ্রীমাধব নিজেই মহৎতত্ত্ব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, এই দৃশ্যমান জগতে যা কিছু আমরা দেখি সে সব কিছুরই উপাদান চব্বিশ ভাগে বিভক্ত হ'য়ে চব্বিশতত্ত্ব নাম হ'য়েছে। এই চব্বিশ তত্ত্বের উৎস হ'ল এক মহৎতত্ত্ব অর্থাৎ মহৎতত্ত্বই এই চব্বিশতত্ত্বের জন্মদাতা, আবার চব্বিশতত্ত্বের কম বেশী প্রাধান্য অনুযায়ী জগতের বহু দৃশ্যমান বস্তুর উপাদান সৃষ্টি হ'য়েছে। মহৎতত্ত্ব অব্যক্ত অসীমের অভিন্ন সত্তা। এই অব্যক্ত অসীমের কথা মানবমানবীর চিত্তে অনুভূত হ'লেও ব্যক্ত করা সহজ নয়। অশেষ প্রচেষ্টা দ্বারা যেটুকু ব্যক্ত বা প্রকাশ করতে সাধু, মহাপুরুষগণ সক্ষম হন, তারই নাম হ'ল জ্ঞান। অসীমের এই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান নামে অভিহিত। ব্রহ্মজ্ঞান থেকেই নেমে এসেছে জগতের জড়জ্ঞান। জড়জ্ঞানের মোহিনী-শক্তিতে আকৃষ্ট হ'য়ে মানবমানবী জড়জগৎকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি তাদের অজ্ঞানতা। জড়জগতে থেকেও জড়জ্ঞানকে উপেক্ষা ক'রে তাদের পৌঁছাতে হবে ব্রহ্মজ্ঞানে, কেননা

তাদের প্রকৃত লক্ষ্যবস্তু হ'ল ব্রহ্মজ্ঞান। মানবমানবীর নিজের মধ্যেই যে ব্রহ্মজ্ঞান আছে, সেকথা তারা বিস্মৃত হ'য়ে জড়জ্ঞানের অজ্ঞানতায় ডুবে গেছে। সেই হারানো সম্পদ যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাকে ফিরে পাবার জন্যই তাদের যত কিছু সাধন ভজন, জপ, তপ, কারণকর্ম্ম ইত্যাদি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহর্ষিগণ সেই মহামহাশূন্যের কিনারায় পৌঁছে তাঁকে অসীম এবং নিরাকার ব'লে যতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছেন তারই নাম দিয়েছেন ব্রহ্ম এবং যে জ্ঞানের সাহায্যে সেটি তাঁরা প্রকাশ করতে সমর্থ হ'য়েছেন তাকেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান।

জড়জ্ঞানের তিনটি অবস্থা।

১) অজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞান থাকলেও তার দ্বারা সাধারণ জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞানকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ২) সাধারণজ্ঞান ৩) বিশেষজ্ঞান।

শ্রীমাধব বলেন, যতক্ষণ মানবমানবী জড়জ্ঞানে আছে ততক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি হবেনা। আবার এই জড়জ্ঞান থেকেই ব্রহ্মজ্ঞানে পৌঁছাতে হবে। উপমাস্বরূপ তিনি বলেন, জড়বুদ্ধিতেই আমরা সন্ধ্যা আহ্নিক, জপতপ, পূজাপার্ব্বণ ক'রে থাকি; কেননা আমরা মনে করি এসব করলে আখেরে ভাল হবে। ভাল এবং মন্দের প্রভাব জড়বুদ্ধিতেই আছে। জড়বুদ্ধির অতীত হ'লে খারাপ ব'লে আর কিছু থাকেনা, তখন সবই ভাল।

• পঞ্চনীতি সম্পন্ন জ্ঞানকে বলে সাধারণ জ্ঞান। আর জড়বস্তুর প্রকাশ বিকাশ, কারণ ইত্যাদি যে জ্ঞান দ্বারা বোঝা যায় তাকে বলে বিশেষজ্ঞান। শ্রীমাধব বলেন, আমরা যে পূজা, জপতপ, যাগযজ্ঞ, নাম ইত্যাদি করি, সে সবই করি সংখ্যা অনুপাতে। এর কারণ হ'ল জপতপ, নাম ইত্যাদি যেন সংখ্যায় কম না হয়, যেমন হাজার-বার বা লক্ষবার নাম করা হয়। সংখ্যার এই বুদ্ধিটিও কিন্তু

জড়বুদ্ধি, কেননা এর পেছনে রয়েছে আমাদের ক্ষতিপূরণের প্রচেষ্টা। একথার অর্থ হ'ল বাস্তবজগতের সাধনভজন দ্বারা আমরা আমাদের মানসিক, বাচনিক ও দৈহিক যে সমস্ত ক্ষতি হয় সেই সব ক্ষতি-পূরণেরই চেষ্টা ক'রে থাকি।

মানসিক ক্ষতি বলতে, মনের দুঃখের দুশ্চিন্তার ভাব পোষণ করা, বাচনিক ক্ষতি হ'ল, কোন্ কথায় লোকের ক্ষতি হয় তা না বুঝে ভাল কথা বলতে চেষ্টা না ক'রে. সাধনভজন দ্বারা [illegible] ক্ষতিপূরণ করি, দৈহিক ক্ষতি [illegible] নানা পূজা, মানত ইত্যাদি ক'রে থাকি।

শ্রীমাধব বলেন [illegible] ক্ষতিপূরণের জন্য অথবা [illegible] [illegible]য়ের কাছে প্রার্থনা [illegible] কিন্তু প্রার্থনার বিনিময়ে কিছু পাবার অপেক্ষা কি না ক'রে [illegible] আগে থেকেই তো তিনি সব কিছু দিয়ে রেখেছেন. [illegible] তুলনা কি [illegible] আছে?

শ্রীমাধব বলেন, শুরু [illegible] করতে হ'লে প্রার্থনা ও নিবেদন কর, 'কানে শুন, আমি তোমার সত্তা, তোমা হ'তে আমি অভিন্ন [illegible] কানে শোনার স্মৃতিপথে এনে তাকে উপলব্ধি করতে হবে'। [illegible] মন নিয়ে সৎ [illegible] সম্পদের পুনরুদ্ধারের প্রার্থনাই শুভ প্রার্থনা। কিন্তু এ প্রার্থনা তাকে আমাদের আসে না। আমাদের সব প্রার্থনাই হ'ল মানসিক, বাচনিক এবং দৈহিক ক্ষতিপূরণের জন্য। এগুলো আমাদের সংস্কারে বা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। যেমন যাত্রাকালে গৃহদেবতাকে প্রণাম করি রাস্তার বিপদ আপদ এড়ানোর জন্য। প্রণামের প্রকৃষ্ট অর্থ হ'ল—যাত্রাপথে প্রণাম ক'রে একথাই স্মরণ করা উচিত যে, তাঁর কাছ থেকে এসেছি আবার তাঁরই কাছে আমায় যেতে হবে, এই ভাব যেন প্রণামের সময় স্মরণে থাকে।

শ্রীমাধব বলেন, তবে আমরা যে প্রণাম করি তার কি কোন

তখন তাকে নিভিয়ে দেওয়া যায় কি? আমাদের সাধন ভজনও হ'ল অন্ধকারের প্রদীপ স্বরূপ। এই প্রদীপই আমাদের দিনের আলোয় পৌঁছে দেবে। কাজেই সংস্কার মুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত এই প্রদীপের আলোকে আশ্রয় ক'রেই আমাদের চলতে হবে। দিনের আলোতে পৌঁছালে সংস্কার আপনিই বিদায় নেবে এবং তখন প্রদীপেরও আর প্রয়োজন থাকবে না।

শ্রীমাধব বলেন, জগত সংসারে মানব-মানবী কোন্ পথে যাবে, এই চিন্তায় সে সর্ব্বদাই বিব্রত থাকে। ভগবানের নাম ক'রেও তার সোয়াস্তি নেই, মনে হয়, এটা করা হ'ল না, ওটাতে ত্রুটি রয়ে গেল, তাই সর্ব্বদাই তার অপরাধীর ভাব। কোথায় গেলে যে শান্তি সেকথা সে বুঝে উঠতে পারে না, মনে হয় তাঁর নাম ক'রেও শান্তি আসে না কেন?

শ্রীমাধব বলেন, নামের মধ্যে নামী লুকিয়ে আছেন একথা সত্য, কিন্তু এটি উপলব্ধি করতে পারে ক'জন? যার অনুভূতিতে এটি আসে সে অবশ্যই শান্তি পায়। নামের উদ্দেশ্য হ'ল নামীকে চিহ্নিত করার প্রয়োজনে। যেমন কৃষ্ণ বললেই আমাদের চোখে ভাসে ত্রিভঙ্গ, হাতে বাঁশী, মাথায় চূড়া, পায়ে নূপুর। রাম বললে তাঁর ধনুক ইত্যাদি। কিন্তু ব্রহ্ম বললে কোন রূপ আমাদের চোখে ভাসে না, প্রকৃতি সংযোগে ব্রহ্মের যে প্রকাশ তাকে বলে ব্রহ্মাণ্ড। কাজেই মুনিঋষিগণ যতটুকু সম্ভব ব্রহ্মকে অনুভব করেছেন, উপলব্ধি ক'রেছেন কিন্তু প্রকাশ করতে সমর্থ হননি। তাই শ্রীমাধব বলেন, যাঁর নামে আনন্দ পাওয়া যায়, তাঁর নাম করাই ভাল।

আজ পর্যন্ত যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, তাঁরা সবাই নামের উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রেছেন, কেননা নাম দ্বারা তাঁকে চিহ্নিত করা হ'ল সব চাইতে সহজ ও প্রকৃষ্ট উপায়। দেবর্ষি নারদ মহাপ্রভুকে বলেছিলেন, 'প্রভু! ধরাতে তুমি নাম নিয়ে যাও।' সেই কারণেই নাম করাকে বলে নারদীয় ভক্তি।

আলোচনা সভায় জনৈক ভক্তের একটি ছোট্ট জিজ্ঞাসা ছিল—শ্বাস প্রশ্বাসে নাম, একথার অর্থ কি ?

শ্রীমাধব বলেন, সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রিয় পাত্রের নাম যদি কেউ করে, তবে কত আনন্দ হয়, কত আহ্লাদ হয়, সচকিত ভাব আসে। আর যদি পরমারাধ্য অতি আপনজনের নাম করা যায়, তবে তো সবকিছুই মধুর হ'য়ে উঠবে, গরল অমৃতে পরিণত হবে; তাই জগতে নাম করার রীতি প্রচলিত।

শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করার রীতিকে, শ্রীমাধব বলেন বর্ণপরিচয়। তিনি বলেন, রেচক, পূরক, কুম্ভক দ্বারা তুমি নাম করার অভ্যাস কর। এই তিন প্রকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কতবার নাম করতে পার তার হিসাব রেখে অভ্যাস যোগ দ্বারা তাকে বাড়িয়ে যেতে হবে। দেখা যাবে অভ্যাস যোগে সর্ব্বসময়ে আপনা থেকেই তোমার মধ্যে নাম হ'তে থাকবে। সর্ব্বসময়ে আপনা থেকে এরূপ নাম হওয়াকে বলে অনাহত জপ।

শ্রীমাধব বলেন, অভ্যাসযোগ দ্বারা চিদাভাসে পৌঁছান যায়। চিদাভাসে পৌঁছাতে পারলেই চিতে নামের মর্ম জাগ্রত হন। পূর্ব্বেও শ্রীমাধব তাঁর আলোচনা সভায় চিৎশক্তি অর্থাৎ চৈতন্যশক্তির উল্লেখ ক'রেছেন। অনাদি বহির্মুখতার কারণে মানবমানসের মধ্যে এই চৈতন্যশক্তি বিস্মৃতিতে পরিণত হ'য়েছে, তাকে জাগ্রত করতে পারলেই সব জানা এবং বোঝা সহজ হয়।

চিদাকাশে চৈতন্যশক্তি জাগ্রত হ'লে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সত্তাও জাগ্রত হয়। এই সত্তাই অনন্ত সবিতার সবিতা মহান জ্ঞানসূর্য্য। জ্ঞানসূর্য্যের প্রখর আলোকে চতুর্দিক আলোয় আলোময় হ'য়ে উঠে। এই চিদাকাশকেই ব্রাহ্মীচিৎ বলা হয়।

শ্রীমাধব বলেন, যেমন হারমোনিয়মের একটি সুর বাজাতে অনেকগুলো প্রকল্পের প্রয়োজন হয় এবং ঐ সমস্ত প্রকল্পের বিভিন্ন

প্রকার প্রভাবে নানা সুরের প্রকাশ সম্ভব হয় তেমনি একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই নানা প্রকল্পের যথাযোগ্য মান দিয়ে সত্যে পৌঁছান সম্ভব। ভগবানের সৃষ্ট অন্য কোন জীবের পক্ষে সেটি সম্ভব নয় বলেই মানব বিধাতা পুরুষের অনন্ত সৃষ্টি।

মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষু ও মহাপুরুষ সান্নিধ্য

গত মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করেন,—প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি? প্রকৃত মুমুক্ষু বলতে কি বোঝায়? প্রকৃষ্ট মহাপুরুষ সান্নিধ্যই বা কি?

প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শ্রীমাধব শুরু করেন, পৃথিবীতে চারটি জাতি, এই চারটি জাতির মধ্যেই প্রাণসঞ্চার সম্ভব হ'য়েছে। এই চারিটি জাতি ছাড়া আর যা কিছু আছে তাতে প্রাণের কোন সাড়া নেই।

এই চারটি জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম জাতি হ'ল উদ্ভিজ্জ, বিজ্ঞানের সহায়তায় তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার তথ্য প্রমাণিত হ'য়েছে। প্রাণ থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিজ্জ-জাতি প্রাণী ব'লে গণ্য নয় যেহেতু বৃক্ষলতা-গুল্ম ইত্যাদি এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করতে পারে না।

উদ্ভিজ্জের পরে স্বেদজ। তাদের মধ্যেও প্রাণ আছে এবং তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করতে পারে, এই পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম প্রাণী আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে এই স্বেদজদের। স্বেদজদেরও ও নিজস্ব আচরণবিধি বা স্বভাবচরিত্র আছে। প্রাণীজগতে স্বেদজর পরে আসে অণ্ডজ জাতি। জাতি অনুসারে অণ্ডজদের নিজস্ব আচরণ ও স্বভাব আছে এবং স্বেতজদের থেকে তাদের স্বভাবচরিত্রও

ভিন্ন পর্যায়ভুক্ত। অণ্ডজদের পরে আসে জরায়ুজ জাতি। পশু এবং মানুষ উভয়ত এই জরায়ুজ হ'লেও মানুষের উৎপত্তি হ'ল পশুর পরে। তাই মানুষের আচরণাবলী ও পশু থেকে স্বতন্ত্র। তাহ'লে দেখা গেল যে এই চারিটি জাতির মধ্যে পাঁচ প্রকারের আচরণ এবং স্বভাবের বিধান পাওয়া যায়, যথা উদ্ভিজ্জর আচরণ, স্বেদজের আচরণ, অণ্ডজের আচরণ এবং জরায়ুজের মধ্যে পশুর আচরণ ও মানুষের আচরণ।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এই পাঁচটি চরিত্রই অল্প বা প্রবেশ করে। এই পাঁচটি চরিত্রকে আমরা আলাদা ক'রে দেখতে পারি না যিনি পারেন তিনিই জ্ঞানী, তিনিই অন্য চারটিকে দমন বা সুপ্ত ক'রে মনুষ্যত্বের আচরণ নিয়ে সর্বদা বিচরণ করতে পারেন।

মানুষ এবং পশুর মধ্যে পার্থক্য হ'ল যে মানুষ বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী এবং সেই বিশেষ জ্ঞানের সাহায্যে সে সমস্ত কিছু হৃদয়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম, অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে এই উপলব্ধি বা অনুভূতি নেই। সকল প্রাণীরই আহার, নিদ্রা ও মৈথুন আছে কিন্তু বিশেষজ্ঞান কেবলমাত্র মানুষেরই আছে। এই বিশেষ জ্ঞানকেই বলে মনুষ্যত্ব।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বিশেষজ্ঞান বা মনুষ্যত্ব সুপ্ত অবস্থায় থাকে আর বাকী চারটি আচরণ বিধি নিয়েই সাধারণ মানুষ মেতে আছে। বিশেষজ্ঞানের গুণ হ'ল শৃঙ্খলা। যাঁরা এই জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয় তাদের জীবন শৃঙ্খলাপূর্ণ হয়। অপর যাদের এই বিশেষজ্ঞান সুপ্ত, তারা উচ্ছৃঙ্খল বা বিশৃঙ্খল জীবন যাপন করে। এ সমস্ত চিন্তা ক'রে দেখা যায় যে এই বিশেষ জ্ঞানের বাইরে যা কিছু সমস্তই মনুষ্যত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যতিক্রম। মনুষ্যত্বের গুণ হ'ল ক্রম। তাহ'লে এটি পরিষ্কার হ'ল যে বিশেষজ্ঞানই হ'ল মনুষ্যত্ব এবং তার ক্রিয়মান অবস্থা হ'ল ক্রমে চলা।

প্রশ্নকর্তার দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল প্রকৃত মুমুক্ষু বলতে কি বোঝায় ?

শ্রীমাধব বলেন, মনুষ্যত্ব খুঁজে পেলে বাদ বাকী দুটি আপনা থেকেই আসে। বিশেষ জ্ঞানে যারা চলতে অভ্যস্ত হয় তারা আপনা থেকেই মুমুক্ষু হ'য়ে উঠে অর্থাৎ মোক্ষকামী হ'য়ে নিজ নিজ আরাধ্য রসে ডুবে থাকে। মুখ্যের উদ্দেশ্যে যে মুখ্যজ্ঞান সেই জ্ঞান আহরণের জন্য যে মুখ্যপথে ডুবে থাকে সেই তো প্রকৃত মুমুক্ষু। শ্রীমাধব বলেন, এখানে চিন্তা ক'রে দেখ, মুমুক্ষুগণ ব্যতীত আর কি কেউ ভগবানকে লাভ করতে পারে ?

যদিও সাধারণ মানবমানবীর জন্য এই বিশেষজ্ঞান নয়, বিশেষের জন্যই এই বিশেষজ্ঞান তবুও সাধারণ মানবমানবী আপন চেষ্টার দ্বারা ও গুরুকৃপায় ঐ বিশেষের পর্যায়ভুক্ত হ'তে পারে। উপমা স্বরূপ তিনি বলেন, বিশেষ স্থান ও উপলক্ষ্য অনুযায়ী তোমরা যেমন বিশেষ পরিধেয় সামগ্রী পরিধান কর, এও তেমনি।

তৃতীয় প্রশ্ন ছিল মহাপুরুষ সান্নিধ্য।

শ্রীমাধব বলেন, মনুষ্যত্ব ও মুখ্যজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল সাধারণ মানুষের কোন ধারণা গড়ে উঠেনি অর্থাৎ যাদের মনুষ্যত্ব এবং মুখ্যজ্ঞান সুপ্ত হ'য়ে আছে তাদের পক্ষে এই দিকে অগ্রসর হবার প্রথম সোপান হ'ল মহাপুরুষসঙ্গ। যাদের উচিত জালিবোটের মত ষ্টীমারাদির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে দেওয়া। এখানে শ্রীমাধব সাধারণ মানবমানবীকে জালিবোটের সঙ্গে তুলনা ক'রেছেন এবং মহাপুরুষগণ হ'লেন ষ্টীমার অর্থাৎ জালিবোট যেমন ষ্টীমারের প্রতি নির্ভরশীল, গন্তব্যস্থলে ষ্টীমারই তাকে পৌঁছে দেয়, তেমনি মহাপুরুষগণের উপদেশ নির্দ্দেশে সাধারণ মানবমানবী নির্ভরশীল হ'তে পারলে বাধাবিঘ্ন এড়িয়ে পরম গন্তব্যপথে পৌঁছান সম্ভব হয়।

এসময় সভায় কেউ কেউ আত্মসমর্পণের কথা তোলেন। সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমাধব বলেন, মহাপুরুষের ভাষা বইয়ের ভাষা,

তা শুনতে-ও মধুর বলতেও মধুর কিন্তু প্রকৃষ্ট জ্ঞানের বিচারে চিন্তা ক'রে দেখ, তোমার বলতে কি আছে যে আত্মসমর্পণ করবে? সবই তো তাঁর। চিন্তা করতে হবে, কোন্ পর্যায়ে এই আত্মসমর্পণ করা চলে। যতক্ষণ আরাধ্য ও আমি এই দ্বৈতভাব আছে ততক্ষণ পূজা, নিবেদন, আত্মসমর্পণ সবই আছে কিন্তু একাত্ম বা অদ্বৈতভাব এসে গেলে এ প্রশ্ন আর ওঠে না। প্রকৃত আত্মসমর্পণের ভাবটি হ'ল মহাপুরুষরূপ স্টীমারে নিজেকে বেঁধে দিলে, সেই স্টীমারই যখন তোমাকে লক্ষ্য স্থানে পৌঁছে দেয় তখন মানবমানবার এই পূর্ণ নির্ভরতাকে বলে আত্মসমর্পণ। শ্রীমাধব বলেন, মহাপুরুষরূপ স্টীমারে দেহ দিয়েও কি আমরা নিশ্চিন্ত নির্ভরতা নিয়ে লক্ষ্যে স্থির থাকতে পারি? পারি না। ভাবি, হয়তো বা পাশের বড় স্টীমারটাই ছিল ভাল, ওটাকে পেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত এই সন্দেহের দোলায় সকলেই আমরা দোদুলমান।

আবার পাশের স্টীমারের জালিবোটের যাত্রীদেরও এই একই অবস্থা, ওরা ভাবে ডাঙ্গাতে পৌঁছাতে পারলে হয়। ইঞ্জিন বিকল হ'লে তো সবই পণ্ড হবে অর্থাৎ সবার মনেই সন্দিগ্ধ ভাব।

চিন্তা করলে দেখা যায় মহাপুরুষদের আমরা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ে নাবিয়ে এনেছি। এটা তো মহাপুরুষদের দোষ নয়। দোষ আমাদের। আমরা ভাবি মহাপুরুষগণ আমাদের কত কৃপা করছেন তাই তাঁদের জন্য মঠ, মন্দির, আশ্রম প্রতিষ্ঠা করি, দিনের পর দিন অজস্র ভেট পাঠিয়ে তাঁদের তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করি কিন্তু তাতেও যেন শান্তি পাই না। একবারও আমাদের মনে কি এই চিন্তা আসে যে মহাপুরুষগণ তো কৃপার দোকান খুলে বসেননি যে উপঢৌকন দিয়ে কৃপা কিনে আনব?

ঈশ্বর যে কৃপার সাগর, আমি জন্মাবার আগেই অশেষ কৃপা ক'রে উনি তো আমার সব ব্যবস্থাই ক'রে রেখেছেন, জন্মের পর

থেকে আমি যে সেই কৃপা সাগরেই ভাসছি। কৃপা ক'রে তিনি আমাদের তাঁর কাছেই রেখেছেন কিন্তু আমাদের বিস্মৃতিই সর্ব্বপ্রকার দুঃখ এবং অশান্তির কারণ।

শ্রীমাধব বলেন, জীবের ক্ষুন্নিবৃত্তির কারণে প্রকৃতিরূপে বৃক্ষের মাধ্যমেই তাঁর কৃপার প্রথম প্রকাশ। আমরা বেঁচেও আছি সেই বৃক্ষেরই আনুকূল্যে। ফল, মূল, দুধ, চিনি, গুড়, চাল, ডাল, রুটি, মাংস ইত্যাদি সকল ভোজ্যবস্তু ও পানীয় বৃক্ষেরই দান। যে প্রাণীর মাংস খাই সেও তো ঘাস খেয়েই বড় হ'য়েছে। পাহাড় পর্ব্বত যা কিছু চোখে পড়ে সবই বৃক্ষের দান। কয়লার সৃষ্টিও এই বৃক্ষ থেকে। তাহ'লে দেখা যায় প্রকৃতি হ'লেন সবারই মা।

আবার বৃক্ষ যে গ্যাস বা বাতাস ছাড়ে তা গ্রহণ ক'রে আমরা জীবিত আছি। তার মধ্যেও চৈতন্যশক্তি আছে, এই চৈতন্যশক্তিই হ'লেন পরমাত্মা বা পরমেশ্বর। তাহ'লে একথাও বলা চলে যে দৃশ্যমান এই জগতে এমন কিছু কি আছে যেখানে তিনি নেই? আমরা এই তত্ত্ব বিস্মৃত হ'য়েছি ব'লেই আমাদের যত দুঃখ যত অশান্তি।

শ্রীমাধব বলেন, নয়টি বৃক্ষ যথা ধান, কচু, হলুদ ইত্যাদি আমাদের প্রধান খাদ্য। এই নয়টি মিলিয়ে নাম হ'য়েছে নবদুর্গা। এই এক একটি বৃক্ষকে আবার জীবের এক একটি দুর্গ বলা হয়। এই দুর্গই ছিল জীবের বাসস্থান, জন্মপরম্পরায় এই দুর্গের বাইরে তার চলে গেছে। দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে বলেই দুর্গা বলা হয়। তিনি হ'লেন জগতবাসীর দুর্গস্বরূপ অর্থাৎ জীবের পরম নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। প্রকৃতির প্রথম অবদান বৃক্ষ, সেই বৃক্ষের উপর নির্ভর ক'রেই বিশ্ববাসী বেঁচে আছে। এর থেকে একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পিপীলিকাও বাদ যায়নি।

শ্রীমাধব বলেন, এসব বুঝে শুনে আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করা

ডাকবে বইকি, যীশুতে যার অনুরাগ সে যীশুর নামই করবে। সর্ব্বধর্ম্মের গণ্ডীতে যে সমস্ত আচরণবিধি রয়েছে, আচরণ দ্বারা সেই আচরণের ঊর্দ্ধে যেতে হবে তবেই বিশ্বজনীন জ্ঞান, প্রেম, ভাব বা ভাষার অধিকারী হ'তে পারবে। নিঃস্বার্থভাবে আশ্রয়দাতার সেবা যত্ন করা এবং আশ্রিতের লালন পালন করাই বিশ্বসংসারে একমাত্র নিষ্কাম কর্ম্ম বলা যায়, এ ছাড়া নিষ্কাম কর্ম্ম ব'লে যে সকল কর্ম্মের কথা আমরা কানে শুনি সে সবের মধ্যে আছে পরিপূর্ণ কামনার ধ্বনি।

কর্ত্তব্যকর্ম্মকরণটিই হ'ল একমাত্র নিষ্কাম কর্ম্ম। মা সন্তানকে বক্ষসুধা দিয়ে বাঁচাবে এটাতো তার করণীয় কর্ম্ম! এর মধ্যে তার কি কোন কামনা থাকতে পারে? কিন্তু ইন্দ্রিয় এবং রিপু চরিতার্থে যে কর্ম্ম তাকেই বলে কাম। আর মানবীয় সত্তাবোধে যে কর্ম্ম তাহাই নিষ্কাম। নিষ্কাম কর্ম্মী ভগবানকেও কামনা করে না কারণ সে তো জানে যে ভগবান হ'তে সে অভিন্ন, তবে আর তার কামনা থাকবে কেন?

নিষ্কাম কথাটি সামান্য নয়। এটি বৃন্দাবনের কথা অর্থাৎ আমাদের হৃদয়রূপ বৃন্দাবনে যেখানে ঈশ্বর চৈতন্যরূপে বিরাজমান সেখানকার কথা।

মানবমানবী যতক্ষণ জড়দেহ বোধে আছে ততক্ষণ কামনা বাসনা সবই তার থাকে।

দিনের পর দিন শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা আমাদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। যেমন 'নারায়ণকে ছোঁয়ার অধিকার সকলের নেই অথচ নারায়ণ হ'লেন সবার। যিনি চির পবিত্র, স্পর্শদোষে তাঁকে পঞ্চগব্য দিয়ে পবিত্র করা হয়! শ্রীমাধব বলেন, শাস্ত্রকারেরাও হয়তো এ বিধান দেননি, তাঁদের কথা বিকৃত হ'য়ে এ অবস্থায়' দাঁড়িয়েছে।

পুরুষকার প্রয়োগের কার্য্যকারিতা

গত মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্তের প্রশ্ন ছিল—সাধনক্ষেত্রে পুরুষকার প্রয়োগের কার্য্যকারিতা কতটুকু? যদি পুরুষকার দ্বারা ভগবানলাভ হয়, তবে পুরুষকার দ্বারা প্রারব্ধ খণ্ডন হয় বা হবে না কেন?

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, আমাদের সর্ব্বপ্রথম জানা দরকার পুরুষকার কাকে বলে, প্রশ্নের অন্য অংশ অর্থাৎ পুরুষকার দ্বারা ভগবান লাভ হয় কিনা বা প্রারব্ধ খণ্ডন করা যায় কিনা, সেটি পরের কথা।

ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষকার কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, এই জাগতিক বা প্রারব্ধ জগতে পুরুষকারের ক্রিয়া ও প্রকাশ যে রূপ নেয়, আত্মজগতে তার ক্রিয়া ও প্রকাশের রূপ কিন্তু একেবারেই আলাদা।

পুরুষকার বা পৌরুষ ও উদ্যমের সাহায্যে যেমন ঈশ্বর প্রাপ্তি বা প্রারব্ধ খণ্ডন সম্ভব নয় তেমনি আবার তাকে বাদ দিয়েও কিন্তু ঈশ্বর প্রাপ্তি বা প্রারব্ধ খণ্ডন সম্ভবপর হয় না।

এখন দেখা যাক, জাগতিক জগতে বা প্রারব্ধ জগতে পুরুষকারের ক্রিয়া ও প্রকাশের রূপ কি।

আত্মনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে সত্যের প্রেরণায় মানুষ যে শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় সেই শক্তিকেই বলে পুরুষকার। আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও দশের সঙ্গে আলাপ আলোচনায়, স্বভাব চরিত্রে, কর্ম্মে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে পুরুষকারের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়। যাঁর পুরুষকার জাগ্রত তিনিই মানবতার সহিত সুষ্ঠুভাবে সংসার পরিচালনা করতে পারেন, সংসার জীবনপথে হাবুডুবু খাবার প্রশ্ন সেখানে উঠে না।

পুরুষকারের আর একটি দিক হ'ল—আত্মবিশ্বাস। এই বিশ্বাস বলতে কেবলমাত্র দেবদ্বিজে গুরুতে বা ঈশ্বরে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কথা বলা হচ্ছে না, কেননা, আমাদের এই বিশ্বাসের স্থায়িত্ব কতক্ষণ? স্বার্থের আশ্বাস যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই এই বিশ্বাসও স্থায়ী হয়। সেই নিষ্ক্রিয় হ'লে এ বিশ্বাসও সরে যায়। কিন্তু আত্মবিশ্বাস যার আছে, তার ভেদবুদ্ধি কখন থাকে না, সে জানে ঈশ্বর থেকে সে অভেদ, তাই ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা তার থাকবে কেন, আর প্রারব্ধের কোন গুরুত্বও বা সে দেবে কেন?

এই আত্মবিশ্বাসের অর্থ, হ'ল আত্মায় বিশ্বাস। 'আমি আত্মার অভিন্ন সত্তা', এই বোধকেই বলে আত্মবিশ্বাস। এ বিশ্বাস [illegible] বিহীন। 'আমি ছিলাম, আছি, থাকব', তবে এ বিশ্বাসে কোন চিড় বা ফাটল নেই, এ বিশ্বাস তাই অচল, অটুট।

ঈশ্বর থেকে যে ভিন্নবোধে আছে তার ক্ষেত্রেই ঈশ্বরলাভের প্রশ্ন ওঠে, সেই প্রারব্ধের ভয়ে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে।

শ্রীমাধব বলেন, মায়িক জগতে মানবমানবীর বিশ্বাস কি রকম জান? যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, শ্বাস প্রশ্বাস বইছে অর্থাৎ স্বার্থের আশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছি ততক্ষণ জনগণের নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলে। এই মায়িক জগতের আর এক নাম হ'ল মনোজগৎ বা মনোরাজ্য। পূর্ব্বে শ্রীমাধব জনমানবের [illegible]ধারায় দুটি রাজ্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন, একটি মনোরাজ্য, অপরটি আত্মরাজ্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীমাধব বলেন চণ্ডীতে আছে এই মনোজগতেরই বিশ্লেষণ, তাই সেখানে [illegible] বধ। আর গীতায় আছে আত্মজগতের কথা। চণ্ডীর যেখানে শেষ, গীতার সেখানে শুরু, আর গীতার শেষে মোক্ষে পদার্পণ।

শ্রীমাধব বলেন সরল অর্থে পুরুষকার বলতে আমরা বুঝি যে সকল মানবমানবী সত্যবাদী, সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সত্যে নিমজ্জিত, সত্যই

অধিকারী তুমি হ'তে পাববে। শুধু কানে শুনলে হবে না, এসব বৃত্তির অনুশীলন করা চাই, ভ।বং প্রাপ্তিতো পরের কথা। ব্যাধি নিরাময়ের কারণে যেমন ঔষধ সেবন অপরিহার্য্য তেমনি এসব ক্ষেত্রেও অনুশীল একান্ত প্রয়োজন

এর পর শ্রীমাধব প্রারব্ধের প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, প্রারব্ধ কি রকম জান ?

প্রারব্ধ হ'ল বালি বোঝাই ছিদ্রযুক্ত হাঁড়ির মত। সেই হাঁড়ির উপর দিয়ে কত বন্যা, কত ঝড় জল বয়ে যায় কিন্তু তবু যেন হাঁড়ির আশ মেটে না, কারণ ছিদ্র দিয়ে সব জলই যে বেরিয়ে যায়। তাই বলি যতক্ষণ ছিদ্রকুম্ভে বাস করছ ততক্ষণ প্রারব্ধের শেষ নেই। ছিদ্রকুম্ভে কতরকম জল পড়ছে, এক এক রকম জলের এক এক রকম ক্রিয়া, তাই তার শেষ নেই। আমাদের দেহকুম্ভেও তো কত ছিদ্র রয়েছে, যা পাই প্রারব্ধ তাই গ্রহণ করে। প্রারব্ধ হ'লে তার ক্রিয়া এবং বিক্রিয়াও আছে। যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ প্রারব্ধও আছে! তবে প্রারব্ধের শেষ কি নেই? আছে। যেদিন আত্মবিশ্বাস জাগবে সেদিন প্রারব্ধও থাকবে না আর ভগবানের ভেতর আকাঙ্ক্ষাও চ'লে যাবে। আত্মবিশ্বাসের থেকেও আগে আত্মজ্ঞান। যার আত্মজ্ঞান হয় সেই মুমুক্ষ হবার উপযোগী। আত্মজ্ঞানই ঈশ্বরজ্ঞান, আত্মজ্ঞানই সর্ব্বস্ব। যেদিন আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে মানবমানবী আত্মরাজ্যে বিচরণ করবে সেদিনই তার প্রকৃত পুরষকার জাগ্রত হবে এবং সেদিন থেকেই তার মনোজগতের পুরুষকারের ক্রিয়ার সমাপ্তি।

পুরুষকার ক্রিয়মাণ, ক্রিয়াকারক, ক্রিয়াসম্পন্ন সবই। যোগ অর্থাৎ কর্ম্ম হ'ল পুরুষকারের বহিঃপ্রকাশ এবং ভক্তি হ'ল পুরুষকারের অন্তঃপ্রকাশ। যোগ ও ভক্তি সমন্বিত হ'য়ে যাহা সৃষ্টি হয় তা হ'ল পুরুষকারের জ্ঞানের প্রকাশ অর্থাৎ কর্ম্ম ও ভক্তি যুক্ত হ'তে হবে। কর্ম্ম এবং ভক্তির ভিত্তিই হ'ল জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের প্রকাশ বিকাশ

ভক্তি আর কর্ম্মদ্বারাই সম্ভব। যে কর্ম্মে ভক্তি নেই সে কর্ম্ম, কর্ম্ম নামের অযোগ্য আবার যে ভক্তিতে কর্ম্ম নেই, সে ভক্তি প্রকৃত ভক্তির মর্য্যাদা পেতে পারে না অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশ এই দুয়ের যোগাযোগের উপর নির্ভরশীল।

যে সবল সে জানে, 'আমি কিছুই নই, আমি তাঁর অভিন্ন সত্ত্বা।' যার এই বোধ জেগেছে তার পক্ষেই আত্মসমর্পণ করা সম্ভব, কিন্তু যে দুর্ব্বল সে তো অজ্ঞান, তাই অভিন্নতা বোধ তার নেই, সে আত্মসমর্পণ করবে কি ক'রে?

শ্রীমাধব বলেন, পূর্ব্বেই বলেছি পুরুষাকারের অন্তর্প্রকাশ হ'ল শক্তি, যার ভক্তি আছে সে বুঝেছে, 'আমার অস্তিত্ব কিছু নেই।' এই পুরুষকার যার আছে, আত্মসমর্পণ করার অধিকারও তারই আছে। তবে একথা ঠিক যে দেহবুদ্ধি থাকাকালীন প্রারব্ধের হাত থেকে মুক্তি নেই।

আমরা মনে ভাবি, যে স্থাবর হ'য়ে বসে আছে তার কর্ম্ম নেই কিন্তু স্থাবরতাও একটি কর্ম্ম। চুপ ক'রে বসে থাকাটাও একটা কর্ম্ম। অভ্যাস যোগ দ্বারা এটি আয়ত্ত করতে হয়। আবিলতাশূন্য অন্তরে স্থির হ'য়ে বসে দৃষ্টির অতীত যে সূক্ষ্মকর্ম্ম সেই কর্ম্মে সে নিজেকে নিয়োজিত করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মকে অনুভব করবার কারণেই। এ কর্ম্ম এত সূক্ষ্ম যে বহিদৃষ্টিতে তাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাই এই কর্ম্মাতীত কর্ম্মের মর্ম্ম বোঝেন।

ধ্যান করতে আমরা মনে করি বঙ্কুবিহারীকে বা মাকে দর্শন করা। অনেক সময় বলা হয়, 'রাধাগোবিন্দের ধ্যান কর।' এ কথার প্রকৃত অর্থ হ'ল, তুমি যে রাধা আর তোমার মধ্যে বা সবার মধ্যে যে আত্মারূপী কৃষ্ণ রয়েছেন যিনি বিশ্বচরাচরে স্রষ্টা, সেই গোবিন্দকে ধ্যান কর।

এই রাধা গোবিন্দের ধ্যান কতক্ষণ করতে হবে? শ্রীমাধব

বলেন, যতক্ষণ এই সত্য তোমার বোধে না আসছে যে, তুমি বা বিশ্বচরাচরের সবাই রাধা এবং তোমার পরিচালক একমাত্র কৃষ্ণ, ততক্ষণ ঐ মূর্ত্তি ধ্যান করতে হবে। কিন্তু ঐ মূর্ত্তিতে যেন চিরকাল আটকে থেকো না। এ হ'ল তোমার প্রথম বর্ণপরিচয়। বর্ণপরিচয় নিয়ে সারাজীবন তো কাটিয়ে দেওয়া যায় না, এ শিক্ষা যে তোমার অগ্রগতির পথে প্রথম সোপান।

সংস্কারের উৎস

গত মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করেন—আমরা যে নানাবিধ সংস্কারে আবদ্ধ হ'য়ে আছি, সেগুলোর উৎস কোথায়?

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, হারিয়ে যাওয়া মনুষ্যত্ব ফিরে পাবার জন্য মানুষের যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাকে রূপদান করার কারণে সে নানা নীতি বা পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং তার জন্য সে যে সমস্ত আচরণবিধি আশ্রয় করে, তারই নাম সংস্কার। কাজে কাজেই মানুষের মনুষ্যত্ব ফিরে পাবার ইচ্ছাকেই সংস্কারের উৎস বলা যায়।

জন্মলগ্ন থেকেই সংস্কার মানুষের মধ্যে নিহিত থাকে এবং জন্মের পর তার প্রকাশ বিকাশ শুরু হয়। মনুষ্যত্ব ফিরে পাবার ইচ্ছায় সেই সমস্ত নীতি, পদ্ধতি, সংস্কারের ক্রম বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন সামাজিক সংস্কার, আধ্যাত্মিক সংস্কার, বৈদিক সংস্কার ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্কারের নীতি, পদ্ধতিও বিভিন্ন।

আমরা মানুষ, ষোল আনা মনুষ্যত্বই আমাদের ফিরে পেতে হবে এই আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাই আছে সংস্কারের মূলে। ভগবানকে লাভ

তন্ত্রে মস্তিষ্ক বা মেধাশক্তি এবং হৃদয় হ'ল মন-বুদ্ধির লীলাক্ষেত্র। এই মস্তিষ্ক এবং হৃদয় এর সহায়তায় মন ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে ভোগ করে, আবার ষড়রিপুও মনের সহায়তায় ইন্দ্রিয়ের এই বিষয়কে ভোগ করে। আবার ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ থেকেই পালাক্রমে আসছে জন্ম এবং মৃত্যু বা জগতে গতায়াত। ইন্দ্রিয়ের এই বিষয় নিয়েই হ'ল মনোরাজ্যের খেলাঘর।

দেহতত্ত্বে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল সবাই ইন্দ্রিয়ের এই বিষয়কে ভোগ করছে। দেহতত্ত্বে স্বর্গরাজ্য বলতে আমরা বুঝি মস্তককে। সেখানে বিষয় ভোগ করে মেধা-শক্তি। বিষয় হ'ল, একটি প্রত্যক্ষ এবং একটি অতিসূক্ষ্ম। এই বিষয়ের সৃষ্টি কোথা থেকে হয় সেটি নির্ণয় করাই মেধার কর্ম্ম অর্থাৎ বিজ্ঞানের কর্ম্ম। হৃদয় হ'ল মর্ত্ত্যভূমি. সব কিছুর সৃষ্টিস্থল হ'ল এই হৃদয়। আর এই বিষয়কে যখন আমাদের ষড়রিপু ভোগ করে, তখন সমস্ত অবস্থায়ই পতন অবশ্যম্ভাবী তাই তাকে বলে পাতাল। আমরা এই তিনটি বা এই তিন ভাবে এই বিষয়কে ভোগ করছি। এই তিনটি ভাবে সংস্কারকে দুটি প্রশস্ত ভাগে ভাগ করা যায়, তার একটি সুসংস্কার ও একটি কুসংস্কার। ক্রমের পথে যে বিষয় আমরা ভোগ করছি সেটি সর্ব্বজন গ্রহণযোগ্য তাই সেটি সুসংস্কার। আবার যে কর্ম্ম ব্যতিক্রমের পথে যাচ্ছে সেটি অসঙ্গত তাই সর্ব্বজনত্যাজ্য এবং তাকেই বলি কুসংস্কার।

শ্রীমাধব বলেন, ইন্দ্রিয়ের সংস্কার কিরূপ? প্রতি পলে পলে যেমন আমাদের চোখের পলক পড়ে, এটি হ'ল ইন্দ্রিয়ের সুসংস্কার; এই সংস্কারে প্রতি পলে পলে চোখের ধুলাবালি মুছে যাচ্ছে। এরকম আমাদের প্রতিটি ইন্দ্রিয়েরই সংস্কার আছে। কর্ণের সংস্কার হ'ল শ্রবণ করা। অনেক সময় কোন কোন কথা আমরা শুনেও শুনিনা, একে কিন্তু কুসংস্কার বলা যায় না। কেননা যে কথা শুনলে

জীবন অতিষ্ঠ হয় বা ঝামেলা বাড়ে সেকথা শোনার প্রয়োজন কি? প্রত্যেক সংস্কারেরই সু এবং কু আছে অর্থাৎ ভাল এবং মন্দ দুটি দিকই আছে। এই সমস্ত সংস্কার আছে ব'লেই মনুষ্যত্ব ফিরে পাবার পথও খুঁজে পাওয়া যায়।

শ্রীমাধব বলেন, মানুষের মধ্যেও নারী এবং পুরুষের সংস্কার ভিন্ন। মায়ের সংস্কার হ'ল ধারণ করা, আর পিতার সংস্কার হ'ল সৃষ্টি করা। প্রকৃতি ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার চোখের সামনে দেখে আমরা অনেক উপকৃত হই। পিতা ও মাতার এই সংস্কার আছে ব'লেই আমরা সৃজিত হ'য়েছি। আকার প্রকার ভেদেও সংস্কার ভিন্ন ভিন্ন হ'তে পারে।

এখন প্রশ্ন উঠে এই সংস্কারের পেছনে কি কারণ নিহিত আছে?

শ্রীমাধব বলেন, আমাদের ভালমন্দ যা কিছু সবই যে তাঁর ইচ্ছায় হয়, এটি উপলব্ধি বা বোধ করার জন্যই সংস্কার। এ বোধ যেদিন আসে, সেদিন আমিত্বের বোধ বা পাপপুণ্যের বোধ কিছুই আর থাকে না। নিজেকে জানাই সংস্কার অতিক্রম করার পথ। সর্ব্বকালে, সর্ব্বশাস্ত্রে এই একই কথার পুনরাবৃত্তি—নিজেকে জান। নিজেকে জানাই ঈশ্বরকে জানা, এবং এর দ্বারাই সব সংস্কার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

শ্রীমাধব বলেন, অপরকে তো দূরের কথা নিজের উপরই কি আমাদের পূর্ণবিশ্বাস আছে? অ-ভাবই আমাদের মধ্যে এই অবিশ্বাস এনে দিয়েছে। এই অ-ভাবটি কি? আমরা যা নিয়ে অর্থাৎ যে মনুষ্যত্বরূপ সম্পদ নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছি সেটি হ'ল আমাদের ভাব, কিন্তু জগতে পদার্পণ ক'রে ক্রমান্বয়ে সেই মনুষ্যত্বরূপ সম্পদ যতটুকু হারিয়েছি ততটুকুই অ-ভাবের সৃষ্টি হ'য়েছে। নানারকম ব্যতিক্রমের দ্বারা সেই অ-ভাব পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে।

জাগতিক ক্ষেত্রেও দেখা যায় অভাবই কর্ম্মের প্রেরণা যোগায়। সেই

অভাব পূরণের জন্য ঠাকুরের পায়ে কতই না ফুল বেলপাতা, ও মিষ্টান্ন ভোগের আয়োজন। হয়তো দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে অভিষ্ট সিদ্ধিও হ'য়ে থাকে, তখন ঠাকুরের প্রতি ভক্তি, বিশ্বাসের আর অন্ত থাকে না।

শ্রীমাধব বলেন, এ হ'ল 'ঠাটা পড়ে বক মরে, আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে' সেই রকম। আবার ঠাকুরের পায়ে মাথা খুঁড়েও যখন অভিষ্ট সিদ্ধির হদিস মেলে না, তখন ভগবানের উপর কোন আস্থা কি আমাদের থাকে ?

শ্রীমাধব উপদেশ দেন, নিজেকে বিচার ক'রে দেখ, মনুষ্যত্বের ভাব তোমার মধ্যে কতটুকু আছে আর অ-ভাবই বা কতটা জায়গা জুড়ে আছে। মনুষ্যত্বের ভাবই হ'ল সুক্রিয়া আর অ-ভাবই হ'ল কুক্রিয়া।

দেহতত্ত্বে আমাদের এই ভাব ও অ-ভাব এরা দুজনেই দুজনের জায়গা দখল ক'রে নিতে চায় ; এটিই হ'ল গীতার কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ। ভাব হ'ল পাণ্ডবগণ আর অ-ভাব হ'ল কৌরবেরা।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীমাধব প্রশ্ন তোলেন, কুরুক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলা হয় কেন ?

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের আগে থেকেই এই ক্ষেত্রটিকে ধর্ম্মক্ষেত্র ও কুরুক্ষেত্র বলা হ'ত। মহারাজ কুরু এই ক্ষেত্রে হাল চালনা করতেন তাই এর নাম ছিল কর্ম্মক্ষেত্র বা কুরুক্ষেত্র। আবার এই ক্ষেত্রে তপস্যা ক'রে তিনি বর প্রার্থনা ক'রেছিলেন যে, তপস্যা ক'রে এই ক্ষেত্রে যদি কেউ প্রাণত্যাগ করে তবে সে যেন মোক্ষপদ লাভ করে, সে কারণে একে বলে ধর্ম্মক্ষেত্র। পরশুরামও একুশবার দেশ নিঃক্ষত্রিয় করে এখানে পিতৃতর্পণ করেন এবং বহু মুনিঋষিগণ এই ক্ষেত্রে যাগযজ্ঞ করেন ব'লে ঐতিহাসিক সূত্রে একে ধর্ম্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্র বা কর্ম্মক্ষেত্র আখ্যা দেওয়া হয়।

শ্রীমাধব বলেন, এবারে দেখা যাক্ দেহতত্ত্বে এই ধর্ম্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র কি অর্থ বহন করে?

তিনি বলেন, সমস্ত জীবই কর্ম্মক্ষেত্রে বা কুরুক্ষেত্রে বাস করছে। এই বিশ্বটি কর্ম্মছাড়া পরিচালিত হ'তে পারে না। বিশ্বের হৃদয়ই হ'ল কর্ম্মক্ষেত্র, আবার মানবমানবীর কর্ম্মক্ষেত্রও তার হৃদয়।

আমাদের মেধাশক্তির স্থান হল মস্তিষ্ক। মেধাশক্তি থেকে ধী শক্তির সৃষ্টি। এই ধী শক্তির স্বভাব হ'ল ধারণ করা এবং তার ক্রিয়া হ'ল প্রকাশ করা। একেই বলে কর্ম্ম। কর্ম্ম থেকে যে ধর্ম্ম তাহাই সব কিছু ধারণ করছে। শ্রীমাধব বলেন, কর্ম্ম ও ধর্ম্মকে যদি এই অর্থে চিন্তা করা যায়, তবেই সেটি সর্ব্বজনের গ্রহণযোগ্য হবে।

স্থান-কাল-পাত্রানুসারে ভাগ করলে সংস্কারকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি ভাগ হ'ল গণ্ডীবদ্ধ বা সীমাবদ্ধ সংস্কার। যেমন কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান আবার কেউ বা খ্রীষ্টান। আবার সার্ব্বজনীন সংস্কার হ'ল মুক্ত সংস্কার, সে মানবমানবীকে মুক্তির পথ দেখায়। গণ্ডীবদ্ধ ধর্ম্মের সংস্কার মানবমানবীকে বদ্ধ জীবনের পথে নিয়ে যায়, সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে, কেননা গণ্ডীবদ্ধ ধর্ম্ম আমাদের মনকে এবং ভাবকে সর্ব্বদা গণ্ডীর সঙ্কীর্ণ সীমারেখায় বেঁধে রাখে।

তাই শ্রীমাধবের উপদেশ হ'ল গণ্ডীবদ্ধ সংস্কারে আবদ্ধ না হ'য়ে আমাদের গ্রহণ করতে হবে বিশ্বজনীন সংস্কার অর্থাৎ সুসংস্কার; যে সংস্কার আমাদের সর্ব্বসংস্কারের হাত থেকে মুক্তি দান করতে পারে।

কর্ম্মের উৎস ও তার প্রকারভেদ

গত মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় প্রশ্ন ছিল—কর্ম্ম কি? অকর্ম্ম এবং বিকর্ম্মই বা কাকে বলে? কে কর্ম্ম সৃষ্টি ক'রেছেন,

আর কর্ম্মের ফলদাতাই বা কে? কর্ম্মের উৎস কি? কে এই কর্ম্ম করাচ্ছেন?

আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমাধব বলেন, সর্ব্বকারণের কারণ যিনি মূলতঃ তাঁর থেকেই সমস্ত কর্ম্মের সৃষ্টি। কারণ তো একটি নয়, কারণ অনন্ত; যেমন সর্ব্বকারণের কারণ যে পরমেশ্বর, তিনিও জগৎসৃষ্টির কারণে তাঁর ঈক্ষণকে রূপদান করলেন কর্ম্মের মাধ্যমে। তিনি নিজেই কর্ম্ম, নিজেই ধর্ম্ম, নিজেই ঈশ্বর। কাজেই কারণকেই কর্ম্মের উৎস ব'লে ধরা যেতে পারে। উপমাস্বরূপ তিনি বলেন, যেমন সংসারের অভাব অভিযোগ দূরীকরণের কারণে আমরা কর্ম্ম করছি, এক্ষেত্রে সংসারই এই কর্ম্মের কারণ স্বরূপ। আবাব অভাবটি যখন ক্ষুধার আকার ধারণ করে তখন সেই ক্ষুধার কারণেই আমরা কর্ম্ম ক'রে থাকি। ক্ষুধা বহুধা। কোন বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্বারাই যেন ক্ষুধার বিশদ বিবরণ শেষ করা যায় না। এই ক্ষুধা যে কত প্রকারেব তার কোন ইয়ত্তা নেই। আমাদের অভাবের ক্ষুধা আছে, যৌবনের ক্ষুধা আছে, আরও কত রকমের ক্ষুধা আছে, সেই সঙ্গে আবার ঈশ্বরের ক্ষুধাও আছে এবং এই সব ক্ষুধার পরিপূরণার্থে আমরা নিজেদের কর্ম্মে নিয়োজিত করি।

গীতায় আছে, 'আমাকে পেতে হ'লে কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর।' একথা পড়তে যত ভাল, তার চাইতে শুনতে আরও ভাল লাগে এবং বুঝতে পারলে অমৃতের স্বাদ পাওয়া যায়; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এ তত্ত্বের প্রয়োগ বিষময় হ'য়ে উঠে। শ্রীমাধব বলেন, চলমানযুগে এমন একটি লোকও কি খুঁজে পাওয়া সম্ভব যে কর্ম্ম ক'রে ফলত্যাগ করতে পেরেছে? তা যদি হয় তবে সারা মাস কাজ ক'বে রুজি রোজগার তো আর ঘরে আনা চলে না। মাইনে হাতে না এলে খাবে কি? তাহলে চিন্তা ক'রে দেখ, কর্ম্মের ফল কে না ভোগ করে। তবে কি গীতার কথা ভুল? না, তা নয়। এ যে স্বয়ং কৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত

বাণী, অন্য কারুর মুখের কথা তো নয়। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ একথা ব'লেছিলেন। বিশ্বের সকল মানবমানবীই তো এক একটি অর্জ্জুন। তবে কোন্ অর্জ্জুন কর্ম্মফল ত্যাগ করেছে? তাহলে এই কর্ম্মফল ত্যাগের প্রকৃত অর্থ কি, সেটিই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত।

যে কর্ম্মে ফল সৃষ্টি হয়, সেই কর্ম্ম ত্যাগ করাই ভাল। তাই আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের দ্বারা ভেবে দেখতে হবে যে, কোন্ কর্ম্মে ফল সৃষ্টি হয় আর কোন্ কর্ম্মে ফল সৃষ্টি হয় না।

শ্রীমাধব বলেন, জীবনপথের অনেকটাই তো তোমরা প্রত্যেকে অতিক্রম ক'রে এসেছ, তাতে কর্ম্ম সম্বন্ধে কি দেখেছ, কি বুঝেছ, কি ধারণা তোমাদের জন্মেছে? কোন্‌টিকে কর্ম্মফল বলে এবং কর্ম্মফল ত্যাগ কি ক'রে হয় সেটা জানতে পারলেই সব মীমাংসা হ'য়ে যাবে। এক কর্ম্মফলের বিচারেই সব কিছুর সমাধান হবে। আগেই বলেছি কারণই হ'ল সর্ব্বকর্ম্মের উৎস। এই কর্ম্মফলের ত্যাগ কি ক'রে হয়? চিন্তা করলে দেখা যায়, সংসারে পিতা কর্ম্ম ক'রে পুত্রকন্যাকে ভরণ-পোষণ করেন, শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে মানুষ ক'রে তোলেন। পিতা, পুত্রের রুজি রোজগারের আশা নিয়ে কখন তাকে মানুষ করেন না, এটি তো চিরকালের প্রথা। প্রকৃত পিতামাতা ফলের আশায় সন্তান লালন-পালন করেন না, সন্তান তার জীবন পথকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করুক, সুখী হ'ক, এটিই তাঁদের লক্ষ্য থাকে। ক্রমের পথে থেকে যাঁরা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করেন তাঁদের ক্ষেত্রে ফলের কোন প্রশ্নই নেই। সন্তান বড় হ'য়ে পিতামাতার সেবা যত্ন করবে বা খাওয়াবে, পরাবে এটা আশা ক'রে, কোন পিতামাতাই সন্তান মানুষ করেন না।

প্রকৃষ্টভাবে যারা সংসার করে, নিজ উপার্জ্জনের অর্থ দিয়ে তারা নিজের বাগানটিকেই সাজায়। নিজের বাগানের জন্য যতটুকু জল প্রয়োজন, মালীরূপে সে জলটুকু সে সিঞ্চন ক'রে থাকে। অন্য

বাগানের দিকে তার উৎসুক দৃষ্টি নেই। যে নিজের বাগানে ছিটেফোঁটা জল দিয়ে আবার অন্যের বাগানেও জল দেয়, সেই কর্ম্মই পরিণামশীল। এই পরিণামশীল কর্ম্মকেই অকর্ম্ম বলে। কাজেই এই কর্ম্মের পরিণাম তাকে তো-ভুগতে হবেই।

শ্রীমাধব বলেন, তোমার যতটুকু জল বইবার ক্ষমতা আছে তা দিয়ে নিজের বাগানের চারাগাছগুলোকে সঞ্জীবিত ক'রে তোল, মুখ শুকিয়ে তোমার প্রত্যাশায়ই যে তারা তাকিয়ে আছে, কবে তুমি তাদের নীরব শুষ্ক মুখে এনে দেবে ভাষা। সংসারের যত গাছ—বড়, ছোট, চারাগাছ ইত্যাদি অর্থাৎ সন্তান সন্ততি আদি সবাই যে তোমার উপরেই নির্ভরশীল; তাই তোমার সংসাররূপ বাগানের জলসিঞ্চন করাই তোমার সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। আর যে নিজের বাগানকে উপেক্ষা ক'রে, দু',চারটে ফল খাবার লোভে অন্য বাগানে জল দেয় অর্থাৎ আত্মচরিতার্থে কর্ম্ম করে তাকে তো পরিণামের ভাগী হ'তেই হবে।

নিজের বাগানের প্রতিটি গাছে উপযুক্ত জলসিঞ্চন ক'রে ফলেফুলে সুশোভিত ক'রে তুলতে পারলে সে বাগানে অতুলনীয় শোভা বিরাজ করে অর্থাৎ ভগবৎ আশীর্ব্বাদে সেই সংসার সুখ ও শান্তির আলয়ে পরিণত হয়। একেই বলে নিষ্কাম কর্ম্ম। এখানে কর্ত্তব্যপরায়ণতার কারণে তার শ্রমের ফল ত্যাগ হ'য়ে যায়। কর্ত্তব্য-পরায়ণ ব্যক্তির কর্ম্মফল আপনা থেকেই ত্যাগ হ'য়ে যায়। আর আত্মচরিতার্থে বা ইন্দ্রিয়চরিতার্থে যে কর্ম্ম, সে কর্ম্মের ফল তাকে ভোগ করতেই হয়; কেননা সেই কর্ম্ম যে পরিণামশীল! এই কর্ম্মকেই বিকর্ম্ম বলা হয়। তাই মানবমানবীর প্রতি শ্রীমাধবের উপদেশ হ'ল যে, প্রত্যেকেরই উচিত কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া। তিনি বলেন, তবেই দেখবে যে তোমার কর্ম্মফল আপনা থেকেই ত্যাগ হ'য়ে যাচ্ছে। তাই কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী রাধারানী বলেছিলেন, কাঁকালের কলসী যে কখন

পড়ে গেল তাও তিনি জানেন না, কেননা তাঁর মনপ্রাণ সবই যে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা।

তেমনি কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির কর্ম্মফল আপনা থেকেই ত্যাগ হ'য়ে যায় এবং কে সেই ফল ভোগ করছে সে হদিস রাখবার আগ্রহও তার থাকে না। কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি তাকেই বলে যে সযত্নে নিজের বাগানটি রক্ষা করে এবং পরের বাগানের দিকে লোভ বা লাভের দৃষ্টি দেয় না।

আলোচনা সভায় এ সময় কথা উঠেছিল যে, লোভ বা লাভের বশবর্ত্তী না হয়েও তো অপরের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া যায়। তার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, নিজের বাগানকে রক্ষা ক'রে পরের বাগানে জল ঢালার মত মহানুভবতা কি আমাদের আছে?

নিজের বাগান ফলে ফুলে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলেই পরের বাগানের দিকে লক্ষ্য দেওয়া চলে। তুমি নিজে খোঁড়া হ'য়ে কি অপরের পিছনে দৌড়াতে পার? নিজের বাগান অর্থাৎ সংসারের প্রতি যে কর্ত্তব্যপরায়ণ তার কর্ম্মফল আপনি ত্যাগ হয়। তোমরা যে আর্ত্তসেবার কথা মনে ভাবছ সেটি হ'ল, তোমার সামনে যদি কারো বাগান পুড়ে যেতে থাকে, সেখানে অবশ্য জল ঢালতে হবে। এতে তো তোমার কর্ত্তব্যে কোন ত্রুটি হ'চ্ছে না বা ব্যতিক্রম কর্ম্ম করা হ'চ্ছে না। ব্যতিক্রম তাকেই বলি, যখন নিজের বাগানের আম ফেলে পরের বাগানের পোকা আমও চুরি ক'রে খেতে মন যায় বা আপন সতীসাধ্বী স্ত্রী যত ভালই হ'ক না কেন, তার চাইতে পরের বৌকে বেশী ভাল লাগে—এমন মানুষকে কি আর মানুষ বলা যায়।

শ্রীমাধব বলেন, তোমার নিজের বাগান সর্ব্বতোভাবে রক্ষা ক'রে তদুপরি যদি নিঃস্বার্থভাবে পরের বাগানও রক্ষা করার শক্তি তোমার থাকে তবে সে তো অতি উত্তম কথা। নিজের সংসাররূপ বাগান রক্ষা করা তো স্বার্থপরতা নয়। তোমার শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও

যদি তোমার চোখের সামনে কারুর সংসাররূপ বাগান আগুনে অর্থাৎ অভাবে পুড়ে ছারখার হ'য়ে যায় এবং তুমি সেখানে দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ কর তবে সেটি হবে বুদ্ধিহীনের পরিচয়। কর্ত্তব্যপরায়ণতার ক্ষেত্রে স্বার্থপরতার কোন গন্ধ নেই।

আমরা আমাদের বাগানে চারাগাছ ও বড়গাছকে না চাইতেই তো কত জলসিঞ্চন করি, সেখানে অপরের বাগানে আগুন ধ'রে গেলে জল ঢাল'ত হবে বৈকি। এটিই হ'ল সুকর্ম্ম। পরিণামশীল নয়।

আর নিজের বাগান তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে যখন তুমি রাতের অন্ধকারে অন্যের বাগানের ফল চুরি কর, সেটি হ'ল তোমার অনধিকার কর্ম্ম তাই তাকে বলে কুকর্ম্ম। এই কর্ম্মটি কিন্তু পরিণামশীল। এটাও হল বিকর্ম্ম।

শ্রীমাধবের নির্দ্দেশ হ'ল কারুর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আত্ম-চরিতার্থে গা ভাসিয়ে দিও না। তোমার ছেলেমেয়ে দুটি ভাতের কাঙ্গাল আর তুমি হাতে পয়সা পেয়ে যদি নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের কারণে তা অকাতরে খরচ কর তবে সে কর্ম্ম অবশ্যই পরিণামশীল। তোমাকে কর্ত্তব্যপরায়ণ হ'তে হবে। মানুষ হিসাবে যে দায়িত্ব বা কর্ত্তব্যের ভার তোমার উপর ন্যস্ত, তা সুনিপুণভাবে তোমাকে সম্পন্ন করতে হবে। অন্যে কে কি করছে তা তো তোমার দেখবার প্রয়োজন নেই। সাক্ষীস্বরূপ যে পরমেশ্বর, সারাবিশ্বের কোন কর্ম্মই যে তাঁর চোখ এড়ায় না।

এর পর শ্রীমাধব বলেন, একটি কথা আছে—'কর্ম্মফল কৃষ্ণে অর্পণ কর'। কর্ম্মফল ত্যাগের কথাটি অনুধাবন করতে পারলে, কর্ম্মফল কৃষ্ণে অর্পণ কথাটিও বোঝা সহজ হয়।

ভেবে দেখ, তোমরা তোমাদের জীবনের বেশী অংশই তো পেরিয়ে এসেছ—সারাজীবন কর্ম্ম ক'রে কি ফল তোমরা লাভ করলে?

জীবনপথে যা কিছু জেনেছ, সেটাই জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানই তো তোমাদের কর্ম্মের ফল। এবারে ভাব, এই ফল তোমাদের নয়। এই ফলটি কৃষ্ণে বা গুরুতে অর্পণ করতে হবে। কিন্তু মুখে বললেই কি জ্ঞানকে কৃষ্ণে অর্পণ করা সহজ? না, তা নয়। তবে তোমাদের কি করা উচিত? তোমাদের মধ্যে যাঁরা গুরু ক'রেছ তাদের উচিত, গুরুবাণী অনুকরণশীল হ'য়ে কর্ম্ম করা, তাহ'লে সেই কর্ম্মের ফল আপনা থেকেই গুরুতে বর্ত্তাবে। গুরুবাণী অনুকরণশীল হ'লে তার ফল ভাল মন্দ যা-ই হ'ক না কেন, সে চিন্তা তোমাদের করার প্রয়োজন নেই। গুরুবাণী অনুকরণশীল হ'য়ে কর্ম্ম করলে সেই কর্ম্মের ফল কৃষ্ণেই অর্পণ করা হয়। এখানে মনে হ'তে পারে, তবে যারা গুরু করেনি তাদের উপায় কি?

শ্রীমাধব বলেন, কেউ কেউ লোক জানিয়ে গুরু করে আবার কেউ করে অসাক্ষাতে অর্থাৎ সাক্ষাতে গুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ ক'রে গুরুকরণ হয়, আবার মহাপুরুষের হিতোপদেশকেও কেউ কেউ গুরুবাণী ব'লে গ্রহণ ক'রে থাকে। মহাপুরুষদের হিতোপদেশ গ্রহণ ক'রে তদ্রূপ কর্ম্ম করলে সেই কর্ম্মের ফলও কৃষ্ণেই অর্পণ করা হয়। কিন্তু আমরা কি করি? আমাদের স্বার্থে যদি ব্যাঘাত ঘটে, তবে গুরুবাণী গভীর কূপের জলে তলিয়ে যায় অর্থাৎ গুরুবাণী লঙ্ঘন করাই তখন একমাত্র ধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়ায়। পাতকূঁয়োয় গাছ পাতা পচে যে দুর্গন্ধ হয় সেই দুর্গন্ধপূর্ণ পচা জলেই তখন গুরুবাণীকে ডুবে থাকতে হয়। তবে গুরুবাণীর তো মৃত্যু নেই তাই যখন কিছুতেই অভিষ্ট সিদ্ধ হয় না তখন আবার সেই গুরুবাণীকেই কূপ থেকে তুলে নিয়ে আগ্রহে আমরা জপ ক'রে থাকি।

শ্রীমাধব বলেন, এবারে শোন, কর্ম্ম করলে সেই কর্ম্মের ফলদান করে কে? এখানে ঈশ্বর কথাটি ভুলে যেতে হবে। একথা বলার উদ্দেশ্য কি? ঈশ্বরকে যে আমরা ভুলে আছি এটা তো শাশ্বত সত্য

কণে। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে আমরা ক'জন জানি? তাঁকে আমরা যেটুকু জানি সে হ'ল বই পড়ে জানা বা কানে শুনে জানা। শতকরা নিরানব্বুই জনেরই তো এই অবস্থা, তাই শতকরা একজন যদি তাঁকে জেনে থাকে, তাকেও তো না জানার অভিনয়ই করতে হয়।

বই পড়ে বা কানে শুনে যে ঈশ্বরকে জেনেছ সেটা ভুলে যেতে হবে। স্মরণ করতে হবে—ঈশ্বর কর্ম্মরূপে, ধর্ম্মরূপে অর্থাৎ সর্ব্বরূপে তোমায় ঘিরে আছেন, তিনি ছাড়া এ জগতে তিলার্দ্ধ স্থানও নেই।

যতক্ষণ ঈশ্বর তোমার কাছে 'পড়া এবং শোনা ঈশ্বররূপে' আছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ, সাধনভজন, শাস্ত্রাদি সব কিছুরই প্রয়োজন আছে। কিন্তু যেদিন তোমার এই জ্ঞান হবে যে ঈশ্বর সর্ব্বাবস্থায়ই তোমায় ঘিরে আছেন, তিনি ছাড়া তোমার কোন অস্তিত্ব নেই, সেদিনই 'বই-এ পড়া ঈশ্বর এবং কানে শোনা ঈশ্বর', পালিয়ে যাবেন। শোনা ঈশ্বরের বোধ যতদিন থাকে ততদিনই তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ তাঁর প্রকাশ মানবমানবীর গোচরে আসে না। তুমি—আমি বোধ যতদিন থাকে, ততদিন তিনি অব্যক্ত।

শ্রীমাধব বলেন, 'শোনা ঈশ্বর ও উপলব্ধির ঈশ্বরে' তফাৎ কি? 'শোনা ঈশ্বর' হ'ল সোনার ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরের অলঙ্কার। সর্ব্বধাতুর শ্রেষ্ঠ ধাতু যেমন সোনা, ঈশ্বরও তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ, একথাই আমরা শুনে থাকি। অলঙ্কার হ'ল প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাই চলমান জগতে অলঙ্কারকে আমাদের ভুলে যেতে হবে এবং সহজ সরল জীবনযাপনের পথ খুঁজে পেতে হবে, সেটিই হ'ল আত্মোপলব্ধি। এই সহজ সরল পথটিই হ'ল ক্রমের পথ,—এপথে জীবনযাত্রা পরিচালিত করতে পারলেই গরল কেটে গিয়ে আমরা পবিত্র হ'য়ে উঠব। পবিত্রতা এবং নির্ম্মলতাই ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হবার পরশপাথর।

'ত্রিভুবনে আমার কোন কর্ত্তব্য নেই'

গত মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করেন—গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'ত্রিভুবনে আমার কোন কর্ত্তব্য নেই'। তবে কি তিনি সব কর্ত্তব্যই মানবমানবীর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন? এই কর্ত্তব্যবোধটি মায়িক নয় কি?

প্রশ্ন আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমাধব বলেন, কর্ত্তব্য কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই একাধিক কথাটিও এসে পড়ে। একাধিক বলতে একপক্ষে বোঝায় যে, মানুষ যখন আত্মীয় পরিজন নিয়ে সংসার করে তখনই উঠে কর্ত্তব্যের প্রশ্ন। শুধু সংসার কেন, একাধিক লোক মিলিত হ'লেই কর্ত্তব্যের কথা আসে। কিন্তু ভগবান বা ঈশ্বর হ'লেন একক, এককের ক্ষেত্রে কোন কর্ত্তব্য নেই, এই পট-ভূমিকাতেই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'ত্রিভুবনে আমার কোন কর্ত্তব্য নেই'।

কর্ত্তব্যবোধটি মায়িক কিনা একথার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, আমি যখনই কোন কথা বলি, তা মায়িক জগতের মাধ্যমেই বলি। জগৎ দুটি,—একটি মায়ার জগৎ, অপরটি ঈশ্বরের জগৎ। ঈশ্বরের জগৎ সম্বন্ধে যার অন্তরানুভূতি আছে সে-ই সম্যক্‌জ্ঞান বা সত্যজ্ঞানের অধিকারী, আর সে জ্ঞান যার নেই, তাকে মায়ার জগৎ নিয়েই চলতে হয়। এই মায়িক জগৎটিই হ'ল ঈশ্বরের প্রকাশ্য জগৎ এবং এই জগতেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রশ্ন।

মানবমানবী কর্ত্তব্য করবে কেন?

শ্রীমাধব বলেন, এটি হ'ল ঈশ্বর-জগতে যাবার প্রস্তুতিস্বরূপ বা ঈশ্বর-জগৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি বা জ্ঞান হরণের কারণে। কর্ত্তব্য কথাটি ততক্ষণই প্রযোজ্য যতক্ষণ মানবমানবী এই মায়ার জগতে

বিচরণ করে। আমরা যে মায়াময় জগতে বাস করছি সেখানে আমাদের করণীয় কর্ম্ম কি সেটিই ভেবে দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কর্ম্ম সম্পাদন করতে হবে। পরমেশ্বর, যিনি সর্ব্বকারণের কারণ, সেই কারণকে জানার জন্য, অন্তরানুভূতিতে তাঁকে উপলব্ধি করার জন্যই যত কর্ত্তব্যকর্ম্ম, ন্যায়কর্ম্ম ও সুকর্ম্ম আমরা ক'রে থাকি যে কর্ত্তব্যপরায়ণ নয় তার পক্ষে সম্যক্‌জ্ঞান লাভ করা বা অন্তরানুভূতিতে ঈশ্বর-উপলব্ধিও সম্ভব নয়।

শ্রীমাধব বলেন, এখন প্রশ্ন উঠে, তবে মায়া কি? মায়ার জগৎকে কেন আমরা সকলে মিলে এত ঘৃণার চোখে দেখি? স্বয়ং মহাপ্রভুও মায়াবাদী সন্ন্যাসীকে ভৎর্সনা ক'রেছেন, কিন্তু কেন? তিনি ভৎর্সনা ক'রেছেন কাকে? মায়াবাদী সন্ন্যাসীকে, না মায়াকে, না মায়াবাদকে?

শ্রীমাধব ব্যাখ্যা করেন যে এর কোনটিকেই মহাপ্রভু ভৎর্সনা করেন নি। মায়ার করণকর্ম্মকে অর্থাৎ মায়াবাদের সাধনাকে তিনি অতি তুচ্ছ এবং ঘৃণিত ব'লে মনে ক'রেছেন। সেটি কি রকম? অসার বস্তুকে মমত্বজ্ঞানে মমতা প্রদর্শন করাকে মহাপ্রভু অতি তুচ্ছ ব'লে মনে করতেন। উপমাস্বরূপ শ্রীমাধব বলেন, যেমন ফলদান করবে বলে একটি ভাল গাছ পুঁতে তাকে সেবা যত্ন ক'রেছি, মমতা দেখিয়েছি কিন্তু নিজের অসাবধানবশতঃ সেই গাছ যদি একটি ছাগল এসে খেয়ে যায়, তার জন্য দুঃখ করা, কান্নাকাটি করা এইটিই মায়াবাদ। মায়ার এই করণকর্ম্মকেই মহাপ্রভু নিন্দা ক'রেছেন।

সন্তান সন্ততির প্রতি পিতামাতার স্নেহ, ভালবাসা ও মমত্ববোধ থাকাই তো স্বাভাবিক। এই মমত্ববোধ কি অন্যায়? না, তা নয়। তবে অন্ধমমত্ববোধে সন্তানের অন্যায় এবং অসার কর্ম্মকেও যখন আমরা স্বীকৃতি দিয়ে থাকি, সেটি অন্যায়। কোন কোন সাধক সর্ব্বপ্রকার মমতা প্রদর্শনকেই অন্যায় ব'লে মনে করেন তাঁদের মতে

'কা তব কান্তা—কস্তে পুত্রঃ।' তাঁরা বলেন, স্ত্রী, পুত্র এদের জন্য তোমার মমতা থাকবে কেন? মমতা থাকবে একমাত্র ঈশ্বরের জন্য।

শ্রীমাধব বলেন, আমরা একবারও চিন্তা ক'রে দেখিনা যে, যাদের নিয়ে আমরা জগতে বসবাস করছি, তাদের জন্য মমতা না থাকলে কি সংসারে বাস করা যায়? মমতার ডোরে বাঁধা আছেন ব'লেই মা তাঁর সন্তানকে মানুষ ক'রে তুলতে পারেন, পিতামাতার প্রতি মমত্ববোধ আছে ব'লেই তাঁদের সেবা যত্ন ক'রে সন্তান তার কর্ত্তব্য ক'রে থাকে। মমত্ববোধ না থাকলে, পরস্পরের প্রতি স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা না থাকলে, জগতে বেঁচে থাকা যে আমাদের পক্ষে অসহনীয় হ'য়ে উঠত। মায়াকে ভৎসনা করতে, নিন্দা করতে সত্যিই আমাদের খুব ভাললাগে, কিন্তু এই মায়া, মমতা দ্বারাই যে সংসার আমাদের একে একে এক অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। বিচারের দ্বারা মায়ার অসার বস্তুকে, মায়াবাদের সাধনাকে ও করণকর্ম্মকে ত্যাগ করতে হবে। মহাপুরুষ ও মনীষীদের এই সমস্ত বাণী না বুঝে আমরা ভুল ব্যাখ্যা করি।

শ্রীমাধব বলেন, চিন্তা ক'রে দেখ, সামান্য লতা একটি বৃক্ষকে ভর ক'রে বেঁচে থাকে। সেখানেও আছে এই মমত্ববুদ্ধি। মায়াকে আমি বড় ক'রে তুলছি না; তবে মায়া না থাকলে সৃষ্টি যে রসাতলে যাবে। আমাদের বেঁচে থাকার প্রধান উপকরণই হ'ল মমত্ববুদ্ধি। তবে যে কারণে বেঁচে থাকব, সেই কারণ উপলব্ধি ক'রে তদ্রূপ কর্ম্ম করা চাই। বেঁচে থেকে ঈশ্বরের কর্ম্ম করতে হবে।

ঈশ্বরের কর্ম্ম কি রকম? যাঁর রূপ নেই, যিনি রংবিহীন তাঁর আবার কর্ম্ম কি?

শ্রীমাধব বলেন, ক্রমের পথে থেকে কর্ত্তব্যকর্ম্ম করাই তাঁর কর্ম্ম বা ঈশ্বরের কর্ম্ম। তাছাড়া রিপুর সেবার্থে বা আত্মচরিতার্থে যে সকল কর্ম্ম আমরা ক'রে থাকি, সে সবই হ'ল ব্যতিক্রমের কর্ম্ম।

'মমত্ববুদ্ধি পরিণামশীল। জগতে আমাদের বেঁচে থাকাটাও পরিণামশীল, কেননা চিরকাল তো আমরা মৃত্যুকে আড়াল ক'রে রাখতে পারব না।

এই মমত্ববুদ্ধির জগতে আমরা বেঁচে আছি ঈশ্বরের কর্ম্ম করার জন্য। আমরা যে তাঁর অভিন্নসত্তা এ বোধ জাগ্রত থাকা চাই। তবে এটি অনেক উপরের স্তরের কথা। সাধারণ মানবমানবীর উচিত ক্রমের পথে থেকে কর্ম্ম করা, তাহ'লে আর তার ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াতে হয় না, তিনি নিজেই খোঁজ ক'রে তাকে কোলে তুলে নেন। মানবমানবী ব্যতিক্রমের কর্ম্ম করে ব'লেই সারাজীবনে ঈশ্বরকে আর খুঁজে পায় না।

শ্রীমাধব বলেন, আমি যে কথা বলছি সেটি হ'ল সংস্কার বহির্ভূত কথা। জগতে যতদিন আমরা বেঁচে আছি ততদিন সবার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য ক'রে যেতে হবে, এটি কিন্তু সংস্কার নয়। যে সমস্ত কুসংস্কার আমাদের মনে স্থায়ী বাসা বেঁধে বসেছে তাদের দূরীভূত করার কারণেই বেদাচার, শাস্ত্রাচার এবং দেশাচার ইত্যাদির প্রচলন। অপরাধ স্খলনের জন্যই এসব আচার অাচরণের মান আমরা দিয়ে থাকি। শ্রীমাধব বলেন, কুসংস্কার দূরীভূত হ'লেই যে তোমার ঈশ্বর লাভ হবে এমন কোন কথা নেই; এ দ্বারা তুমি তাঁর কৃপা পাবার যোগ্যতা লাভ করতে পার মাত্র। উপমাস্বরূপ শ্রীমাধব বলেন, এম. এ পাশ করলে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী চাকুরী পাবার যোগ্যতা হয়তো হয় কিন্তু তাই ব'লে সব এম. এ পাশ লোকই কি চাকুরী পায়? পায় না। এক্ষেত্রেও তেমনি, কুসংস্কার অর্থাৎ রিপুর সংস্কারে যারা ডুবে আছে, তারা সেই কুসংস্কার মুক্ত হ'লেই যে ঈশ্বরকে জানতে, বুঝতে বা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, এমন কোন কথা নেই। বেদাচার, শাস্ত্রাচার দেশাচার বা সামাজিক আচারের সৃষ্টিই হ'য়েছে এই কুসংস্কারকে দূর করবার জন্য।

এসময় সভায় বেদের অপৌরুষেয় বাণীর কথা উঠেছিল এবং ঋষিবাক্য উচ্চারিত হ'য়েছিল—

"আবিরাবীর্ম এধি।

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং

তেন মাং পাহি নিত্যম্॥"

অর্থাৎ 'হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহা'র দ্বারা আমাকে সর্ব্বদাই রক্ষা করো।'

শ্রীমাধব বলেন, বেদের অপৌরুষেয় বাণী বা ঋষিবাক্য এ সবই সাধারণ মানবমানবীর কুসংস্কার দূরীকরণের কারণে, ঈশ্বর-লাভের জন্য নয়। তা'ছাড়া মুনিঋষিগণের এ উপলব্ধি ছিল যে তাঁরা ঈশ্বরের অভিন্নসত্তা। সাধারণ মানবমানবীকে সে পর্যায়ে পৌঁছুতে হ'লে অন্তত ঈশ্বর লাভের স্বপ্ন ভটি তো দেখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর তো লাভের বস্তু নন তাই তাঁকে লাভের জন্য কোন আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। তবে কাদের জন্য এই আচারের প্রয়োজন?

রিপুর সেবার্থে বা অপরিতার্থে ক্রমব পথ পরিষ্কার ক'রে যারা ব্যভিচারের পথে চ'লে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব ব ভিচারী হ'য়ে উঠেছে, তাদের সেই কুসংস্কার ও ব্যভিচার মুক্ত কবা'র জন্যই আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন।

শ্রীমাধব বলেন, দেহগীতা ব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে আমি মনকে অন্ধ ব'লেছি। ভেবে দেখ, কোন অবস্থায় মন অন্ধ? মনকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। এর মধ্যে মনের যখন মূঢ় অবস্থা, তখনই সে অন্ধ। মমত্ববুদ্ধির একটি রূপ হ'ল মূঢ়তা। অসার যে মমত্ববুদ্ধি তার কবলে পড়লে মনের মূঢ়তাই প্রকাশ পায়। এই মমত্ববুদ্ধিতে নিজের ছেলে অন্যায় করলেও সে অন্যায় চোখে পড়ে না, আমরা অন্ধ হ'য়ে থাকি, অথচ পরের ছেলে একই অন্যায় ক'রে চক্ষুশূল হয়, ক্ষমার অযোগ্য হ'য়ে

উঠে, লঘু পাপে গুরুদণ্ড ভোগ করে। তাই বলি, এই মূঢ় অবস্থায়ই মন অন্ধ। অসার মমত্ববুদ্ধিতে সে মূঢ়তাপ্রাপ্ত হয়।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন। সন্তানদের প্রতি তাঁর মমত্ববুদ্ধি এ পর্য্যায়ে উঠেছিল যে সেখানে তাঁর ন্যায় অন্যায়ের বিচার ছিল না। তাদের অন্যায় দেখেও মমত্ববুদ্ধির প্রাবল্যে মূঢ়ের ন্যায়, ক্লীবের ন্যায় তিনি তাদের নীরব সমর্থন জানিয়েছেন, জোর প্রতিবাদের বাক্য কেউ তাঁর মুখে উচ্চারিত হ'তে শোনেনি।

মমত্ববুদ্ধি দুই প্রকার। (১) একটি হ'ল মূঢ় মমত্ববুদ্ধি, যার থেকে সৃষ্টি হয় বিপর্য্যয়, দুর্য্যোগ এবং অন্ধকার। (২) আর একটি কর্ত্তব্যকর্ম্মে মমত্ববুদ্ধি, তারই থেকে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সৃষ্টি। এই নির্ম্মল মমত্ববুদ্ধি দিয়েই সন্তানকে মানুষ ক'রে তোলা যায়।

শ্রীমাধব বলেন, তাহ'লে এটি পরিষ্কার হ'ল যে, কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই শাস্ত্রাচার, বেদাচার, দেশাচার ইত্যাদি প্রচলিত। কুসংস্কার থেকে মুক্ত হ'তে পারলেই তোমরা ঈশ্বরের করুণার পাত্র হ'তে পারবে। ঈশ্বরের করুণাটি কি রকম? তাঁর করুণার পাত্রপাত্রীই ক্রমের পথে চলার যোগ্যতা লাভ করে।

করুণা বা কৃপা অর্থে আমরা কোন কিছু প্রাপ্তির আশা করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি তা নয়। কুসংস্কার মুক্ত হ'তে পারলেই ক্রমের পথটি আমরা লাভ করতে পারব। ক্রমের পথই ঈশ্বরের পথ, সেই পথের সন্ধান পাওয়া অর্থই তাঁর করুণালাভ।

ক্রমের পথকে তাঁর পথ বলার অর্থ কি?

শ্রীমাধব বলেন, তুমি যে ঈশ্বরেরই অভিন্ন সত্তা, তাই ক্রমের পথে চলার অর্থ হ'ল, তাঁরই পথে চলা। আমাদের অনাদিকালের বহির্মুখতা থেকে মুক্ত হবার জন্য ও ময়লা বা কুসংস্কার কর্ত্তন করার জন্যই শাস্ত্ররূপ অস্ত্রের প্রয়োজন। শাস্ত্রজ্ঞানে, শাস্ত্রাচারে, বেদাচারে,

তাঁকে পাব, এটিও একটি কুসংস্কার, কেননা ঈশ্বর তো শাস্ত্র বা আচারে বাঁধা পড়ে নেই, তিনি এ সবের অনেক ঊর্দ্ধে, তিনি যে বেদাতীত—শাস্ত্রাতীত।

এর পর আলোচনা সভায় শ্রীমাধব প্রশ্ন তোলেন,—ঈশ্বর নিরাকার না শরিক অর্থাৎ তাঁর কোন ভাগীদার আছে কি? না, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তিনি একক, তাই কর্ত্তব্য ব'লেও তাঁর কিছু থাকতে পারে না। চিন্তা করলে দেখা যায়, তিনিই আবার সবার মধ্যে থেকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন।

শ্রীমাধব বলেন, যারা কুসংস্কার মুক্ত হয়, বহির্জগতে বা সংসার জগতে তাদেরও সংস্কারজাত কর্ম্ম ক'রে যেতে হয়।

এ সময় আলোচনা সভায় প্রশ্ন উঠেছিল—একবার সংস্কার মুক্ত হ'লে পুনরায় সংস্কারজাত কর্ম্ম করার তাৎপর্য্য কি? এ কথার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, সংস্কারজাত কর্ম্ম করার তাৎপর্য্য হ'ল, যাতে তোমার উত্তরপুরুষ হাল ছাড়া হ'য়ে না যায়, দিশেহারা হ'য়ে না পড়ে।

প্রত্যক্ষ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীমাধব বলেন, শ্রাদ্ধক্রিয়াদি আমি তো বিশ্বাস করি না, তবু সেদিন আমার ভাই মারা যেতে একমাস দাড়িচুল নিয়ে বসে ছিলাম। যেদিন সারাবিশ্বে এক নিয়ম হবে সেদিন এসবের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে। ভেবে দেখ, বাপ বেঁচে থাকতে তাঁকে কোন সম্মান দাওনি, কোন ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাওনি আর মরে যেতে একমুখ চুলদাড়ি রেখে বসে আছ। তাতে কি শ্রদ্ধা দেখান হ'ল? তাই তো কথায় আছে,—'জ্যান্তে দিলেনা ভাত কাপড় মরলে করবে দানসাগর'।

তবু বলি, যতদিন পর্য্যন্ত এক নিয়ম বা এক আইন না হয়, ততদিন উত্তরপুরুষের কারণে এ সবই ক'রে যেতে হবে। বর্ত্তমানে কালের গতি এমন ভাবে এগিয়ে চলেছে যে, একদিন দেখবে সবই লোপ পেয়ে গেছে।

শ্রীমাধব বলেন, বিবাহের ক্ষেত্রে যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের রীতিনীতি প্রচলিত আছে তারই বা কি প্রয়োজন? বিবাহ প্রথা হ'ল একটি স্বীকৃতি। গভর্ণমেন্টের কাছে বা সমাজের কাছে স্বীকৃতি পেলেই তো হয়, তাই নয় কি? তাও তো আমরা আচার অনুষ্ঠান ক'রে থাকি। কালক্রমে এই আচার, অনুষ্ঠানও লোপ পেয়ে যাবে।

শ্রীমাধব বলেন, বাতি জ্বালাতে হবে আসল ঘরে অর্থাৎ তোমার মধ্যে যদি সম্যকৃজ্ঞানের উদয় হয়, তবে সেই সম্যকৃজ্ঞানের দিব্য-দৃষ্টিতে কোন কিছুই আর তোমার অজানা থাকবে না। ঈশ্বর লাভের আশায় আমরা অনেকেই তো নিখুঁতভাবে বেদাচার, শাস্ত্রাচার ও দেশাচার পালন ক'রে চলেছি, কিন্তু এ সব কিছুর মূলে আছে ঈশ্বর লাভ নয়, কুসংস্কার থেকে মুক্তি।

আলোচনা সভায় এ সময় একটি পৌরাণিক কাহিনীর কথা উঠেছিল তাতে শ্রীমাধব বলেন, বিজ্ঞানের যুগে এ সকল পৌরাণিক কাহিনী অচল। তিনি বলেন, এই মায়িক জগতে মায়ার গর্ভে বসে থেকেও মায়াতীত হবার সন্ধান যাঁরা দিতে পারেন তেমন মহাযোগী-পুরুষের কথাই আজ শোনবার দিন এসেছে।

স্বতঃস্ফূর্ত্ত দানের মূল্যবোধ

গত মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। শ্রোতাদের তরফ থেকে আবেদন আসে যে, স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে শ্রীমাধবের মুখনিঃসৃত বাণী তাদের সংসার তাপিত হৃদয়কে স্নিগ্ধ শীতল বারি সিঞ্চন ক'রে আনন্দের ঝর্ণাধারায় প্লাবিত ক'রে তুলুক। শ্রীমাধব বলেন, জাগতিক ক্ষেত্রে চেয়ে যেটা পাও, সেটাই তোমাদের

কাছে আনন্দের বিষয় হয়, আর না চেয়ে যেটা পাও সেটা তেমন আনন্দের হয় না এবং সে কারণেই তার মূল্যও তোমরা দিতে জান না। যেমন, সম্যক্‌বুদ্ধির স্বতঃস্ফূর্ত্ত দান তো তোমরা সর্ব্বসময়ই পেয়ে থাক; তবু কি তার উপযুক্ত মূল্য দিতে পার? পার না। তোমাদের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে যে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের আস্বাদন তোমরা অনুক্ষণ করছ তার মূল্য তোমাদের কাছে কতটুকু? তেমনি আবার পঞ্চভূত সকলের অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইত্যাদির স্বতঃস্ফূর্ত্তদানের কতটুকু মূল্য আমরা দিয়ে থাকি? প্রকৃতির এই অযাচিত দান পেয়ে পেয়ে আমরা জন্ম থেকে এমন অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছি যে, তার বিশেষ কোন মূল্যই আর আমাদের কাছে নেই।

শ্রীমাধব বলেন, বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত প্রকার উপাদান ব্রহ্ম হইতে ধারণ করে মহৎতত্ত্ব—ব্রহ্ম হতে মহৎতত্ত্ব পর্য্যন্ত এই অবস্থার নাম হ'ল কারণ অবস্থা বা কারণজগৎ। মহৎতত্ত্বের মধ্যে বিশ্ব-সৃষ্টির উপাদানগুলি সূক্ষ্মজগৎরূপে বিস্তার হবার উপযোগী হইয়া উঠিলে মহৎতত্ত্ব উপাদানগুলি প্রকাশ করায় গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রাদির সৃষ্টি হয়। ইহার মধ্যে পৃথিবীও একটি গ্রহ। মহৎতত্ত্ব হইতে পৃথিবী গ্রহ পর্য্যন্ত যে অবস্থা ইহার নাম হল সূক্ষ্মজগত। এই সূক্ষ্ম জগতের সর্ব্বপ্রকার অবদান পৃথিবী ধারণ করে। পৃথিবী ধারণ করিয়া যাহা কিছু প্রসব করে তাহাই এই দৃশ্যমান স্থূল অবস্থা বা জড়জগৎ।

শ্রীমাধব বলেন, সারাবিশ্বে যত মানবমানবী, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা সকলেরই জন্ম মৃত্যু এই পৃথিবীর কোলে। এই পৃথিবীকে আশ্রয় ক'রেই সবাই বেঁচে আছে। ঈশ্বরই একমাত্র পুরুষ, তিনি ছাড়া আর যা কিছু চোখে পড়ে সবাই প্রকৃতি। পৃথিবী যেমন প্রকৃতি

তেমনি জগতের নারীপুরুষ সকলেই প্রকৃতি পদবাচ্য—সৃষ্টির কারণেই নারী ও পুরুষ জাতি।

শ্রীমাধব বলেন, সম্যক্‌বুদ্ধি ও পঞ্চভূতের স্বতঃস্ফূর্ত্ত দান, মাতৃস্বরূপা পৃথিবীর অপার করুণা, চাইবার কোন অপেক্ষা রাখে না, না চাইতে পাই বলেই তার কোন কদর নেই। অথচ চরিতার্থতার কারণে যখন তোমরা কোন বিষয় ভোগ কর, তখন তাতে যথেষ্ট আনন্দ পাও, তবে এ সবই পরিণামশীল। বর্ত্তমানে সে সুখ স্পর্শ করে বটে, তবে এ সুখ ক্ষণস্থায়ী, প্রকৃতপক্ষে সে ডেকে আনে দুঃখ। জাগতিক বুদ্ধি নিয়ে যতদিন আমরা মনোরাজ্যে বাস করছি ততদিন লাভের হিসাব কষাই হয় আমাদের একমাত্র ধ্যান ধারণা, কেননা সেখানকার মূল কথাই হ'ল কি ক'রে লাভের অঙ্ক বাড়ান যায়, কিন্তু সে লাভ যে ক্রমাগত আমাদের ক্ষতির মুখেই ঠেলে দিচ্ছে সে চিন্তা কি আমাদের আসে? মনোরাজ্যের অধীনে থেকে যা কিছু কর্ম্ম আমরা করি তার পেছনে আছে ফলের আশা, তা নাহ'লে যে কর্ম্মের প্রেরণা জাগে না। তবে যথার্থ কর্ম্ম কি, সে জ্ঞান যখন হয় তখন আর বিনিময়ের প্রশ্ন উঠে না। কর্ম্ম তো তোমাদের সকলকেই করতে হবে। কর্ম্ম ক'রেই তো তুমি তোমার বস্তু ঘরে তুলে আনবে। তোমার বস্তু বলতে, তোমার অপহৃত বস্তু এবং ভুল ক'রে ফেলে আসা বস্তুই কর্ম্মের দ্বারা উদ্ধার ক'রে ঘরে তুলতে হবে।

শ্রীমাধব বলেন, এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আমরা যে অফিস, কাছারী করি বা ব্যবসা করি তার কি হবে? উত্তরে তিনি বলেন, সবই করবে, তবে তোমার অপহৃত বস্তু বা ফেলে আসা বস্তু ফিরিয়ে আনতে যা তোমার কর্ত্তব্য তাই করতে হবে। একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, নিজ বস্তু উদ্ধারের কারণে, পরের বস্তু ভোগে আনার যে কর্ম্ম সে কর্ম্মের ফল কিন্তু পরিণামশীল। আর আপন উপার্জ্জনের অর্থ দিয়ে নিজ বস্তু ঘরে আনাটি পরিণামশীল নয়।

জগতে বেঁচে থাকার জন্যই এ প্রয়োজন মেটাতে শর্ম, এটি ভোগ নয়। ইন্দ্রিয় চরিতার্থের কারণে যদি মানুষ কোন কর্ম্মে লিপ্ত হয় তবেই তাকে বলা হয় ভোগ। ভোগের পরেও যে চাহিদার নিবৃত্তি নেই, সেই চাহিদাকেই উপভোগ বলা চলে।

দেহবৃদ্ধি ও সংরক্ষণের কারণে স্নেহজাতীয় পদার্থ অর্থাৎ দুধ, মাখন ইত্যাদি গ্রহণ করাকে ভোগ বলা চলে না। অন্ন বা রুটি খেলে ভোগের প্রশ্ন উঠে না, এটি শরীর রক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজন। দেশ-কাল-পাত্রানুসারে বিভিন্ন দেশে যে বিভিন্ন আহার্য্য বস্তু প্রচলিত তাকেই বলা হয় অন্ন।

জীবন ধারণের জন্য অন্ন সংগ্রহ করা প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। সেই অন্নকে রক্ষা করার জন্য একটি পাত্রেরও প্রয়োজন তাই অন্ন এবং পাত্র কোনটিই ব্যতিক্রম নয়। তাই ব'লে ঘরে টেলিভিশন রাখাটি কিন্তু প্রয়োজনের পর্য্যায়ে পড়ে না, এটি প্রয়োজনের অতিরিক্ত, এটি বাহুল্য এবং বিলাসিতা। তোমার নিজের ওজন তোমার চাইতে কি কেউ বেশী জানে! তার উর্দ্ধে গেলেই পরিণামে পড়তে হয়। তুমি ভাল ক'রেই জান যে, ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানের প্রয়োজনে কিছুটা সঞ্চয়ও তোমার থাকা চাই। তিন পয়সা আয়ের এক পয়সা লাগে জীবনধারণে, এক পয়সা যায় জীবনরক্ষণে এবং এক পয়সা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে হবে। একেই বলে মিতব্যয়ী। এই তিনটি পয়সা থেকে অমিতব্যয়ীর মত প্রয়োজনের বাইরে যদি অন্যদিকে খরচ কর, তবে সেটি হবে ব্যতিক্রম এবং সেই ব্যতিক্রমের ফল তো তোমাকে ভুগতেই হবে।

তিন পয়সা অর্থে তিনটি ভাগ। ঐ তিনটি ভাগ ঠিকমত রক্ষা ক'রেও যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, সেটি হবে চতুর্থ ভাগ। সেই চতুর্থ ভাগ দিয়ে মোটর গাড়ী কিনলে বা পূর্ব্বোক্ত তিনটি ভাগকে আরও সুরক্ষিত করতে পারলে সেটি ভোগের পর্য্যায়ে পড়ে না। সূক্ষ্মবিচারে

দেখা যায়, দূরত্বকে কমিয়ে আনার জন্য অর্থাৎ অল্পসময়ে বেশী কাজ করার জন্য, গাড়ী-বাড়ীরও প্রয়োজন আছে। কাজেই গাড়ী, বাড়ী করাটা ঘৃণার বস্তু নয়। তবে যার 'ডানে আনলে বায়ে কুলোয় না', তার তো গাড়ী-বাড়ীর প্রয়োজন নেই অর্থাৎ যখন তুমি যে পর্য্যায়ে অবস্থান কর, তখন তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলাই বিধেয়। আবার রাজা হ'লে তার চালচলনও হবে অন্যরকম, তখন সিংহাসনে বসার উপযুক্ত হতে হবে, দাসদাসী রাখতে হবে, কেননা রাজার ঠাট বজায় রেখে চলতে না পারলে সিংহাসনও যে বেশীদিন টেকে না।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীমাধব মানুষের দেহকে একটি তিনতলা দালানের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি বলেন, দালানের একতলায় ইন্দ্রিয়গণের বাস, দোতলায় বাস করে মন এবং তিনতলার অধিবাসী হ'ল সম্যক্‌বুদ্ধি। এই সম্যক্‌বুদ্ধির অবদান স্বতঃস্ফূর্ত্ত, যার মর্যাদা আমরা দিতে জানি না। মনের আবাসে আমরা হাজির হই স্বার্থবুদ্ধি বা লাভজনক বৃত্তি নিয়ে, আর নীচের তলায় যেখানে ইন্দ্রিয়গণের বাস সেখানে আমরা তাদের দাসানুদাস হ'য়ে কর্ম্ম করছি। তিনতলা এই দালানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিবেক নামধারী একটি দরোয়ান নিযুক্ত আছে। মানুষের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে সে সর্ব্বদাই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে কিন্তু তার কথায় প্রায়ই কেউ কর্ণপাত করে না উপরন্তু তাকে গালিগালাজ করে। তিনতলার অধিবাসী যিনি অর্থাৎ সম্যক্‌-বুদ্ধি, স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে তিনি তাঁর যে বৃত্তিসকল সবাইকে দান করছেন তা গ্রহণ করবার মত প্রস্তুতি আমাদের মনের নেই। এই তিনতলা বাড়ীর প্রকৃত মালিক যিনি অর্থাৎ কূটস্থচৈতন্য তিনি হ'লেন সম্যক্‌-বুদ্ধির যে চৈতন্যশক্তি বা তেজ, তাঁর সখা। তেজেরই সারথী চৈতন্য। তিনি যখন তেজের সারথী বা পরিচালক হন তখন মনোরাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে নিজবস্তু নিজে উদ্ধার করতে পারেন।

তিনতলার ভিত হ'ল দোতলা, (আবার দোতলার ভিত একতলা

এবং মাটির নীচে আছে একতলার ভিত। রজোগুণ তমোগুণের সহায়তায় সত্ত্বগুণের ভিতে এই বাড়ী তৈরী ক'রেছেন।

নাভিদেশ থেকে নীচের দিকে ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের স্থান, নাভি থেকে উপরের দিকে কণ্ঠ পর্য্যন্ত মনোরাজ্য, আর কণ্ঠ থেকে মস্তক পর্য্যন্ত হ'ল সম্যকবুদ্ধির স্থান। নীচতলার রাজা হ'ল দুর্য্যোধন, সে কামরূপী কামনা, তার শক্তি এত প্রবল যে সমস্ত রাজ্য সে-ই শাসন করে। নাভি থেকে কণ্ঠ পর্য্যন্ত মনোরাজ্যের রাজা মন অন্ধ, কেননা পরের সাহায্যে সে সব কিছু দেখে। রাজশক্তির প্রভাবে সে অন্ধ হ'য়ে পড়ে। রাজার নিজের পক্ষে সর্ব্বত্র ঘুরে দেখা তো সম্ভব নয়, তাই পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে তাকে থাকতে হয় এবং সে কারণেই তাকে বলে অন্ধ।

কূটস্থচৈতন্যের পরিচালনায় সম্যকবুদ্ধি বা তেজ যখন জাগ্রত হয় তখনই দেহে শুরু হয় কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ, অর্থাৎ মনোরাজ্যের সঙ্গে আত্মরাজ্যের বোঝাপড়া।

শ্রীমাধব বলেন, কতকাল আগে যে আমরা এই দেহধারণ ক'রেছি তার সঠিক কোন দিনক্ষণের হিসাব মেলা ভার। তবে জীবনের শুরু থেকেই ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের সঙ্গে সম্যকবুদ্ধির এই যুদ্ধ চলছে। একদিন না একদিন রিপুদের পতন অবশ্যম্ভাবী। আমাদের বুদ্ধির যে বৃত্তিসকল, তারা যে কেবল নিজেদের রসদ যোগাচ্ছে তাই নয়, যাদের সঙ্গে এই যুদ্ধ তাদেরও রসদ জুগিয়ে যাচ্ছে। সেটি কি রকম? শ্রীমাধব বলেন, তুমি যখন তোমার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া কর তখন যেমন তুমি নিজ উপার্জ্জিত অর্থব্যয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ কর তেমনি তোমার স্ত্রীও তো তোমারই উপার্জ্জিত অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করছে, আবার তোমার সঙ্গেই যুদ্ধ করছে, এও সেইরকম। এখানেও উভয় পক্ষের রসদ তো তুমিই যোগাচ্ছ।

জাগতিক জগতে ভিত বস্তুতে সত্ত্বগুণ আর আধ্যাত্মিক জগতের

ভিত হ'ল সত্য। একটি গুণযুক্ত, অপরটি গুণমুক্ত। আমাদের দেহটি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনটি গুণের আধার।

শ্রীমাধব বলেন, যে আলোচনা তোমাদের চলার পথে মনোবৃত্তিকে সমর্থন করে বা সহায়ক হয় সেই আলোচনাই তোমাদের কাছে ভাললাগে, উপভোগ্য হ'য়ে উঠে। এই প্রসঙ্গে তিনি কঠোপনিষদে নচিকেতার স্বশরীরে যমপুরীতে গমনের বিষয় উত্থাপন করেন। যমরাজ নচিকেতাকে নানারূপ বরদানের প্রলোভন দেখান কিন্তু কোন প্রলোভনই নচিকেতাকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি, তাই যমরাজকে নচিকেতা জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম এবং আত্মা সম্বন্ধেই উপদেশ দিতে হ'য়েছে।

শ্রীমাধব বলেন, উপনিষদের মন্ত্র সত্য, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না কিন্তু তখনকার ভাষ্যকারের ভাষ্য সে যুগের উপযোগী হ'লেও বর্তমান প্রগতিশীল যুগের মানুষের পক্ষে হৃদয়গ্রাহী নয়। মন্ত্রটি সত্য কিন্তু ব্যাখ্যাটি এ যুগোপযোগী হওয়া উচিত।

নচিকেতার আখ্যানকে শ্রীমাধব এ যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা ক'রে বলেন, যমের তাড়নাই আমাদের আত্মাকে জানা এবং বোঝার প্রেরণা জাগায়। প্রকৃষ্ট বিচারে দেখা যায় যে, যমের কাছেই আত্মার খবর পাওয়া যায়। এটিই কঠোপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়। এ জগতে আমরা প্রত্যেকেই এক একটি নচিকেতা। যমের তাড়নায় আমরা রুজি রোজগার করি, খাই দাই, জপতপ করি; উদ্দেশ্য হ'ল শরীর সুস্থ ও নীরোগ থাকলে, ভগবানের নাম করলে, যদি যমরাজের হাত এড়ান যায়। হায়, তবু যেতে হয়, যমের হাত থেকে কারুরই যে পরিত্রাণ নেই। কিন্তু যমালয়ে গিয়েও নচিকেতা যমরাজের কাছে জানতে চেয়েছিল ব্রহ্মের সন্ধান, আত্মার খবর। আত্মাকে যে জানতে পারে, ব্রহ্মকে যে উপলব্ধি করতে পারে, মৃত্যু ভয় তার দূর হ'য়ে যায়, জন্মমৃত্যুর ঘূর্ণিবর্তে পড়ে তাকে হাবুডুবু খেতে হয় না।

শ্রীমাধব বলেন, মৃত্যুকে এড়াতে আমরা সবাই চাই। জাগতিক জগতেও এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে এই প্রসঙ্গে তিনি একটি গল্প শোনান গল্পটি এইরূপ—

এক বুড়ীর স্বামী ও সাত ছেলে ছিল। কালক্রমে স্বামী ও সাতছেলে একে একে মারা যায়। বুড়ী একা, বড় দুঃখে দিন কাটে। একদিন ঝড়বাদলের সময় বুড়ী একেবারে ভিজে গেছে, আর বিলাপ করছে, 'যম! একে একে সবাইকে তো তুই ছিনিয়ে নিয়ে গেলি, কত ভাল ভাল লোক নিয়ে গেলি, আর আমাকে কি তোর চোখে পড়ে না? আমাকে নিয়ে যা রে'।

অমনি তো যম এসে হাজির, বলে, 'বুড়ী চলো'। বুড়ী আৎকে উঠে, বলে. 'সে কি রে? আমার ঘর সংসার অগোছাল পড়ে আছে, লাউ গাছটা পুঁতেছি সেটার যত্ন করতে হবে, তাতে ফল এসেছে, এক্ষুণি আমি যাই কি করে'? যম বলে, 'তুমিই তো আমায় কাতর হয়ে ডাকলে'। বুড়ী বলে, 'আরে! তোমায় ডেকেছি কেন তাও বুঝলে না? এই অন্ধকারে জলঝড়ে যে পথ দেখছি না, তাই হাত ধরে একটু এগিয়ে দেবার জন্য ডেকেছিলাম'। যম আর কি করে, বুড়ীকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেয়।

শ্রীমাধব বলেন, এরকম আমরা সবাই বলি, 'আর বাঁচতে চাই না, যেতে পারলেই হয়'। কিন্তু মৃত্যু যখন দ্বারে এসে হাজির হয় তখন কেউই আর মরতে চায় না।

প্রত্যেক মানবমানবই এক একজন নচিকেতা

পূর্ব্ব আলোচনার সূত্র ধরে এই মঙ্গলবারের শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈকা ভক্ত প্রশ্ন করেন, 'এ জগতে আমরা প্রত্যেকেই এক

একজন নচিকেতা, একথার প্রকৃত অর্থ কি? নচিকেতার সঙ্গে প্রতিটি স্তরের মানবমানবীর জীবনের মিল তো খুঁজে পাওয়া যায় না, এই দ্বন্দ্ব নিরসনের কারণে শ্রীমাধব যদি কিছুটা ব্যাখ্যা দেন।

দ্বন্দ্বের নিরসন কল্পে শ্রীমাধব শুরু করেন, এ জগতে আমরা প্রত্যেকেই এক একজন নচিকেতা, এ কথা বলার অর্থ হ'ল, নচিকেতাই হ'ল মানবমানবীর লক্ষ্য বস্তু। সবাই আমরা রিপুর দাস হ'য়ে সংসার পথে কর্ম্ম ক'রে চলেছি, এর থেকে উন্নতি যার হয় সে চলে মনের দাস হ'য়ে। জীবন পথে আমাদের এই দাসবৃত্তি ঘোচেনা, তাই কখন ইন্দ্রিয়ের দাস, আবার কখন বা রিপুর দাস হ'য়ে ঘুরে বেড়াই। ইন্দ্রিয় এবং রিপুর উপরের স্তরে রয়েছে সম্যক্‌-বুদ্ধিবৃত্তি। নচিকেতা হ'ল সেই সম্যক্‌বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ জীবন পথে যে প্রকৃষ্ট নিয়মে চলে। সত্যের সুনিশ্চয় অনুগামী যে বৃত্তি, সেই হ'ল নচিকেতা। তাহ'লে চিন্তা ক'রে দেখ, নচিকেতাকে অর্থাৎ সম্যক্‌বুদ্ধিবৃত্তি যার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় জাগরিত হ'য়েছে, যমরাজের কোন প্রলোভনই কি তাকে প্রলুব্ধ করতে পারে?

এদিকে দেখ, পিতার গৃহে যখন নচিকেতা ছিল তখন আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতই তাকেও পিতার অধীনে থাকতে হ'য়েছে। সংসারের ন্যায় অন্যায় সব কিছুই সে দেখেছে, কিন্তু সম্যক্‌ বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী বলে ইন্দ্রিয় এবং রিপুগণের দাস হ'য়ে তাকে কর্ম্ম করতে হয়নি, উপরন্তু তারাই তার অনুগামী হ'য়ে সর্ব্ব কর্ম্মে তাকে সহায়তা করেছে। তাই শ্রীমাধবের উপদেশ হ'ল যে তোমরাও নচিকেতার ন্যায় সংসারে থেকেই বন্ধন মুক্ত হবার চেষ্টা কর।

যমরাজ নচিকেতাকে কতই না প্রলোভন দেখিয়েছিল,—ধন-দৌলত, জাগতিক সুখসম্পদ, বিলাস ব্যসন এমন কি ইচ্ছানুযায়ী পরমায়ু পর্য্যন্ত; কিন্তু নচিকেতা তাতে ভোলেনি, কেননা সে যে

সম্যক্‌বুদ্ধিবৃত্তি, সে জানে আত্মার সংবাদ পেলেই সমস্ত প্রলোভন থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তাই জাগতিক কোন বস্তুই তাকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি।

যমের তাড়নাতেই আত্মাকে জানার প্রেরণা আমাদের জাগে। জ্ঞানী, গুণী, মানী, ধনী, পণ্ডিত ইত্যাদি জগতে সকল মানব মানবীই যমের ভয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত, তাই যমের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই আমাদের অপরিসীম চেষ্টা এবং সেই কারণেই আমাদের সৎপথে যাবার প্রেরণা, নিজেকে ও আত্মাকে জানার প্রেরণা, সাধু মহাপুরুষের সঙ্গ করার প্রেরণা বা গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় পাবার প্রেরণা জাগে। ঝড় ঝঞ্ঝায় আমাদের প্রাণরূপ জাহাজ ডুবে যাবে এই ভয়েই আমরা গুরুপাদপদ্মরূপ পোতাশ্রয়ে আশ্রয় নিয়ে নিরাপদ হতে চাই! খুব ভাল ক'রে চিন্তা ক'রে দেখ, এখানেও আছে সেই যমরাজেরই তাড়না। এর উদ্দেশ্য হ'ল সম্যক্‌বুদ্ধিবৃত্তিরূপ যে নচিকেতা সব মানবমানবীর অন্তরে ঘুমিয়ে আছে, তাকে জাগ্রত করা, কেননা, আত্মাকে জেনে একমাত্র নচিকেতাই তো যমের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল।

গুরুনানকের প্রথম কথাই হ'ল—'নির্ভৌ' অর্থাৎ একমাত্র 'ওঙ্কার' শব্দ যদি তোমার মধ্যে হুঙ্কারিত হয় এবং সেই শব্দের বিস্তৃতি যতদূর ততদূর পর্যান্ত তুমি 'নির্ভৌ' অর্থাৎ নির্ভয়। সেই 'ওঙ্কার' ধ্বনিই তোমাকে নির্ভয় ক'রে তুলতে পারে এবং তারই উপর তুমি নির্ভরশীল হ'তে পার। জগতের সব কিছু সৃষ্টির মূলে হ'ল 'ওঙ্কার' ধ্বনি, আবার সেই সৃষ্ট বিষয়কে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতেও সেই ওঙ্কারেরই হুঙ্কার।

নচিকেতা একক কেউ নয়। প্রত্যেক মানবমানবীর মধ্যে যে সৌম্য—সাম্য ও সম্যক্‌জ্ঞানের প্রভাব তারই নাম নচিকেতা। নচি অর্থে শুচি, এই জ্ঞানরূপ শুচিতা যার মধ্যে ক্রিয়মান হয় সেই

নচিকেতা নামে প্রকাশিত হয়। এই নচিকেতাকে মায়িক জগতের কোন বিষয় প্রলুব্ধ করতে পারে না। যমের সঙ্গে তার যে সাক্ষাৎ পরিচয়। যম তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সর্ব্বদাই শশব্যস্ত, তাই নচিকেতাকে জাগতিক ধন, ঐশ্বর্য্য, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও পরমায়ু দিয়ে প্রলুব্ধ করতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

প্রকৃত তত্ত্ব হ'ল যে, শুচিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে যম কখনও ঘেঁষে না, তার উপর যমের কোন প্রভাব পড়তেই পারে না, যম যায় অশুচি ব্যক্তির কাছে। প্রশ্ন উঠে, তবে কি নচিকেতা অমর? হ্যাঁ, নচিকেতা অমর, সে জানে এ তো আর মৃত্যু নয়, এ হ'ল ঘর বদল, এঘর থেকে ওঘরে যাওয়া। ভগ্নদেহ অকেজো পুরানো ঘরটিকে সে ঘৃণা করে, তাই সেটি বদলে নূতন ঘরে যায় অর্থৎ নধরকান্তি সুন্দর দেহে গিয়ে বসবাস করে। নচিকেতা বলতে তাকেই বোঝায়, যার শুচিসম্পন্ন বৃত্তি আছে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল আত্মাকে জানা ও নিজেকে জানা।

যমের বাড়ী গিয়ে নচিকেতা তিনদিন অনাহারে ছিল—এ কথার প্রকৃত অর্থ হ'ল, শাশ্বতজ্ঞানের বৃত্তি যখন জাগে তখন সত্ত্ব—রজঃ—তমঃ জাগতিক এই তিনটি গুণের বৃত্তি আপনা থেকেই লোপ পেয়ে যায়। নচিকেতা হ'ল শাশ্বত সমক্জ্ঞানের বুদ্ধিবৃত্তি, তার সঙ্গে সত্ত্ব—রজঃ—তমঃ এই তিনটি গুণের বৃত্তি নেই। তাই যমের ঘরে ঐ তিন গুণের বৃত্তির কোন কিছু সে গ্রহণ করে কি ক'রে? তাই তো তিনদিন সে উপবাসী ছিল।

তাহ'লে দেখা গেল, নচিকেতা শব্দের অর্থ—শুচিসম্ভূত সম্যক্-জ্ঞান। সুপ্ত এই বৃত্তি যখন আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়, তখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে আত্মাকে জানা ও নিজেকে জানা। এ অবস্থায় যমের তোয়াক্কা কি কেউ রাখে?

সম্যক্জ্ঞানের বাতি সবার মধ্যেই জ্বলে, তথাপি মায়ার আবরণে

ও রিপুগণের তৎপরতায় আমরা কেবল ধ্বংসের পথেই নেমে যাই। নচিকেতা যখন যমের বাড়ী যেতে সক্ষম হ'য়েছিল তখনই সে যমের বাড়ী গেছে, কিন্তু শিশুকাল থেকেই কি সে নচিকেতা নয়?

শ্রীমাধব বলেন, ভেবে দেখ, তোমরা যখন কোন কাজে বিফল মনোরথ হও, তখন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন কর—কেন এটা হ'ল না, কারণ কি? প্রশ্নটি করছ কাকে? নিজের অপারগ ক্ষমতাকে, নয় কি? কাজেই সর্ব্বদাই আমাদের উচিত, ক্ষমতার মধ্যে থেকে কর্ম্ম করা। ক্ষমতার বাইরে গেলেই যমের হাতে পড়তে হয় অর্থাৎ নানারকম দুঃখ কষ্টে পড়ে বিব্রত হ'তে হয়।

শ্রীমাধব বলেন, মনে এ প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে জাগতিক দিক থেকে যে যমরাজ আমাদের এত দুঃখকষ্টের কারণ, তাকে আবার ধর্ম্মরাজ বলা হয় কেন?

শ্রীমাধব বলেন, এর কারণ হ'ল যে, কর্ম্মানুসারে অধর্ম্মাচারীকে সাজা দিতে যম কখন তার ধর্ম্মের কোন প্রকার ব্যতিক্রম করে না, তাই সে ধর্ম্মরাজ। কিন্তু নচিকেতার ক্ষেত্রে তার বিচারের কোন প্রশ্ন উঠে না, কেননা অপরাধীরই বিচার হ'য়ে থাকে, নচিকেতা তো অপরাধী নয়?

একদিনের সভাতেই শ্রীমাধবের জনেক শিষ্য প্রশ্ন করে—ক্ষমা কথাটির যথার্থ অর্থ কি?

শ্রীমাধব বলেন, মুনিঋষি বা মনীষিদের বাণীরূপ মন্ত্র বা শ্লোক কখন মিথ্যা নয় কিন্তু ভাষ্যকারেরা স্থান—কাল—পাত্রানুসারে এ সকল মন্ত্র বা শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছে। বর্ত্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সে ব্যাখ্যা অনেক সময় অচল। সেই সমস্ত মন্ত্র বা শ্লোকের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই এখন আমাদের অনুধাবন করা উচিত।

শ্রীমাধব বলেন, ক্ষমা তাকেই বলে যে আমার প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানরূপী কর্ম্ম যা আমি জীবনে ক'রেছি, সেই অজ্ঞানরূপ যে

অবোধ, তাকে কোন সাজা না দিয়ে ক্ষমা ক'রে, প্রকৃষ্ট জ্ঞানের নির্দ্দেশানুসারে আমি চলব অর্থাৎ তোমার নিজের মধ্যে যে অজ্ঞানতা রয়েছে তার সঙ্গে লড়াই না ক'রে তাকে ক্ষমা কর এবং তোমার প্রকৃষ্ট জ্ঞানের নির্দ্দেশানুসারে কর্ম্ম কর। একমাত্র প্রকৃষ্ট জ্ঞানের জাগরণেই সমস্ত মলিনতা ও অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। শ্রীমাধব বলেন, তাছাড়া অন্যকে ক্ষমা করার অধিকার তোমার কোথায়? তুমি ক্ষমা করলেই কি সে তার ভোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে?

শ্রীমাধব বলেন, ক্ষমা কথাটি হ'ল ঈশ্বর পথে যাবার একটি বিকল্প পথ। 'ক্ষমা কর' কথাটি একটি প্রার্থনা স্বরূপ। ক্ষমা কর বললেই কি ঈশ্বর ক্ষমা করেন? না, তা করেন না। তবে 'ক্ষমা কর' ব'লে তুমি তাঁরে স্মরণে মননে রাখ।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীমাধব বলেন, প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম কি সেটি আমাদের জানা নেই, তাই সর্ব্বত্র আমরা ধর্ম্মকে খুঁজে বেড়াই, মনে করি ধ্যান, জপ, পূজা ইত্যাদিই হয়তো ধর্ম্ম। এসব ক্রিয়াকর্ম্ম ধর্ম্মের অঙ্গ তো বটেই, তবে প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম নয়। ধ্যান, জপতপ, পূজা ইত্যাদি দ্বারা নির্ম্মল হবার পথ প্রশস্ত হয়। নির্ম্মল ও পবিত্র হ'য়ে যে কর্ম্ম তোমরা করবে সেটিই প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম। প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম সব কিছুকে ধারণ ক'রে রাখে। এই ধর্ম্ম হ'ল শাশ্বত সত্যের বৃত্তি বা প্রকৃতি বা স্বভাব। সেটি প্রকাশ হয় কি ক'রে? শাশ্বত সত্যের সত্তা দ্বারাই এই বৃত্তির প্রকাশ।

শ্রীমাধব বলেন, তোমরা সবাই সেই শাশ্বত সত্যের সত্তা। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই বৃত্তি আছে, তোমরা এই বৃত্তির অধিকারী। একথা মনে রেখে তোমাদের কর্ম্ম করতে হবে। তোমরা মানুষ, সমস্ত অবস্থায় মানবিকতার সহিত সবার মান রেখে তোমাদের কর্ম্ম করতে হবে, তবেই সেই শাশ্বত সত্যের বৃত্তি তোমাদের দ্বারা প্রকাশিত হবে।

আমরা কি নিরাশ্রয়? জ্ঞান এবং আনন্দ কি সাধ্যবস্তু নয়?

গত মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্ত একটি গানের কলি উদ্ধৃত ক'রে বলেন এখানে সাধক তার অন্তরের প্রার্থনা ঈশ্বরের পাদপদ্মে নিবেদন ক'রে বলছেন, 'হে প্রভু! আমি নিরাশ্রয় তুমি আমায় পরিত্রাণ কর, তোমার পাদপদ্মে আমাকে আশ্রয় দাও।' এখন প্রশ্ন হ'ল সত্যিই কি আমরা নিরাশ্রয়?

শ্রীমাধব একথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, মহাজনরা যে কথা বলে গেছেন তা কি ভুল? না, তাঁদের কথায় কোন ভুল নেই, আমরা তার ভুল অর্থ করি বা এ আমাদেরই বোঝবার ভুল। নিরাশ্রয় বলা হ'চ্ছে অজ্ঞানতাকে। অজ্ঞানতার আবরণে মানব-মানবীর প্রকৃত জ্ঞান সম্পূর্ণ আবৃত হ'য়ে আছে। আমরা যে তাঁরই আশ্রয়ে আছি, তাঁর কোলেই আছি, সে কথা আজ বিস্মৃত হ'য়ে গেছি এবং সেই বোধ, সেই জ্ঞান নেই বলেই নিজেদের সহায় সম্বলহীন ও নিরাশ্রয় বলে মনে করি। সেই কারণে অন্তর থেকে এই প্রার্থনাই উদ্ভূত হয়, 'হে ঈশ্বর! অজ্ঞানতার আবরণে আবৃত থেকে আমি যে তোমারই অভিন্ন সত্তা, সে কথা বিস্মৃত হ'য়েছি। তোমার কোলেই যে আমার স্থান, আমি যে চিরকাল তোমার আশ্রয়েই ছিলাম, আছি এবং থাকব সে জ্ঞান বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। আমার এই অজ্ঞানতা দূর ক'রে দাও প্রভু'! শ্রীমাধব বলেন, নিজেকে নিরাশ্রয় মনে করার অর্থ হ'ল অজ্ঞানতা।

প্রশ্নকর্তা শ্রীমাধবকে উদ্দেশ্য ক'রে দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন,—আপনি একদিন বলেছিলেন, সাধ্যবস্তু হ'ল সত্য আর ব্রহ্মবস্তু হ'ল সত্যম—জ্ঞানম্—আনন্দম্। তবে কি জ্ঞান এবং আনন্দ সাধ্য বস্তু নয়?

শ্রীমাধব বলেন, সত্যের প্রকাশ হ'ল জ্ঞান। জ্ঞান অর্থে বোধ-

শক্তি। কাজেই জ্ঞান এবং সত্তা অভিন্ন। জ্ঞান ভিন্ন কিছুই বোধ করা, জানা বা ধারণা করা যায় না। সত্তার প্রকাশ যেমন জ্ঞান তেমনি জ্ঞানের প্রকাশ হ'ল আনন্দ। তাই সত্তা, জ্ঞান এবং আনন্দ এ তিনই অভিন্ন। তাঁকে না জানতে পারলে আনন্দের উদয় হবে কি ক'রে?, জ্ঞানদ্বারা যখন সত্তাকে জানা যায় তখন আপনি আনন্দ উদ্ভূত হয়। যদিও জ্ঞানের প্রকাশ আনন্দ, তবু বলি যতক্ষণ এই বোধ থাকে যে, তাঁকে জানব বা লাভ করব, ততক্ষণ কিন্তু জ্ঞান ও আনন্দ উভয়ই আপেক্ষিক তবে প্রকৃষ্ট জ্ঞান আপেক্ষিক নয়। প্রকৃষ্ট জ্ঞানের প্রকাশ যে আনন্দ তাও আপেক্ষিক নয়, সত্তা তো আপেক্ষিক নয়ই। অর্থাৎ সাধ্য কথাটি সত্তা—জ্ঞান ও আনন্দের সঙ্গে যতক্ষণ যুক্ত থাকবে ততক্ষণ এই তিনই আপেক্ষিক।

শিশুকাল থেকে আমরা দেখে আসছি সাধ্যবস্তুর শেষ নেই। জ্ঞান লাভের জন্যও কত না সাধাসাধনা করতে হয়। এই সাধাটি কি? এটি হ'ল আমাদের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার, যে অন্ধকার দূর করার জন্যই আমাদের যত সাধাসাধনা কিন্তু সে কথাটি আমাদের স্মরণে নেই; আমরা ভাবি সাধাসাধনা দ্বারাই তাঁকে লাভ করতে পারব। প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানতার অন্ধকার যতখানি দূরীভূত হবে ততখানিই তো জ্ঞানের আলো পথ দেখাবে। অজ্ঞানতার অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হ'লেই প্রকৃষ্ট জ্ঞানের আলোকে চারিদিকে প্লাবন বয়ে যায় এবং তখন যে আনন্দ উদ্ভূত হয় সেটি আপেক্ষিক নয়। ঈশ্বর বা সত্তা নিরপেক্ষ। তিনি কারো জন্য কোন বিশেষ স্থানে দাঁড়িয়ে নেই, তিনি সমভাবে সর্ব্বত্র বিরাজমান। অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকে এ মানব-মানবীর এক প্রকারের প্রলাপ যে, সাধাসাধনা দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায়। আসল কথা এই যে, অন্ধকার দূরীভূত করার প্রক্রিয়াই হ'ল সাধন প্রক্রিয়া।

শ্রীমাধব বলেন, এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে তাঁর নাম করি

কেন? তার কারণ হ'ল আমরা যখন বিপদগ্রস্থ হই তখন আপনা থেকেই যেমন 'মাগো, মা' ইত্যাদি কাতরোক্তি নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে এও তেমনি। বিপদে পড়লে আপনি মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, 'হে ঈশ্বর, হরি, দীনবন্ধু, দয়াময়, মধুসূদন।' ভাবি, তাঁকে ডাকলেই বুঝি বিপদ থেকে ত্রাণ পেতে পারব, এ আশ্বাস মনে জাগে। শ্রীমাধব বলেন, এটি উত্তম আশ্বাস, উত্তম ভরসার কথা। তিনি বলেন, বিশ্বাস, ভক্তি ও দৃঢ়তা ছাড়া অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূরীভূত করার আর কোন পথ নেই। অন্ধকার দূর হ'য়ে গেলে বিশ্বাসের প্রয়োজনও মিটে যায়। এই বিশ্বাসটি কিন্তু আপেক্ষিক। আমাদের বিশ্বাস আসে লোভ বা লাভের বশবর্ত্তী হ'য়ে। অজ্ঞানান্ধকার দূর হ'য়ে গেলে দেখা যায় তাঁর প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি বা দৃঢ়তা কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, কেননা তিনি যে এসব কিছুরই অতীত। সমস্ত প্রক্রিয়াই আপেক্ষিক। মায়ান্ধকারে আছি বলেই আমরা এসব প্রক্রিয়াকে অত্যধিক মূল্য দিয়ে থাকি। সাধু, গুরু, বৈষ্ণবেরাও এই বিশ্বাস, ভক্তি ও দৃঢ়তার কথা বলে থাকেন, তার উদ্দেশ্য হ'ল মানবমানবীর অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার দূরীকরণের জন্য।

যিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান, তাঁর আশ্রয়ে, তাঁর কোলে থেকেও, কর্ম্মের ফেরে অজ্ঞানতার অন্ধকারে পড়ে আমরা নিজেদের নিরাশ্রয় মনে করছি। প্রকৃষ্ট জ্ঞানের বাতি যেদিন জ্বলে উঠবে সেদিন চারিদিক আলোয় আলোময় হবে এবং দেখা যাবে ঈশ্বর আপেক্ষিক নন, তিনি নিরপেক্ষ।

শ্রীমাধব বলেন, সাধনভজন প্রক্রিয়া বা বিশ্বাস, ভক্তি, দৃঢ়তা ইত্যাদি সাধন ক্ষেত্রে শুভবুদ্ধি। তাঁর উপদেশ হ'ল, সাধন ক্ষেত্রের নানা প্রক্রিয়া বা ভক্তি বিশ্বাস ভাল, তবে প্রকৃত সত্য জানবার চেষ্টা কর। শ্রীমাধব সর্ব্বদাই তাঁর শিষ্য, ভক্ত ও সাধারণ মানবমানবীকে এ উপদেশই দিয়ে থাকেন যে, যে যেখানে আছ, যে পথ গ্রহণ

ক'রেছ, সেখানেই থেমে থেকো না, এগিয়ে চল। জগত যেখানে গতিশীল সেখানে তোমাকে তো স্থবির হ'য়ে থাকলে চলবে না। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলমান এই জগতের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে হবে তোমাকেও, কেননা তুমি যে ঈশ্বরের সৃষ্ট এই জগতে সেরা জীব। 'ঈশ্বরের অভেদ সত্তার অধিকারী হ'য়ে মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার সাহায্যে তাঁর প্রকাশ বিকাশ যে সম্ভব একমাত্র মানবমানবীর দ্বারাই, কেননা ঈশ্বরানুভূতির শক্তি তো তিনি আর কোন জীবের প্রতি আরোপ করেন নি। তাই তিনি বলেন ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা কর—'হে প্রভু! তুমি যে সাধন প্রক্রিয়া দিয়েছ তাতে যেন মায়ান্ধকার পার হ'তে পারি।' এই প্রার্থনাও আপেক্ষিক তবু তার প্রয়োজন আছে; কেননা সাঁতার কেটে নদী পার হবার চেষ্টা তো আমাদের সকলকেই করতে হবে। অজ্ঞান অন্ধকারের সঙ্গেই তো আজীবন আমাদের সাধন সমর চালাতে হবে।

শ্রীমাধব বলেন, এতক্ষণ যা বলেছি সে সবই হ'ল সাধন ভজনের মূল লক্ষ্য। সমস্ত সাধন প্রক্রিয়াই মায়ান্ধকার দূরীভূত করার কারণে প্রতিপালিত হয়।

তিনি বলেন, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যা বলেছেন, ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা পড়ে আমরা তাতে ভেসে বেড়াচ্ছি। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' অর্থাৎ 'মানবরূপে তোমরা যে সংসারে এসেছ সেখানে মানবীয় ধর্ম্ম পালন কর। জগতে আমি চার জাতীয় জীব সৃষ্টি ক'রেছি, উদ্ভিজ্জ-স্বেদজ-অণ্ডজ এবং জরায়ুজ। এই জরায়ুজ জাতির মধ্যে অন্তরানুভূতিসম্পন্ন মানবই হ'ল শ্রেষ্ঠ, তাই মানবীয় ধর্ম্মই মানবমানবীর পালন করা উচিত। মানবকে জীবনপথে সুপরিচালিত করার জন্যই জগতের অন্য সব কিছুর সৃষ্টি, কাজেই অমানবীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে মানবীয় ধর্ম্ম

পালন করাই তোমাদের কর্ত্তব্য।' মনুষ্যত্বের জাগরণ এবং মানবিকতার উৎকর্ষ সাধনই মানবীয় ধ । মনুষ্যত্ব ঈশ্বরেরই অভিন্ন সত্তা। মানবের মানবীয় ধর্ম্ম পালন করাই ঈশ্বরকে বা 'আমাকে' ভজনা করা বা স্মরণ করা।

ঈশ্বর বলছেন, 'ধর্ম্মই আমি, আবার অধর্ম্মও আমি। তাই বলে তোমাকে অধর্ম্ম খুঁজে বেড়াতে বলিনি। আমাকে খুঁজবার জন্যই তোমার সৃষ্টি তাই মনুষ্যত্বকে জাগ্রত ক'রে তুমি খুঁজবে আমাকে। প্রকৃত ধর্ম্মের মান রক্ষার জন্যই অধর্ম্মকে পাশাপাশি রেখেছি।' ধর্ম্মের মধ্যে কিভাবে মানবমানবী পরিচালিত হবে তার জন্যই মনুষ্যত্বের জাগরণ প্রয়োজন। মনুষ্যত্বের ধর্ম্মে যে পরিচালিত হবে তার জন্য ঈশ্বর বুদ্ধিবৃত্তি সাজিয়ে রেখেছেন। আর যারা অধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হবে তাদের জন্য ইন্দ্রিয়াদি রিপুসহ মনোবৃত্তিও রয়েছে। এরূপ মনোবৃত্তি সমূহের ফল খেয়ে কি পরিণাম হয় তাও তোমরা প্রত্যক্ষ করতে পার। এসব দেখেও ঈশ্বর বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে কেন তোমরা চলবে না?

শ্রীমাধব বলেন, কিন্তু জীবনপথে আমরা কি করি? আমিত্ব মনোবৃত্তি সমূহের ফল খেয়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়ি অর্থাৎ পরিণাম ভোগ করি। ব্যতিক্রমের কর্ম্ম করলে পরিণাম তো ভোগ করতেই হয়। অসুখ হ'লে সুস্থ হবার জন্য যেমন চিকিৎসার প্রয়োজন, তেমনি আধ্যাত্মিক পথে পরিণামশীল কর্ম্মের জন্য আমরা সাধু, গুরু, বৈষ্ণবরূপ বৈদ্যের কাছে ছুটোছুটি করি বা মন্দিরে, মসজিদে, গির্জ্জায় গিয়ে পূজা করি, প্রার্থনা জানাই, ভেট দিই, মানসিক করি। এ অবস্থায় কারু কারু অনুশোচনা জাগে এবং জীবন পথের মোড় ঘুরে গিয়ে ভগবৎপথী হ'য়ে উঠে এবং বাকী জীবনটা নিজেকে নির্ম্মল ও পবিত্র ক'রে তুলতে যত্নবান হয়।

শ্রীমাধব বলেন, ঈশ্বরই সব করছেন বা তিনি আর আমি অভিন্ন

এ বোধ যার হয় তার তো, আর সাধন ভজনের প্রয়োজন নেই। 'তুমিই সব করছ, এটিই তো শাশ্বত সত্য কথা। এ বোধ যদি কারো এসে থাকে তবে সে আর ঈশ্বর তো অভেদ।

সভায় একটি অস্ফুট ধ্বনি উঠেছিল—'তুমিই সব করছ, তবে আমাকে কেন খাটাচ্ছ'? কথাটি শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমাধব বলে উঠেন, এতেই বোঝা গেল, 'তুমি সব করছ' প্রকৃতপক্ষে এ বোধ আসেনি। এ কেবল আমাদের মুখের কথা যে; তুমিই সব করছ, কিন্তু যখন আমাদের স্বার্থে আঘাত লাগে তখন না ব'লে পারি না, 'তবে আমায় কেন কষ্ট দিচ্ছ!' এমন কি চিন্তাতেও যদি এই উক্তি মনে উদয় হয়, তবে যে তুমি কোথায়, কত নীচে পড়ে গেলে তার ঠিকানা নেই। বহু কষ্ট ক'রে পাহাড়ের সানুদেশে উঠেছিলে কিন্তু একথা মনে হ'তেই এক ধাক্কায় পাহাড়ের পাদদেশে গড়িয়ে পড়ে গেলে।

এতে বোঝা যায় 'তুমি সব কর' এটি কানে শোনা কথা, তোতাপাখীকে শেখান বুলি, অন্তরানুভূতির কথা এটি নয়। অবশ্য কোন কথাই কর্ণকুহরে প্রবেশ না করলে অন্তরানুভূতি জাগে না, আবার স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে কর্ণকুহরে প্রবেশ করলেও বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়। তাই তোমাদের উচিত নিঃস্বার্থবুদ্ধিতে উপদেশ নির্দ্দেশ শ্রবণ ক'রে সেটি গভীর ভাবে চিন্তা করা; তবেই কর্ণকুহরে যা শুনবে তা অন্তরানুভূতিতে এসে পৌঁছবে।

সত্য অপরিবর্ত্তণীয়

গত মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক শিষ্য প্রশ্ন করেন,—সত্যানুসন্ধানী কারো কারো মুখে শুনেছি, 'সত্য নিরপেক্ষ,

সত্যের কোন পরিবর্ত্তন নেই'। জাগতিক দৃষ্টিতে আমরা প্রত্যক্ষ করি সত্যের দুটি অবস্থা; ১) একটি দৈহিক অবলুপ্তি অর্থাৎ মৃত্যু ২) অন্যটি হ'ল অনিশ্চয়তা অর্থাৎ অদৃষ্ট। এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, দৃশ্যমান জগতে তোমরা যা দেখছ তাইতো বলবে। এর বাইরে যা আছে সে তো অসাধারণ, তা তো আর দেখতে পাওনা। সাধারণ দৃষ্টিতে তোমরা দেখছ 'জন্মিলে মরিতে হবে'; কিন্তু এর অতীত অবস্থায় যেতে পারলে দেখবে, মৃত্যুটিও কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু নয়। এটি হ'ল জীর্ণদেহ ছেড়ে আর একটি দেহ গ্রহণ করা, যাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, 'এ ঘর থেকে ওঘরে যাওয়া'। গীতায় শ্রীকৃষ্ণও এই একই কথা বলেছেন—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

তাহ'লে দেখা যায় মৃত্যুটিও সত্য নয়। তবে মৃত্যু কি? মৃত্যু যদি সত্য হ'ত তবে তো কোন ভাবনাই ছিলনা, মৃত্যুর পরেই পরমসত্যকে লাভ করা যেত। সেখানে তো আর পাপপুণ্যের বিচারের প্রশ্ন উঠে না। সত্যের কোন পরিবর্ত্তন নেই, এ উত্তর যিনি তোমায় দিয়েছেন তাঁরও এটি বই-এ পড়া কথা, প্রকৃত-পক্ষে সত্যে লিপ্ত না হ'য়ে সত্যের সন্ধান করা সম্ভব নয়।

সারাবিশ্বের অবস্থিতি হ'ল সত্যে। সত্যের বাইরে যে তিলার্দ্ধ স্থানও নেই, কাজেই পরিবর্ত্তন হবে কি ক'রে? অনন্ত বিশ্বে একটি সর্ষে পরিমাণ স্থানও কি কেউ খুঁজে বার করতে পারে, যেখানে সত্য নেই? সত্যই হ'ল ভিত। সত্যের মধ্যেই সত্তার স্থান। সত্য হ'লেন পূর্ণ। তিনি যে পরিবর্ত্তিত হবেন এমন কোন স্থান নেই।

অনন্ত বিশ্বের বহিরান্তরে ওতঃপ্রোতভাবে সত্য পরিপূর্ণ। সত্য নিজেও নিত্য এবং তাঁর গুণ, ক্রিয়াও নিত্য। অনিত্যের মধ্যে প্রবেশ ক'রেও সত্য কিন্তু নিত্যই থাকেন; কেননা অনিত্যের মধ্যে প্রবেশ ক'রেও তাঁর সত্যতা বিন্দুমাত্রও খর্ব্ব হয়না, তাই তিনি নিত্য। সত্য এক। তিনি অনন্তের মধ্যে বা অনন্ত সংখ্যার মধ্যে প্রবেশ ক'রে আছেন কিন্তু তাঁর মধ্যে কোন সংখ্যারই প্রবেশাধিকার নেই। যেমন একক সংখ্যা সব সংখ্যার মধ্যে প্রবেশ করে রয়েছে, কিন্তু একক সংখ্যার মধ্যে কোন সংখ্যা প্রবেশ করতে পারেনা।

অনন্ত বিশ্ব যে সত্যে পরিপূর্ণ, আমাদের বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেটি নজরে পড়ে না। সত্যযুগ থেকে শুরু ক'রে কলিযুগ পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা ক'রে বলা হয়; সত্যযুগে ছিল চারপাদ সত্য, ত্রেতাতে তিনপাদ, দ্বাপরে দুই পাদ এবং কলিতে কেবল একপাদ সত্য রয়েছে। কালের প্রবাহে শশীকলার মত ক্ষয় হ'তে হ'তে কলিকালে যদি তিনপাদ সত্য ঝরে গিয়ে একপাদ থেকে থাকে তবে মানবমানবী সত্যানুসন্ধানী হ'তে যাবে কেন?

ধর্ম্ম একটি এবং সেটি হ'ল সত্যধর্ম্ম। এই সত্য ধর্ম্মের উপর নির্ভর ক'রেই জগতে অনন্ত ধর্ম্মের সৃষ্টি হ'য়েছে। তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে, শাস্ত্রমতে কালের প্রভাব এবং গ্লানিতে সত্যের তিনপাদ ঢাকা পড়ে গেছে, রয়েছে কেবল একপাদ। তবে গ্লানিটি এল কোথা হ'তে?

শ্রীমাধব বলেন, আমি যেখানকার কথা বলছি সেখানে অসত্য বলে কিছু নেই। এ কেবল রূপের পরিবর্ত্তন, স'ত্যকারের অসত্য সেখানে কিছু নেই। সত্যাসত্যের বিভেদ সৃষ্টি হয় জ্ঞান ও অজ্ঞানতা থেকে। অজ্ঞানতার মধ্যে পড়ে মানবমানবীর আচরণ অর্থাৎ মানুষের আচরণ যা কালপ্রভাবে অজ্ঞানতার অন্ধকার দ্বারা আবৃত হ'য়ে গেছে সেটিকেই আমরা বলি অসত্য। প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা বলে কি কিছু আছে? জগতে যা কিছু আমরা দেখি, সে সবই যখন

সত্য থেকেই উদ্ভূত এবং স্বয়ং সত্যেরই প্রকাশ বিকাশ তখন জগতে কোনটিকে মিথ্যা বলবে? শাস্ত্রাতীত অবস্থায় যেতে পারলে দেখতে পাবে, সত্যের সৃষ্টি সবই সত্য। যতক্ষণ জগতের মধ্যে থেকে শাস্ত্র মেনে চলছ ততক্ষণই আছে সত্য ও মিথ্যা। তবে জগতে শাস্ত্রাধীন অবস্থায় থেকে মিথ্যা আমরা বলি কাকে? প্রবৃত্তির আচরণ বা আমাদের আচরণই হ'ল সত্য এবং মিথ্যা।

শ্রীমাধব বলেন, তোমাদের সীমিত দৃষ্টিতে তোমরা দেখছ জগতে সবই অস্থায়ী, সবই বিনাশশীল, কিন্তু প্রকৃষ্ট দৃষ্টি বা সম্যক্‌দৃষ্টিতে যদি দেখ, তবে দেখবে কিছুই নষ্ট হ'চ্ছে না—'কিছুই যায় না ফেলা'। জাগতিক দৃষ্টিতে দেখছ সুন্দর পাকা আমটি পচে নষ্ট হ'য়ে গেল, সযত্ন-রক্ষিত দেহটি পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে নষ্ট কিছুই হয় না; যেখানকার জিনিষ সেখানে মিশে যায়। কাজে কাজেই নষ্ট কিছুই হ'চ্ছে না।

সীমিত জাগতিক দৃষ্টির পরপারে যে সম্প্রসারিত দৃষ্টি তারই নাম হ'ল সম্যক্‌জ্ঞান। সেই দৃষ্টিতে সব কিছু দেখার অধিকারী যে হ'তে পারে, সে জানে যে, নষ্ট কিছুই হয় না, নাশ ব'লে কিছু নেই। তবে এ বড় উচ্চস্তরের কথা, উঁচু জ্ঞানের কথা। সাধারণ মানবমানবীর স্তরে সত্য, মিথ্যা, ক্ষয় সব কিছুই আছে তাই সেখান থেকেই মানবমানবীর যাত্রা হবে সুরু। তোমরা যে মৃত্যু দেখছ, এটি হ'ল রূপ থেকে অরূপে যাওয়া। এই মৃত্যু ভয়ই আমাদের সংপথে যাবার প্রেরণা যোগায়, সত্যানুসন্ধানে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

শ্রীমাধব বলেন, আমরা যখন জড়বুদ্ধি নিয়ে জড়জগতে অবস্থান করি তখনই আমাদের এই জড়তা দূর করার চেষ্টা করা উচিত, কেননা জড়তাই অজ্ঞানতার কারণস্বরূপ এবং জড়তা থেকেই সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্মের উৎপত্তি। জড়বুদ্ধি এবং জড়ভাবের হাত থেকে মুক্ত আমাদের হ'তেই হবে। জড়তার মধ্যে আমরা যতক্ষণ বসবাস

করব ততক্ষণ জ্বরের প্রলাপই বক্‌তে হবে। জ্বরের সাধারণ অবস্থা আলাপ এবং শেষ অবস্থা প্রলাপে পরিণত হয়। জ্বরের সাধারণ অবস্থায় কত রকমারি আলাপ লোকে করে; কেউ বা করে জ্ঞানের আলাপ, আবার কেউ করে প্রেমের আলাপ ইত্যাদি আরও কত রকমের আলাপ।

জড়তা বা অজ্ঞানতা-সাগরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হ'য়ে মানবমানবী ব্যতিক্রমের কর্ম্ম ক'রে যখন পরিণাম ভোগ করে, তখন তারা নানারকমের প্রলাপ বক্‌তে সুরু করে যেমন, 'হে গোবিন্দ, হে ঈশ্বর, দয়াময় এ বিপদ থেকে আমায় পরিত্রাণ কর', কিন্তু সাধারণ অবস্থায় একবারও কি তাঁর নাম স্মরণে আসে? আসে না। মনে হয় তাতে বুঝি লোকে পাগল বলবে।

শ্রীমাধব বলেন, সাধকের কোন জড়তা নেই। জড়তা সাধারণ মানবমানবীর জন্য। সাধকের কাছে ভাঙ্গা নৌকা এবং নূতন নৌকা দুই-ই এক, সব রকম নৌকায়ই সে নদী পারাপার করতে পারে। আর একটি কথা যে বললে, অনিশ্চয়তা সত্য, এটি ঠিক নয়। অনিশ্চয়তা বললে সেটি সত্য এবং মিথ্যা দুই-ই হ'তে পারে। সত্য ও মিথ্যা উভয় সুরই অনিশ্চয়তার মধ্যে বাজে।

সত্যসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যত কিছু সাধন ভজন করি তা হ'ল আলাপ আর আত্মচরিতার্থে যে সকল কর্ম্ম ক'রে থাকি তাকে বলা যায় প্রলাপ। সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ দুটোকেই বিকার বলা চলে। প্রথমটি সত্ত্বগুণ সম্পন্ন এবং দ্বিতীয়টি রজঃ ও তমগুণ সম্পন্ন।

সত্য আলোচনার ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম চিন্তা করতে হবে যে, সত্তা কি? জগতে আমরা সবাই সত্যেরই সত্তা। সত্তা হ'ল বিকারী, কেননা তার সর্ব্বকর্ম্মই বিকারপূর্ণ, সে ভালই হ'ক আর মন্দই হ'ক। প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যেই আছে অনন্ত প্রকারের বিকার। অনন্ত

বিশ্বরূপে রূপ লইয়াও সত্য কিন্তু নির্ব্বিকার। সত্যকে বলা হয় 'একমেবা দ্বিতীয়ম্'। এ কারণেই তিনি সত্য, তাই নয় কি?

জনৈক ভক্তকে শ্রীমাধব এ বিষয় তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করায় তিনি একটি গল্পের অবতারণা করেন। গল্পটি এইরূপ—

রাজসভায় নানারকম প্রশ্নোত্তরের পর রাজা জিজ্ঞাসা করেন, তাহ'লে ঈশ্বর কি করেন? প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর রাজসভায় কেউ দিতে পারে না। তখন একজন চাষী এই সর্ত্তে প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী হয় যে, রাজাকে তার সাথে জায়গা বদল করতে হবে। জায়গা বদল হ'লে রাজ সিংহাসনে বসে চাষী বলে, 'ঈশ্বর ফকিরকে রাজা করেন এবং রাজাকে ফকির করেন।' ভক্ত শ্রোতাটির এ গল্প অবতারণা করার উদ্দেশ্য হ'ল যে, তারমত সাধারণ জীবের মতামতের মূল্য কি?

গল্পের এই হাস্যরসের পরিবেশে শ্রীমাধব একটি গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, চাষী সে-ই যে উত্তমরূপে চিত্তভূমি চষবার কৌশল জানে অর্থাৎ সেই প্রকৃষ্ট সাধক, প্রকৃষ্ট জ্ঞানী। এই চিত্তভূমিতে কোন্ বীজে কি ফসল ফলে, কখন কোন্ বীজ ফেলার উপযুক্ত সময়, সে খবর একমাত্র অভিজ্ঞ এবং কুশলী চাষী ছাড়া আর কে জানে? ঈশ্বর নিজেও তো একজন দক্ষ চাষী। তাই তো কৃষ্ণ নিজে হাল চাষ ক'রে জগতের সামনে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন অর্থাৎ চাষী সামান্য ব্যক্তি নয়, সে হ'ল প্রকৃষ্ট সাধক।

শ্রীমাধবের অনুরোধে আলোচনা সভায় সেই প্রবীণ ভক্ত ব্যাসদেব লিখিত কয়েকটি স্তোত্র পড়ে শোনান। ব্যাসদেবের স্তোত্র প্রসঙ্গে শ্রীমাধব বলেন, ব্যাসদেব যে শ্লোকসকল রচনা ক'রেছেন তাতে আছে সর্ব্বকালের, সর্ব্বসাধারণের মুক্তি বা শান্তির নিশানা। কিন্তু সাধারণ মানবমানবী কি তার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়? হয় না। কেননা মনুষ্য চরিত্র যে কাকচরিত্রের সামিল হ'য়ে গেছে।

কাক যেমন কোন-বাধাবিঘ্ন না মেনে বনে জঙ্গলে ঘুরে হজম ক্ষমতার অতিরিক্ত গাবফল খেয়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে আর বলে, 'হে ঠাকুর! আর গাবফল খাব না, এবারের মত ত্রাণ কর।' ডাক শুনে দয়াল ঈশ্বর তাকে বিপদমুক্ত ক'রে দেন বটে কিন্তু কাকের স্বভাবের কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। মনুষ্য চরিত্রও তদ্রূপ। বিপদমুক্তির জন্য আমরা তাঁকে ডাকি, কিন্তু বিপদ কেটে গেলে আবার নিজের স্বভাব অনুযায়ী কর্ম্ম ক'রে থাকি।

ব্যাসদেব শ্লোকে লিখেছেন, 'হে ঈশ্বর! তুমি যদি সর্ব্বাবস্থায় আমাকে আশ্রয় না দাও, রক্ষা না কর, তবে আমার আর কোন উপায়ান্তর নেই।' শ্রীমাধব বলেন, একদিকে এটি হ'ল অজ্ঞানতার প্রকাশ আবার অন্যদিকে এটি বিশুদ্ধজ্ঞানের প্রকাশ। ব্যাসদেবের ক্ষেত্রে এ হ'ল বিশুদ্ধজ্ঞানের কথা, কেননা, তিনি সম্যক্জ্ঞানের অধিকারী তাই প্রভুকে তিনি জানেন। তাঁকে জেনেই তিনি বলছেন, 'প্রভু! আমাকে তুমি রক্ষা কর।' কিন্তু সাধারণ মানবমানবী তাঁকে জানে না, চেনে না, কোন সম্পর্ক স্থাপন না ক'রেই বলে, 'প্রভু! আমাকে রক্ষা কর।'

ব্যাসদেব মায়াকর্ম্মের জ্বালাযন্ত্রণায় অসহ্য হ'য়ে ঈশ্বরের কাছে কাতর প্রার্থনা জানিয়ে বলছেন, 'আর আমি সহ্য করতে পারছি না—প্রভু! তুমি আমাকে রক্ষা কর।' আর আমরা ঈশ্বরকে না জেনে, না চিনেই তাঁর কাছে বিপদমুক্তির জন্য কাতর প্রার্থনা জানাই, তাতে কি ফল ফলে?

শ্রীমাধব বলেন, ব্যাসদেব হ'ল চেতনা আর চৈতন্য হ'লেন পরমেশ্বর। চেতনার কাতর প্রার্থনা অবশ্য চৈতন্য শোনেন। তাই শ্রীমাধবের উপদেশ হ'ল, ব্যাসদেব হ'য়ে তোমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর তবেই তিনি সে প্রার্থনা শুনবেন অর্থাৎ তোমাদের মনুষ্যত্বের চেতনাকে জাগ্রত কর। কিন্তু আমরা কি করি? মায়া

সাগরে ডুবে থেকে আত্মচরিতার্থে ব্যতিক্রমের কর্ম্ম ক'রে যখন আমরা পরিণাম ভোগ করি তখন ঈশ্বরের কাছে কাতর প্রার্থনা জানাই। ব্যাসদেবের কাছে মায়ার প্রহেলিকা অসহ্য তাই তিনি বলছেন, 'আমি চেতনায় আছি কিন্তু মায়ার প্রহেলিকায় অচৈতন্য হবার অবস্থা আমার হ'য়েছে ; হে চৈতন্য। এ অবস্থা থেকে আমায় তুমি রক্ষা কর।' কাজেই দেখ, ব্যাসদেবের প্রার্থনা ও আমাদের মত সাধারণ মানবমানবীর প্রার্থনায় কত প্রভেদ।

শ্রীমাধব বলেন, আমরা হ'লাম যন্ত্র। যন্ত্রের নিজে চলবার ক্ষমতা নেই, তাকে পরিচালনা করেন যন্ত্রী। আমি যে যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নই, এ বোধ আমাদের থাকা প্রয়োজন। যার এই বোধ আসে তাকে পাপপুণ্যের ফলভোগ করতে হয় না, কেননা তার কর্ত্তা ঈশ্বর, তিনিই তাকে চালান। যন্ত্রবোধ একবার এলে সে কি কখন ব্যতিক্রমে চলতে পারে ?

অপরদিকে যে যন্ত্র ভাবে সে নিজেই কর্ত্তা, সে নিজে চলে, আত্মচরিতার্থে কর্ম্ম করে, ব্যতিক্রমের পথে পা বাড়ায়, তাকে তো সাজা ভোগ করতেই হবে।

যদি কোন সাধক বা মানব নিজেকে যন্ত্র ভাবতে পারে তবে, তার পরমভাব জেগে উঠে এবং এই ভাবের সাহায্যেই সে জানতে পারে, 'আমি কে ?' যিনি তাকে চালান অর্থাৎ পরমেশ্বর, ইনি তাকে ক্রমের পথেই এগিয়ে দেন, কোথাও সামান্য ব্যতিক্রমের আঁচ পেলেও সংশোধন ক'রে দেন।

'ত্রাহি মধুসূদন'

গত মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক শ্রোতা একটি সাধারণ ছোট্ট প্রশ্ন করেন, প্রশ্নটি হ'ল— আমরা আধ্যাত্মিক

পথে চলছি কিনা সেটি বোঝার উপায় কি? জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে যে পথ আমরা গ্রহণ ক'রে থাকি তার ভালমন্দ বিচারের সুযোগ কোথায়?

উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, আমার মতে মানবমানবীর জীবন পথটিই হ'ল আধ্যাত্মিক পথ। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে জীবনের সেই চলার পথে যেন কোন ব্যতিক্রম না আসে। তোমরা হয়তো মনে কর সাধনভজন, জপতপ ইত্যাদি করাই হ'ল আধ্যাত্মিক পথের সার কথা কিন্তু আমার মতে ক্রমের পথে জীবনকে পরিচালনা করাই হ'ল আধ্যাত্মিক পথের মূল লক্ষ্য। ক্রমের পথে থেকে যে সংসার-জীবন পরিচালনা করতে পারে, সে তো আধ্যাত্মিক জীবনপথ থেকে বিচ্যুত হ'তে পারে না। সেই পথে আমি সঠিক পদক্ষেপ করতে পারছি কিনা সে কথা আপন অন্তরাত্মাই বুঝিয়ে দেন, অপরের কাছে অনুসন্ধান ক'রে সেকথা জানবার প্রয়োজন পড়েনা। সঠিক পথ বেছে নিতে পারলে সঙ্কুচিত অন্তর সুপ্রসারিত হ'য়ে উঠে এবং এইটিই হ'ল অভীষ্ট আধ্যাত্মিক পথ অনুসরণের লক্ষণ।

অনেকে বলে থাকে গুরুকৃপা হ'লে তবেই আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যাওয়া যায়। এই যে তোমরা সবাই এখানে এসে জড় হ'য়েছ, এর পেছনে একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে তাই নয় কি? অন্ততপক্ষে এখানে এলে, এই সুন্দর পরিবেশে দুটো ভাল কথা ও সদোপদেশ পেয়ে কিছুক্ষণের জন্য আনন্দলাভ তো করতে পারবে। কাজেই লাভক্ষতির মাপকাঠিতে ওজন না ক'রে নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে বিচার ক'রে দেখলে অনায়াসেই ভালমন্দের সীমারেখা টানা সম্ভব হয়।

পূর্ব্বে আলোচনার সূত্র ধরে শ্রীমাধবকে জনৈক শিষ্য প্রশ্ন করেন,— সেদিন আপনি বলেছিলেন যে 'ত্রাহি মধুসূদন' শ্লোকটি ব্যাসদেবের ক্ষেত্রে সম্যক্‌জ্ঞানের পরিচয়, আর সাধারণের ক্ষেত্রে এটি অজ্ঞানতার পরিচয়; এখন প্রশ্ন হ'ল, ব্যাসদেব যিনি সম্যকজ্ঞানের অধিকারী, তিনি কেন 'ত্রাহি মধুসূদন' ব'লে ঈশ্বরকে প্রার্থনা জানাবেন?

উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, আমরা ধরে নিচ্ছি যে ব্যাসদেব 'ত্রাহি মধুসূদন' বলেছেন। ধর, তুমি একটি প্রার্থনা লিখেছ, পাঁচশ বছর পরে লোকে যদি বলে যে, যিনি শ্রীমাধবের সঙ্গ করেছেন, তিনি কেন এরকম প্রার্থনা লিখবেন; এও সেইরকম। প্রকৃত কথা এই যে, জীব কল্যাণেই ব্যাসদেব এ শ্লোক লিখে গেছেন। তিনি একথাই সাধারণ মানবমানবীকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, বিশ্বকে ত্রাণ করার ক্ষমতা একমাত্র মধুসূদনেরই আছে, তাই তাঁর লিখনীতেও ঐ ভাবই প্রকাশ পেয়েছে।

আসল কথা হ'ল, মানুষ যতক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল জ্ঞানে না পৌঁছুতে পারে ততক্ষণ তার মধ্যে আময় থাকে। তাছাড়া দ্বৈতজ্ঞানে থাকাকালীন 'তুমি প্রভু, আমি দাস' বা 'ত্রাহি মধুসূদন' প্রভৃতি বলা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়।

শ্রীমাধব বলেন, আমাদের বুঝতে হবে সম্যক্‌জ্ঞান কথাটির প্রকৃত অর্থ কি?

জ্ঞানকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়—একটি হ'ল প্রত্যক্ষজ্ঞান, অপরটি প্রকৃষ্ট জ্ঞান। ঈশ্বর সম্বন্ধে যখন কোন দ্বিধা বা সন্দেহ থাকে না তাকেই বলে প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা সম্যক্‌জ্ঞান। এই জ্ঞানটি কখন হয়? সাধক বল, মানুষ বল বা যে কোন জীবক্ষেত্রে বল নিজ অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে ঈশ্বরই যে সর্ব্ব অস্তিত্বের [illegible], তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা, আমার নিজস্ব অস্তিত্ব ব'লে কিছু নেই এই জ্ঞান যখন হয় তখনই সম্যক্‌জ্ঞানের উদয় হয় অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকে না। একেই বলে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

শ্রীমাধব বলেন, আমি যে কত স্তোত্র, কত প্রার্থনা লিখেছি, কত গান রচনা ক'রেছি, কত গাথা, উপাখ্যান, কীর্ত্তন, উপদেশ নির্দ্দেশ লিপিবদ্ধ ক'রেছি, সে সব তো তোমাদেরই জন্য, আমার নিজের জন্য তো নয়? শ্রীশ্রীঠাকুর যে জীবনভোর কত কথা ব'লে গেছেন তাও

কি তাঁর নিজের জন্য? না, সে-ও লোকশিক্ষার কারণেই। তাই মনে হয় ব্যাসদেবের শ্লোক ও স্তোত্র রচনার কারণও সেই সাধারণ মানবমানবীর শিক্ষার জন্যই।

এ সময় সভায় একটি বালিকা শ্রোতা প্রশ্ন করে,—প্রতি শ্লোকের শেষে ব্যাসদেব যিনি সমকৃজ্ঞানের অধিকারী তিনি ব'লে গেছেন, 'ত্রাহি মধুসূদন'। আমাদের মত সাধারণ মানবমানবী যারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে আছি তারা যদি বিপদে পড়ে 'ত্রাহি মধুসূদন' ব'লে ঈশ্বরের কাছে বিপদমুক্তির প্রার্থনা জানাই তবে কি সেই অজ্ঞানতাকেই সহায়তা করা হ'ল না? অপরাধ করব আমরা, আর বিপদমুক্তির জন্য তাঁকে ডাকব, এটা কি রকম?

এ প্রশ্নর উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, আমাদের এই 'ত্রাহি মধুসূদন' কথাটির আলোচনা হ'ল নিছক 'আমি—আমার' জগতের কথা, আর তুমি যে প্রশ্নটি উত্থাপন ক'রেছ সেটি হ'ল এর উপরের স্তরের কথা। মানুষ যখন নিজেকে জানতে পারে এ হ'ল সেই অবস্থার কথা।

শ্রীমাধব বলেন, আমাদের আলোচনা হ'ল সাধারণ অবস্থার মানবমানবীকে ঘিরে। আজ যদি 'ত্রাহি মধুসূদন' কথাটি নস্যাৎ ক'রে দিই, তবে প্রহ্লাদ চরিত্রে, ধ্রুব চরিত্রে যখন দেখি তাদের কাতর প্রার্থনায় স্বয়ং শ্রীহরি এসে তাদের রক্ষা করছেন, তাও তো নস্যাৎ হ'য়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে 'ত্রাহি মধুসূদন' বললে সেটি কি অজ্ঞানতার পরিচয় হবে? তা নয়, তবে অজ্ঞানতা যতক্ষণ আছে ততক্ষণও ঐ ডাকটি আমাদের মনে সাহস ও শক্তি সঞ্চার করে। এর ঊর্দ্ধে যেতে পারলে তখন আপনি এ ভাব জাগবে যে, আমি অপরাধ ক'রেছি, ফলও ভোগ করতে হবে আমাকে, অপরাধ স্খালনের জন্য শ্রীহরিকে ডাকা কেন?

শ্রীমাধব বলেন, প্রকৃতপক্ষে এ হ'ল প্রলোভনের কথা, সাধারণ মানবমানবীর চলার পথে শক্তিদায়িনী মন্ত্রস্বরূপ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত

মানবমানবী জড়জ্ঞানে আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত 'ত্রাহিমাং', 'ত্রাহি মধুসূদন' কথাটিও আছে। এ সমস্ত আশার বাণী বা সান্ত্বনার বাণী যদি না থাকে তবে যে জড়জগত অচল হ'য়ে যাবে। এ যুগেও কি প্রহ্লাদ চরিত্র এবং ধ্রুব চরিত্র আমাদের অন্ধকারপূর্ণ জীবনপথকে আশার আলো জুগিয়ে যাচ্ছে না?

শ্রীমাধব বলেন, এ সব চরিত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা আছে। অন্তর্মুখী ভাবে এ বিশ্বে সকল মানবমানবীই প্রহ্লাদ, সবাই ধ্রুব। যদি বল, 'প্রহ্লাদ ছিলেন দৈত্যের ছেলে, আমি তো তা নই? আমি তো মানুষ'। এখানে কথা হ'ল' ষড়রিপু এবং অষ্টপাশরূপী দস্যুদের কবলে পড়ে বিপদগ্রস্থ হ'য়েই যে তোমরাও ঈশ্বরকে ডাকছ। প্রহ্লাদের সঙ্গে শ্রীহরির ছিল একাত্মভাব। অন্তর্মুখী ভাবে একটু এগিয়ে চিন্তা করলে দেখবে, শ্রীহরি যে তোমাদের অন্তরেই বসে আছেন। প্রহ্লাদ তাঁকে অন্তর থেকে ডাকত। তোমাদের ডাকতেও হবে না—তোমাদের ঢুলিবাধা চোখ খুলে দেখ অর্থাৎ সম্যক্‌জ্ঞান লাভ কর তবেই দিব্য দৃষ্টিতে সব দেখতে পাবে।

শ্রীমাধব বলেন, তিনি যে আছেন তার প্রমাণ হ'ল, তিনি আছেন ব'লেই তোমার চলন, বলন আছে, ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়মান অবস্থায় আছে। তবে একথা অতীব সত্য যে কেউ'যেন অজ্ঞানতার অন্ধকারে থেকে বিপদ মুক্তির প্রার্থনা ঈশ্বরেব কাছে · করে। আমরা দুষ্কর্ম্ম করব, অন্যায় কাজ করব, আত্মচরিতার্থে কুকর্ম্ম ক'রে বেড়াব আর তার পরিণাম ভোগ করব না তাও কি হয়? পরিণামশীল কর্ম্মের পরিণাম ভোগের সময় কেন শ্রীহরি এসে রক্ষা করবেন? শ্রীমাধব বলেন, তোমার দুষ্কর্ম্মের পরিণাম তোমারই ভোগ করা উচিত। তিনি বলেন, এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ে।

এক দস্যু, সারাটা জীবন দস্যুবৃত্তি ক'রে কাটিয়েছে। হঠাৎ একদিন দস্যুবৃত্তি করতে গিয়ে তার হাতে প,ল ভগবৎ প্রেমে পাগল

এক ভক্ত। সে বলে, 'কত ডাকছি যমরাজকে, সে কোন কথা শোনে না। তুমি আমায় নিতে এসেছ; তুমিই আমার প্রাণাধিক বন্ধু, একটু দাঁড়াও, আগে তোমায় একটা প্রণাম ক'রে নিই। আমার এত চেষ্টা মরবার জন্য, কিন্তু মরতে পারছি কৈ? তুমি আমায় মারবে ব'লে এসেছ, এ তো বড় সুখের কথা।'

দস্যু অবাক হ'য়ে বলে, 'তোমাকে আর মারা হ'ল না। বল এ জ্ঞান তুমি কোথায় পেলে? আমিও তোমার পথই অনুসরণ করব।'

ভক্ত বলে' 'বেশ, চল, যে গুরুদেবের কাছে আমি এ জ্ঞান লাভ ক'রেছি তার কাছে নিয়ে যাই।'

ভক্ত, দস্যুকে তার গুরুর কাছে নিয়ে গেল। গুরুদেব দস্যুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাকে বুঝি সবাই ভয় করে এবং ঘৃণা করে?' দস্যু উত্তর দেয়, 'না, দেখলাম আমাকে কেউ ঘৃণা বা ভয় করে না। তারা ভয় করে আমার বৃত্তিকে।'

গুরুদেব বলেন, 'বেশ, তুমি আমার আশ্রমে কিছুদিন থাক।

একদিন শ্রীগুরুদেব আলোচনা সভায় শিষ্য ও ভক্তদের বলেন, 'দেখ! অপরাধ যদি কেউ ক'রে থাক, তবে সাজা ভোগের জন্যও তৈরী থেকো। অপরাধের সাজা তোমাদের ভোগ করতেই হবে, এর জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রোনা।'

এ কথা শুনে দস্যু গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে বলে, 'আমার পথ আমি পেয়ে গেছি, এবার চলি। আমার প্রাপ্য সাজা আমিই ভোগ করতে চাই।'

সত্য সত্যই সেই দস্যুর অঙ্গ কুষ্ঠ ব্যাধিতে পচে, গলে যেতে থাকে। দস্যু ভাবে, আমার দেহ পচে, গলে যাচ্ছে, এত সাজা ভোগ করছি, তা কি তিনি দেখেন না?

এমন সময় একদিন সেই গুরুদেব এসে বলেন, 'দেখ, ব্যাধি হ'লে চিকিৎসা আছে। রোগের মহৌষধ শ্রীগুরুদেবের কাছে

আছে। এবার তুমি গুরুকরণ কর, তবেই মহৌষধ পাবে।' দস্যু তখন তাঁর কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করে। গুরু বলেন, 'তোমায় এমন শৌর্য্য বীর্য্যপূর্ণ বীজমন্ত্ররূপ মহৌষধ দিলাম, বিধিমত সেটি পালন করলে, মন্ত্রের ক্ষমতায় তুমি আশ্চর্য্য ফল লাভ করবে।' দস্যু শ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করে, 'এই নাম মহৌষধিতে কি আমার গলিত দেহ পূর্ব্বরূপ ধারণ করবে ?'

শ্রীগুরুদেব উত্তর দেন, 'দেখ, তোমাকে যা বলছি, তাই কর। নাম জপ ক'রে যাও।'

শিষ্য বলে, 'বুঝেছি, সাজা ভোগ আমাকে করতেই হবে।'

সত্য সত্যই নাম জপ করতে করতে একদিন সে সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠে।

এ অবস্থাটি কিন্তু 'ত্রাহিমাং মধুসূদনের' মধ্যে পড়ে না, কেননা এখানে দস্যু তার কৃতকর্ম্মের সাজা ভোগ করতে একটুকুও পিছপা হয়নি। তাই শ্রীমাধবের উপদেশ হ'ল, 'কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় কর।' অর্থাৎ যদি দুষ্কর্ম্ম ক'রে থাক তবে সেই কর্ম্মের পরিণামে প্রাপ্য যে সাজা তাও তোমাকে ভোগ করতে হবে, যেমন চুরির দায়ে জেলখানায় আটক থেকে এবং নির্দ্ধারিত কর্ম্ম ক'রে চৌর্য্যকর্ম্মের সাজা ভোগ ক'রে কর্ম্মক্ষয় করতে হয়।

সাম্যজ্ঞানে 'ত্রাহিমাং' হ'ল ভগবানের বিশেষণ স্বরূপ অর্থাৎ 'তুমি ত্রাণকর্ত্তা।' অপরদিকে অজ্ঞানের ন্যায় তাকে ডাকা অর্থাৎ 'তুমি এসে ত্রাণ কর'—এ দুটির ভাব সম্পূর্ণ আলাদা। সাম্যজ্ঞানে ঈশ্বরকে ত্রাণকর্ত্তা বলার অর্থ হ'ল, সাধক তার নিজের জন্য তাঁকে ডাকছেন না, জগতের সবার মঙ্গলের জন্য অর্থাৎ জীবশিক্ষার জন্যই তাঁর এই আকুল প্রার্থনা।

শ্রীমাধব বলেন, কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মক্ষয় কথাটির অর্থ কি ? এবং হয়ই বা কি ক'রে ?

তিনি বলেন, "সুকর্ম্ম বা দুষ্কর্ম্ম উভয়ের ফলই সঞ্চিত থাকে। যে কর্ম্ম ক'রে দুর্ভোগে পড়েছ, কর্ম্মের দ্বারা সেই দুর্ভোগের কর্ম্ম ক্ষয় কর অর্থাৎ সেই কর্ম্মের সাজা অম্লানবদনে ভোগ কর। তুমি যদি মনে কর, একটা প্রাণী হত্যা ক'রে তারপর দানধ্যান ক'রে মুক্তি পাবে, তা কি হ'তে পারে? সেই অপরাধের সাজা কি এড়িয়ে যাওয়া যায়? ভোগ তোমাকে করতেই হবে।

সভায় এ কটি ছোট্ট প্রশ্ন উঠেছিল—অভ্যাসযোগ দ্বারা সম্যক্‌জ্ঞান আসে কি?

শ্রীমাধব বলেন, অভ্যাসযোগ দ্বারা সম্যক্‌জ্ঞান আসে একথা যেমন বলা যায় না, তেমনি অভ্যাসযোগ ছাড়াও সম্যক্‌জ্ঞানে পৌঁছান যায় না। অভ্যাসটিও একটি সংস্কার। সংস্কার হ'ল এক অর্থে নীতি; আবার জীবনপথে চলতে চলতে যখন কোন কিছু জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় তখনও তাকে সংস্কার করা হয়। সংস্কারের আর এক অর্থ হ'ল আচরণ। ক্ষেত্রবিশেষে সংস্কারের বিভিন্ন অর্থ হয়।

আমরা যে সংস্কার মুক্তির কথা ব'লি, সেটি হ'ল আচরণরূপ সংস্কার থেকে মুক্ত হবার কথা। সংস্কার বহু প্রকার, যথা বেদের সংস্কার। বেদবিহিত কর্ম্ম করতে গিয়ে কতকগুলো দেশাচার, স্ত্রী-আচার আমাদের মধ্যে প্রবেশ ক'রে গেছে, সেটি পূজাপার্ব্বণের সময় লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দেবদেবী ও বিভিন্ন পূজার সংস্কার পরিলক্ষিত হয়। ভয় ভীতির কারণে এ সকল সংস্কার থেকে আমরা সহজে মুক্ত হ'তে পারি না। তবে সর্ব্বদাই আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে আমরা সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে থেকে প্রসারিত মনে এই কর্ম্মময় জীবনকে ক্রমের পথে পরিচালনা করতে পারি। এইটিই আধ্যাত্মিক পথ।

সত্যের পথ এবং ক্রমের পথ
কি একই পথ নয়?

গত মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করেন, সত্যের পথ এবং ক্রমের পথ কি একই পথ নয়? কেউ যদি সংসার জীবনে সত্যের পথ বা ক্রমের পথ অনুসরণ ক'রে চলে, তাহ'লেও কি তার গুরুকরণ করা একান্ত প্রয়োজন?

প্রশ্ন আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমাধব বলেন সত্যের পথেই চল আর ক্রমের পথেই চল সবাই তোমাকে পৌঁছে দেবে তোমার সেই অভীষ্ট দেশে; তবে সেদেশে পৌঁছেও বাড়ী খুঁজে পেতে কষ্ট হয়। জাগতিক জগতে প্রতি বাড়ীরই একটি নির্দিষ্ট নম্বর থাকে এবং সেই নিশানা ধরে যে কারুর পক্ষেই বাড়ী খুঁজে পাওয়া কষ্টকর নয় কিন্তু ঈশ্বর-নিকেতন বা নিজ-নিকেতনের তেমন কোন নিশানা নেই। একটি বাণীতে বলেছি, 'মনোরথে শ্রীগুরুর দ্বারে পৌঁছে দেবে, আর জ্ঞানরথে তোমাকে পৌঁছে দেবে তাঁর ঘরে'। নিজ-নিকেতনে পৌঁছাতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন সেই জ্ঞান তোমায় দিতে পারেন একমাত্র শ্রীগুরুদেব।

জ্ঞান বহুধা। যেমন সংসার ক্ষেত্রে আমাদের যে জ্ঞানের প্রয়োজন, সে হ'ল স্বার্থের জ্ঞান বা অর্থের জ্ঞান। আধ্যাত্মিক পথে চাই ব্রহ্ম বা আরাধ্যের জ্ঞান, আর আত্মাকে জানতে হ'লে লাগে যোগপথের জ্ঞান। ভক্তিপথের জ্ঞান হ'ল—'তুমি প্রভু, আমি দাস'। আত্মদর্শন হ'লে যোগীর হয় যোগাযোগ জ্ঞান আর জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান। তিনটি এক হ'লেও উদ্দেশ্য বিভিন্ন। জড়জগৎ সম্বন্ধে যে বিশেষজ্ঞান তাকে বলা হয় বিজ্ঞান; আবার আধ্যাত্মজ্ঞানকেও বিজ্ঞান বলা হয়।

গুরু হ'লেন পিতা, পিতার নিকেতনই তো সন্তানেরও নিকেতন। পিতার নিকেতন, পিতা ছাড়া আর কে চেনাতে পারে? তাই বলেছি, সত্যের পথই বল, আর ক্রমের পথই বল, ঐ দেশে পৌঁছাতে পারবে; কিন্তু বাড়ী খুঁজে পাবে না।

শ্রীমাধব বলেন—জ্ঞান, ভক্তি বা যোগ যে কোন পথেই চল তাতে পথ উত্তীর্ণ হ'তে পারবে, কিন্তু নিজ নিকেতনের সন্ধান গুরু ভিন্ন কেউ দিতে পারেন না। জ্ঞানপথে চ'লে যদি তুমি ব্রহ্মে পৌঁছাতে চাও তবে ব্রহ্মের দেশে পৌঁছাবে ঠিকই কিন্তু সেদেশে গেলে শুনবে,—অন্ন ব্রহ্ম, জল ব্রহ্ম, সবই তো ব্রহ্ম, তুমি কোন্ ব্রহ্মে যেতে চাও'? তখন তোমার উত্তর কি হবে? এ সন্ধান গুরু ছাড়া আর কেউ দিতে পারেন না।

কেউ কেউ হয়তো বলে ঈশ্বর মানিনা—এই নিরীশ্বরবাদ সম্বন্ধেও আমাদের আলোচনা হ'য়েছে। যাঁর সীমা খুঁজে পাই না, তাঁকে আমরা বলি অসীম। ঈশ্বর অসীম, তাঁর তত্ত্ব অসীম, এ সমস্ত কথা শুনে আমাদের মত সাধারণ মানবমানবীর মনে ভীতির সঞ্চার হয এবং আমরা অধ্যাত্ম পথে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে দশ হাত পিছিয়ে যাই। প্রশ্ন উঠে, তবে কি তাঁর সীমা আছে? উত্তর হ'ল, ঈশ্বরকে না জানা পর্য্যন্ত তিনি অসীম। যে তাঁকে যতটুকু জানতে পারে, তার জানার সীমা ততটুকুই প্রসারিত। যদি প্রকৃষ্টভাবে এ বোধ তোমাদের আসে যে, তিনি সত্য এবং তোমরা প্রত্যেকেই তার সত্তা, তবেই তো হয়। এখানেও একটি সীমারেখা পড়ে যায়, কেননা যতক্ষণ তোমাদের অজ্ঞানতা রয়েছে ততক্ষণ তাঁর থেকে ভিন্ন বোধও আছে। এই অজ্ঞানতা কি রকম? এ হ'ল রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত অর্থাৎ অভিন্ন থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন বোধ। অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবৃত যে দেশ, সেখানে আছ ব'লেই ভিন্ন বোধ রয়েছে। অভিন্ন বোধ এলেই তাঁর কাছে যেতে পারবে।

অর্জ্জুনকে যে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখালেন—সেটি কি? তিনি দেখালেন, 'আমি সত্য আর তুমি আমারই সত্তা।' এ কথা গুরু ছাড়া আর কে বোঝাতে পারেন? তাঁকে প্রকৃষ্টভাবে জানার আগে যে জ্ঞান, তাকে বলে আগম জ্ঞান, আর আগম অতিক্রম ক'রে আসে নিগম জ্ঞান। এই আগম-নিগমের জ্ঞান একমাত্র গুরুই তাঁর শিষ্যকে দিতে পারেন।

গুরুকরণের প্রয়োজন প্রসঙ্গে শ্রীমাধব বলেন, গুরুকরণ না ক'রেও যদি কেউ কারো বাণী প্রকৃত নিষ্ঠার সহিত অনুশীলন করে, আর গুরুকরণের পরে যে গুরুবাণী অনুশীলন ক'রে চলে, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?

তিনি বলেন, কোন কুমারী মেয়ে বিবাহ না হ'য়েও যদি মনে মনে কাউকে স্বামীরূপে বরণ করে তার তো স্বামীর সঙ্গে মিলন হ'তে পারে না, যদি মিলন হয় তা হ'লেও তাকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, আর যার বিবাহ হ'য়েছে তার তো সামাজিক রীতি নীতি অনুসারেই স্বামীর সঙ্গে মিলনামিলন হ'য়েছে—দুয়ের মধ্যে এই হ'ল প্রভেদ।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমাধব বিরক্ত বৈষ্ণবের উল্লেখ করেন, অর্থাৎ সামাজিক স্বীকৃতি বিরক্ত বৈষ্ণবের নিকট অপ্রয়োজনীয়, তাঁরা এর কোন মূল্যই দেননা।

গুরু হ'লেন পরমস্বামী। কিন্তু যতক্ষণ তার কাছে দীক্ষিত না হ'চ্ছ অর্থাৎ বিবাহিত না হও ততক্ষণ তাঁর সঙ্গেও মিলন হ'তে পারে না। আনুষ্ঠানিক গুরুকরণ হ'ল সমাজসিদ্ধ। তবে শ্রীমাধবের মতে কেউ যদি কোন মহাপুরুষের বাণী বীজ মন্ত্ররূপে গ্রহণ করে সেই বাণী অনুকরণশীল হ'য়ে চলে তবে সেটাই হ'ল প্রকৃত গুরুকরণ। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া না হ'লেও চলে।

সত্যের পথ আর প্রেমের পথ, দুই-ই হ . প্রায় এক। কেউ বা

সত্যের নীতি আর কেউ বা ক্রমের নীতি নিয়ে জীবন পথে এগিয়ে চলে।

ক্রমের পথ হ'ল ব্যতিক্রমকে এড়িয়ে চলা। সত্যের পথে একটু ভীতি আছে, অর্থাৎ কোন কথা দিলে বা হঠাৎ মুখ দিয়ে কোন কথা বেরিয়ে গেলে সত্যরক্ষার জন্য সে কাজ করতেই হয় অন্যথা সত্যভঙ্গ হয়। শ্রীশ্রী ঠাকুরের জীবনে সেটি লক্ষ্য করা যায়। পায়খানায় যাবেন ব'লছেন অথচ পায়খানা পায়নি, তাও সত্যরক্ষা করতে গাড়ু নিয়ে তাঁকে যেতে হ'য়েছে। হৃদেকে বলেছেন, 'দূর শালা। তোর কাছে কথা দিয়ে ঠেকেছি, পায়খানায় না গেলে তো বলবি, মামা মিথ্যাকথা বলে।'

শ্রীমাধব বলেন, আমার মতে ক্রমের পথটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রকৃতপক্ষে সেটিই তো সত্যের পথ—এতে বিশেষ পার্থক্য নেই। ক্রমের পথে সৎ—অসৎ ব'লে কিছু নেই, সে শুধু বোঝে তার অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য, অন্য চিন্তা তার নেই। সত্যের পথে একটা ভয়ভীতি আছে, পাছে অসত্য কিছু হ'য়ে যায়—শুধু এইটুকু পার্থক্য।

যদিও আখেরে সত্যের পথ এবং ক্রমের পথ একই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়, তাও এই দুই পথের মধ্যে সামান্য একটু তফাৎ আছে। সেটি হল সত্যের পথে পড়ে যাবার ভয় আছে, ক্রমের পথে সে ভয় নেই। এটা কিরকম জান? পথের মাঝখান দিয়ে হাঁটলে যেমন পড়ে যাবার ভয় থাকে না কিন্তু কিনারা দিয়ে যেতে হ'লে সে ভয় থাকে, এও সেই রকম। ক্রমের পথে যে চলে, সত্যের দিকে তার লক্ষ্য নেই, ক্রমটাই তার লক্ষ্যবস্তু, আর সত্য পথের পথিকের মূল লক্ষ্য হ'ল সত্য, তাই তাকে হাজারো পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হয়। আর ক্রম লক্ষ্য ক'রে যে পথিক পথ চলে, পথের শেষে সেও কিন্তু সেই একই সত্যে মিশে যায়।

শ্রীমাধব বলেন, সত্যপথে চলার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হ'ল,

অসৎ যে আমি, সেই আমার মধ্যে সত্যকে জাগ্রত ক'রে তোলার জন্যই আমি সৎ পথে চলি।

ঈশ্বর বলেছেন, 'আমিই ধর্ম্ম আবার আমিই অধর্ম্ম—একথা ঠিক, তবু অধর্ম্মের পথ ছেড়ে তুমি ধর্ম্মপথ অবলম্বন কর। আমিই সৎ আবার আমিই অসৎ; সৎ ও অসৎকে পাশাপাশি রাখবে কারণ হ'ল অসৎ পাশে না থাকলে সৎ এর গুণাগুণ দিবালোকের মত স্পষ্ট হ'য়ে উঠে না, সৎ এর প্রকৃত মানরক্ষা হয় না। আমিই দিন, আবার আমিই রাত্রির গাঢ় অন্ধকার। মায়া অন্ধকারে নিমজ্জিত আছ ব'লেই তোমাদের চারিদিকে ঘোর অমানিশা। সেই অন্ধকারে যে তুমি নিজেকেও দেখতে পাও না। ক্রমের পথে জীবন পরিচালনা করতে পারলে মনুষ্যত্ব জাগ্রত হবে। মানবিকতার উৎকর্ষ সাধনে নূতন যুগের ভোরের আলোকে তুমি নিজেকেও দেখতে পাবে, আমাকেও দেখবে।'

শ্রীমাধব বলেন, আমি যে কথা বলি, যে উপদেশ নির্দ্দেশ দিই সেটি শুনতে যত সহজ মনে হয় কর্ম্মক্ষেত্রে তা নয়। কর্ম্মে সেটি অনুশীলন করা বড় কঠিন কেননা এভাবে চ'লে তো তোমরা কেউ অভ্যস্ত নও। আর বাবাঠাকুররা বা সাধু সন্ন্যাসীরা যা বলেন তাতে তোমরা সবাই অভ্যস্ত, তাই সেটা সহজ মনে হয়। যেমন তাঁরা বলেন, 'জপ বাড়িয়ে যাও - তবেই হবে।' এটি সহজ কাজ, তাই নয় কি?

দেবতার অস্তিত্ব

গত মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈকা ভক্ত প্রশ্ন করেন—দেবতাদের কি সত্যিই কোন অস্তিত্ব আছে?

প্রশ্নের সমাধান দিতে গিয়ে শ্রীমাধব বলেন, দেবতাদের সম্বন্ধে নিগূঢ়ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে পুরাকালের মুণিঋষিগণ যে সমস্ত বিষয়বস্তু বা কার্য্যকারণের ভিত্তিতে নির্ভর ক'রে দেবতাদের রূপদান ক'রেছেন, সেই বিষয়বস্তু বা কার্য্যকারণকে আমরা ভুলে গিয়ে কেবল রূপটিকে নিয়েই মস্‌গুল আছি। যেমন স্বর বা ধ্বনির উপর নির্ভর ক'রে মুণিঋষিগণ স্বর বা ধ্বনির অধিদেবীকে নামকরণ ক'রেছিলেন মহাসরস্বতী। প্রকৃতপক্ষে সরস্বতীর অস্তিত্ব হ'ল বিদ্যা, বাণী বা ধ্বনি। আবার দেখ, শস্য বা খাদ্যের উপর লক্ষ্য রেখেই সেই লক্ষীভূত খাদ্যের অধিদেবীর নাম হ'য়েছে লক্ষ্মী, কেননা জন্ম-মুহূর্ত্ত থেকে খাদ্যের উপর লক্ষ্য আছে ব'লেই না বেঁচে আছ। সেই খাদ্যের নির্য্যাস থেকেই হয় মগজের পরিপোষণ। আবার দেখ, সৃষ্টিতত্ত্বের আদি উৎস হ'ল বীর্য্য। বিষ্ ধাতু ষ্ণ্য প্রত্যয় ক'রে তাঁর নামকরণ হ'ল বিষ্ণু। খাদ্যে হ'ল সত্তা আর সেই আদি উৎসই হ'ল সত্য। তাই সত্তা ও সত্যের নামকরণ হ'য়েছে লক্ষ্মীনারায়ণ। প্রশ্ন উঠেছিল নারায়ণলক্ষ্মী না ব'লে লক্ষ্মীনারায়ণ বলার উদ্দেশ্য কি? শ্রীমাধব উত্তর দেন, দেখ, আগে লক্ষ্মীর নাম বলার কারণ হ'ল, আগে খাদ্য খাই, সেই, খাদ্যের নির্য্যাস থেকে একে একে, রক্ত, মাংস, মজ্জা, অস্থি, বীর্য্য ইত্যাদি সৃষ্টি হ'চ্ছে; তাই বীর্য্যের অধিদেবতা বিষ্ণু আসেন ক্ষেত্র তৈরী হবার পরে এবং খাদ্যের অধিদেবী লক্ষ্মীই প্রথমে ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে বিষ্ণুর সঙ্গে যুক্ত হন, তাই তাঁর নামটিই প্রথমে উচ্চারিত হয়।

সত্যের যখন প্রকাশ বিকাশ হয়, সেখানে সত্তা তো গড়হাজির হ'তে পারে না, কেননা সত্তার মাধ্যমেই তো সত্য নিজেকে প্রকাশ করেন। শ্রীমাধব বলেন, আজ এখানকার আলোচনায় যে সত্য প্রকাশ হ'চ্ছে, সেই সত্যের আকর্ষণেই তুমি সত্তা এখানে এসে হাজির হ'য়েছে, এ যেন চুম্বকের আকর্ষণে চারিদিকের সব লোহা

যেমন একত্রিত হয় তেমনি। প্রকারান্তরে সত্যের চুম্বকরূপ আকর্ষণই তোমায় টেনে এনেছে। আবার তাঁরই কর্ষণশক্তি দ্বারা সত্যের বীজ কর্ষিত হ'য়ে যে বিভিন্ন ফলের সৃষ্টি হয় তাহাই সত্যের সত্তা।

তাই ব'লেছি, একই মাটির রসে বীজের তারতম্য অনুযায়ী সেই গাছের ক্রিয়া, কারণ ও গুণ ভিন্ন ভিন্ন রস আস্বাদন করাচ্ছে।

ঈশ্বর বলছেন, জগতে যে তোমরা অগুন্তি দেবদেবী দর্শন কর সে সব তো আমারই রূপ, তোমরা তাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখছ। খেজুর গাছ রূপে যে আমি, তার আস্বাদন তোমাদের কাছে মিষ্টি আবার তেঁতুল গাছ রূপে যে আমি, তার স্বাদ টক।

ব্রহ্ম থেকে ওঁ ধ্বনি বিচ্ছুরিত হ'য়ে আশ্রয় নেয় মহাব্যোমে। মুণিঋষিগণ সেই শব্দ বা ধ্বনির গতিপথকে ধ'রে রেখে তদনুযায়ী মন্ত্র প্রকাশ ক'রেছেন।

ওঁ উচ্চারণ করলে তার মধ্যে ব্রহ্মের গুণ ও ক্রিয়া প্রকাশ পায়। আবার ও যখন হ্রীংময় হয় তখন তার ক্রিয়ারূপ গুণটী হ'ল ধারণ শক্তি, তাই এই হ্রীং শব্দটী হ'ল মহাশক্তির বীজ। ওঁ এবং হ্রীং যুক্ত হ'য়ে যে শব্দ হ'ল সেটি তাঁর গুণময় অবস্থা। আদি শব্দ হ'ল ওঁ, সেই আদি এবং অদ্বিতীয় এক শব্দ থেকেই নানা শব্দের প্রকাশ।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমাধব বলেন, যেমন তুমি গোপালের আরাধনা কর, তখন তোমাকে কেউ যদি শক্তি বীজ দেয়, তা কি তুমি সহ্য করতে পারবে?

সভায় প্রশ্ন উঠেছিল শিশুকাল থেকে শুরু করলে যে কোন বীজমন্ত্রই তো গ্রহণীয় হ'তে পারে?

এ কথার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত না হ'লে কারুরই মন্ত্র নেবার অধিকার নেই কেননা, পূর্ণবয়স্ক না হ'লে পুরুষক্ষেত্রে বীর্য্য এবং নারীক্ষেত্রে রজঃ সৃষ্টি হয় না এবং তাতে উভয়ের মিলনা-মিলনে প্রাণ সৃষ্টি হওয়াও সম্ভব নয়! সৃষ্টির কারণে যেমন পুরুষের

সৃষ্টিশক্তি এবং নারীর ধারণশক্তি অর্জ্জন করা আবশ্যক তেমনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত না হ'লে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করা চলেনা।

আগেকার দিনে আমাদের দেশে গৌরীদান প্রথা প্রচলিত ছিল অর্থাৎ অতি শিশুকালেই কন্যার বিবাহ দেওয়া হ'ত কিন্তু তাহ'লেও পূর্ণবয়স্কা না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রী স্বামীর ঘর করতে যেত না, বাপ মায়ের কাছেই থাকত। গুরুও তো স্বামী তাই পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত না হ'লে দীক্ষা গ্রহণই বা করবে কি ক'রে?

মহাপ্রভু অবশ্য বিধান দিয়েছেন যে, দীক্ষা নেবার ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং আগ্রহ থাকলে পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হবার আগেও দীক্ষা দান করা চলে তবে সেটি সম্পূর্ণ নির্ভর করবে শ্রীগুরুর উপর। তিনি যদি মনে করেন, 'জপিতে জপিতে নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম' তবেই তিনি তাকে দীক্ষা দেবেন।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীমাধব বলেন, এই জগতে নয়টি গ্রহ এবং বহু উপগ্রহ আছে। আটটি গ্রহ থেকে যা কিছু বার্য অর্থাৎ ধাতু ঝরে পড়ছে তা ধারণ করছে নবম গ্রহ এই পৃথিবী; কেননা একমাত্র পৃথিবীরই এই ধারণ শক্তি আছে তাই প্রাণীর সৃষ্টিও হয় এই পৃথিবীতে। অন্য গ্রহদের এই ধারণ শক্তি আছে কিনা তা আজও ধরা পড়েনি। পৃথিবীর অবস্থান গুণে এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে অন্যান্য গ্রহের যা কিছু রেশ বা বীর্য সে সবই ঝরে পড়ে এই পৃথিবীতে। যে সকল বীর্য্য পৃথিবীতে স্থান পায় তার মধ্যে মূল বীর্য হ'ল সূর্য্যের বীর্য্য কেননা, প্রাণী সকলের জীবন ধারণ এবং খাদ্যের উৎস হ'ল সূর্য্য।

সভায় আর একটি প্রশ্ন ছিল—আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর কারণে চুল দাড়ি রেখে যে অশৌচ পালন হয়, এটি অন্ধসংস্কারের পর্য্যায়ে পড়ে। অন্ধসংস্কার জেনেও এটি পালন করা হয় কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, দশটি সংস্কার রক্ষা করতে গিয়ে যদি একটি অন্ধসংস্কার মেনে চলতে হয়, তাহ'লে সেটি ক্ষতিকারক নয়। একটি অন্ধসংস্কারকে ছাড়তে গিয়ে যদি দশটি সুসংস্কার ছাড়তে হয় তবে সেটি উত্তরপুরুষের এবং সম জেব পক্ষে বিপদ ডেকে আনবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমাধব একটি গল্প বলেন।

শ্রীকুমুদানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে এক ভদ্রলোক গিয়ে বলে, 'দীক্ষা তো নিলাম, এখন আমার চলার পথ সম্বন্ধে আপনি কি নির্দেশ দেন? ব্রহ্মচারী বলেন, 'সংস্কার মুক্ত হ'য়ে কর্ম কর, তাহ'লেই আনন্দ পাবে।' ভদ্রলোক বাড়ী গিয়ে একমাত্র গুরুদেবের ফটো ছাড়া আর সব দেবদেবীর ফটো ফেলে দেন।

স্ত্রী বলে, 'এ কি করলে?'

ভদ্রলোক উত্তর দেন, 'ঠাকুর বলেছেন, সংস্কার মুক্ত না হলে কিছু হবে না।'

স্ত্রী বলে, 'ঠাকুরকে ফুল জল না দিয়ে আমি ত কিছু গ্রহণ করি না, আমি কিছু খাব না।'

তখন স্বামী স্ত্রী উভয়ে গিয়ে গুরুদেবের শরণাপন্ন হয়। গুরুদেব বলেন, 'তোরা দেখছি দুজনেই পাগল। সংস্কার দুরকম, একটি সাধারণ ও একটি অসাধারণ সংস্কার। ছোঁয়াচে রোগগুলো তোদের ছেড়ে দিতে হবে। ভগবান দিতে দিতেই একদিন বুঝতে পারবি প্রকৃতপক্ষে কোন্‌টা সংস্কার। তোদের অন্তঃসংস্কার যা আছে তা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে শুদ্ধ সংস্কারে পূজা কর। বাইরে যা কিছু দেখছিস্‌ যথা ফুল, বেলপাতা, তুলসী ইত্যাদি তা সবই আমাদের অন্তরেও আছে। এসব খুঁজে বের করাও সংস্কার। সেই সংস্কার যে খুঁজে বের করতে পারে, সে অন্তরানুভূতির উপলব্ধ দৃষ্টিতে তাঁকে অনুভব করে। একেই বলে মানসোপচারে পূজা। তোরা যা করছিস্‌ সেটা তো বাইরের সংস্কার, এই ছোঁয়াচে রোগটিকে বাদ

দিতে হবে।' গুরুদেবের এই উপদেশে স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব মিটে যায়।'

সভায় প্রশ্ন উঠেছিল, কেউ কেউ যে তেত্রিশ কোটি দেবতা সাজিয়ে পূজা করে তার অর্থ কি ?

শ্রীমাধব বলেন, যাদের মধ্যে কেবল চাই চাই বৃত্তি, তারা ভাবে কোথায় গেলে কি পাই, সেই কারণে পর পর দেবতা সাজিয়ে যায়।

শ্রীমাধব বলেন, গুরুসম্প্রদায়ের উচিত তাঁদের শিষ্যদের এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, গুরু ভিন্ন আর কিছু নেই, গুরুই সব।
সকল মহাপুরুষ এবং দেবতাদেরই শ্রদ্ধা করা উচিত কিন্তু গুরু করণের পর অন্তরে সর্ব্বদাই এ ভাব থাকবে যে গুরুই সবার উপরে, তাঁর কোলেই তোমার স্থান, তাঁর কোলে বসেই অন্যান্য দেবতাদের দর্শণ করতে হবে। আমি তো আমার শিষ্যদের সর্ব্বদা এ উপদেশই দিয়ে থাকি যে, গুরুপূজাই সবার আগে। সেই কারণেই হয়তো আমার শিষ্যদের বাড়ীতে গুরু ভিন্ন অন্য দেবতার ছবিও নেই; এমনকি লক্ষ্মীপূজাও উঠে গেছে।

শ্রীমাধব বলেন, উপলব্ধিই হ'ল মূল কথা। উপলব্ধিরও একটা দৃষ্টি আছে, সেই দৃষ্টিতেই অন্তরের অনুভূতি সুদৃঢ় হয়।

গুরু সঙ্গ, সাধু সঙ্গ, সৎ সঙ্গ ও মহাপুরুষ সঙ্গ করতে করতেই তাঁকে জানা এবং বোঝা যায়, তাতেই আনন্দও পাওয়া যায়।

গুরু কল্পতরু, সেই বৃক্ষের ছায়ায় এলে কারুর বাঞ্ছাই অপূর্ণ থাকে না। আমাদের দেহ এক একটি পাত্র বিশেষ, এই পাত্রের মাধ্যমে কল্পতরু যার যার নিত্য সত্য কামনা পূরণ করেন। কল্পবৃক্ষের ফল কখনও গাছ থেকে খসে মাটিতে পড়ে না তাই অনুভূতিহীন কোন প্রাণীর পক্ষে সেটি নাগালের বাইরে। গাছের ফল গাছেই থাকে, সেই গাছের সঙ্গে একাত্মতা বোধ এলে, তবেই ঐ গাছের রস আস্বাদন করা যায়।

যে ফল ঝরে পড়ে যায়, সে তো হ'ল কাম ও কামনার ফল।

শ্রীমাধব উপদেশ দেন, 'গুরু কল্পতরুর কাছে শিষ্যরূপ নৌকোর হালটি একবার ছেড়ে দিয়ে তোর যা খুসী কর না। করতে গিয়ে দেখ্, কি খুসী, কিসে খুসী।' এ কথার অর্থ হ'ল গুরুই তাঁর শিষ্যকে পরিচালনা করেন তাই বিপথে যাবার ভয়তো আর থাকে না। শ্রীমাধব বলেন, দেবদেবী সবারই অস্তিত্ব আছে তবে সে অস্তিত্বের স্বরূপ আমাদের জানা নেই, যিনি প্রকৃষ্ট ভাবে সে খবর জানেন তাঁর কাছে গিয়ে সেটি জেনে নিতে হয়। কোন দেবতাই উপেক্ষিত নন, কেননা যে নামেই তুমি ভজনা কর না কেন, এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কাছেই সে সেবা পূজা ও ভজনা পৌঁছাবে।

শ্রীমাধব বলেন, কেউ কেউ প্রশ্ন করে তাঁকে লাভ করবার সহজ পথ কি?

তাঁর উত্তরে বলি, 'ন্যায়শাস্ত্রে বলে সহজ পথ যারা খুঁজে বেড়ায় তারা সুবিধাবাদী। আর ভক্তিশাস্ত্রে বলে, না, তারা সুবিধাবাদী নয়। সহজ পথটি কি তা ভক্তি পথে গেলেই জানতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে যার যে পথ জানা আছে, তার কাছে সেই পথই সহজ পথ।'

ঈশ্বর বলেছেন, 'সব পথই আমার পথ। যে পথ তোমার কাছে সহজ লাগে সেই পথেই এগিয়ে যাও, সব পথইতো আমাতে এসে মিশেছে।'

শ্রীমাধব বলেন, পুরাকালে মনীষীরা যা বলে গেছেন সে সবই সত্য, কিন্তু আমাদের মত পণ্ডিতেরা ভাষার অলঙ্কারে তাকে সাজিয়ে এমন পর্যায়ে এনেছে যে আসল সত্য ঢাকা পড়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত গীতার প্রতি আমাদের ভক্তি প্রদর্শনের নমুনা হ'ল গীতায় চন্দন লেপন করা এবং মৃত্যুর পরে মরদেহে একখানা গীতা স্থাপন করা। প্রকৃতপক্ষে গীতা কি এ জন্য বা গীতার মানমর্যাদা কি

এভাবে দেওয়া যায়? গীতার উপদেশ নির্দ্দেশ প্রকৃষ্টভাবে আমরা ক'জন পালন করি?

'গুরুবাণী অনুকরণশীল হও'

গত মঙ্গলবার শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈকা ভক্ত প্রশ্ন করেন, 'আপনি সর্ব্বদা শিষ্যভক্তদের উপদেশ দেন, গুরুবাক্য অনুকরণশীল হও; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অনেক সময়ই অনেক জায়গায় দেখা যায় শিষ্য গুরুদেবের চলন, বলন, পোষাক পরিচ্ছদ অনুকরণ ক'রে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, সেখানে কোন আদর্শ বা গাম্ভীর্য্যের বালাই নেই, এ যেন গুরু নিয়ে খেলা। গুরুবাক্য অনুকরণশীলতার প্রকৃত অর্থ তবে কি? আলোচনা সভায় এ সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাতের প্রার্থনা জানাই'।

প্রশ্নের সূত্র ধ'রে শ্রীমাধব বলেন, 'গুরুবাণী অনুকরণশীল হও, এই ছোট্ট কথাটির তাৎপর্য্য কি? গহন অন্তরে এ প্রশ্ন কি উঠে না, যে গুরুবাণী কার জন্য? উত্তরে এ কথাও বলা যায় গুরুবাণী সারা বিশ্ববাসীর জন্য, শুধু শিষ্যের জন্য তো নয়! সেই গুরুবাণীতে কি আছে? গুরুর আদর্শই গুরুবাণীতে রূপ গ্রহণ করে, বাণীই গুরুদেবের আদর্শ। গুরুদেবের বাণীতে একথাই প্রকাশ পায় যে, তোমরা মানবমানবীগণ এই বাণীরূপ ধ্বনি শ্রবণ ক'রে আদর্শবান হও, কেননা মানবমানবীর সারা জীবনের প্রচেষ্টা হ'ল, কি ক'রে সে আদর্শে পৌঁছাতে পারে। আদর্শটি কি? ন্যায় ধর্ম্মই হ'ল মানুষের ধর্ম্ম, কাজেই প্রত্যেক বিশ্ববাসীকেই ন্যায়ধর্ম্ম পরায়ণ হ'তে হবে এটিই তার জীবনের আদর্শ।

গুরুদেব তাঁর বাণীর মাধ্যমে এই শিক্ষাই অনুক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন যে মানুষ হ'য়ে অন্যধর্ম্ম তোমরা গ্রহণ ক'রো না। সেই কারণেই গীতায় আছে 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম্ম ভয়াবহ'। এই স্বধর্ম্মই হ'ল ন্যায়ধর্ম্ম। ন্যায়ধর্ম্মের আদর্শ হ'ল মানুষকে মানুষ হ'য়ে গড়ে উঠার শিক্ষা দেওয়া। সেই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হ'য়েছ ব'লেই তোমরা গুরু-সন্নিধানে যাও। 'গুরুবাণী অনুকরণশীল' বলতে তাঁর চলন, বলন, পোষাক পরিচ্ছদ, হাবভাব অনুকরণ করা নয়। গুরু যদি কাউকে স্ব-ইচ্ছায় নিজ বেশে সাজান সেটি স্বতন্ত্র কথা কিন্তু কেউ যদি নিজে সেই বেশে সাজে তবে সেটা গুরু গুরু খেলাই বটে।

শ্রীমাধব একটি সরল উপমার সাহায্যে কথাটির ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, চিন্তা ক'রে দেখ, পাখী যখন বাসা বাঁধে তখন সেখানে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় কত খড়কুটোই তো এনে জমা করে, কেননা বাসাটি মজবুত ক'রে গড়ে তোলাই যে তার মূল উদ্দেশ্য। খড়কুটো বেছে ফেলতে গেলে বাসাই যে ভেঙ্গে যাবে, তেমনি একটি সমাবেশেও ঐরকম খড়কুটো বাছতে গেলে হয়তো সেই সমাবেশই নষ্ট হ'য়ে যায় তাই খড়কুটোর দিকে সদা সর্ব্বদা লক্ষ্য দিলে চলেনা।

শ্রীমাধব বলেন, এখানে প্রশ্নের মূল কথা হ'ল গুরুবাণী অনুকরণশীল হও' এ কথার তাৎপর্য কি?

গুরু এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর ইচ্ছা, তাঁর আদর্শ হ'ল, প্রত্যেক বিশ্ববাসীই যেন আদর্শবান হয়। আদর্শ বলতে একথাই বুঝতে হবে যে, যে বাণীর অনুশীলনে মানব-অন্তরের অন্ধকার দূর হ'য়ে আলো প্রজ্জ্বলিত হয় সেই বাণীই আদর্শ—সেই বাণীই অক্ষয়, চিরন্তন, অপরিবর্ত্তনীয়। আমরা প্রত্যেকে যাতে আদর্শবান হ'তে পারি তার জন্য চাই ন্যায়নীতি, চরিত্র ও ক্রমের পথ অনুসরণ করা। গুরুবাণী অনুশীলনে জগতে যত কিছু ভাল, যা কিছু শ্রেষ্ঠ সে সবই যেন

আমাদের মধ্যে জাগ্রত হ'তে পারে, আমাদের মানবিকতার আদর্শকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে।

শ্রীমাধব বলেন, একজন লেখাপড়া শিখলে তার সঙ্গগুণে অপরের মধ্যেও যেমন তা বিচ্ছুরিত হয় তেমনি এই মানবিকতার আদর্শ ক্রমে ক্রমে সারাবিশ্বে বিচ্ছুরিত হ'য়ে জগতময় আলোড়নের সৃষ্টি করবে।

শ্রীমাধব বলেন, 'আদর্শ এক অথচ সেই আদর্শে পৌঁছে দেবার জন্য কত রকমের বাণী প্রয়োগ করতে হ'চ্ছে। এই যে কত ভাবে কত কথা ব'লে যাচ্ছি তার মূলে কিন্তু সেই একই কথা, 'আদর্শবান হও'। এই আদর্শের জন্যই তো সারাজীবন বক্‌বক্ ক'রে যাচ্ছি কিন্তু তা সত্বেও যদি কেউ আদর্শবান হ'তে না পারে তবে সে দুঃখ যে আমারই সবচাইতে বেশী ক'রে বাজবে'।

গুরুবাণী তাকেই বলে যে বাণী অনুকরণ করার ফলে মানবমানবীর মধ্যে আদর্শের উজ্জ্বল জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। আদর্শের এমনি গুণ যে, তাতে মান, অভিমান, অহঙ্কার সব চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যায়। আর তোমরা যদি ভুল বুঝে সেই বাণী সামনে ধ'রে একটা কিছু সাজো তাতে অভিমান, অহঙ্কার দূর না হ'য়ে ক্রমশঃ বেড়েই চলে। সাজসজ্জার মধ্যে আছে কৃত্রিমতা, কাজেই তার অস্তিত্ব কতটুকু! তাই সাজলে, সাজা পেতে হয়।

তাহ'লে শেষ পর্যান্ত একথাই বলা যায় যে, যে বাণীতে মানব-মানবীকে আদর্শবান করায় সেই বাণীই হ'ল সমস্ত আদর্শের বীজস্বরূপ এবং সেটি প্রকৃতপক্ষে গুরুদেবের মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী।

শ্রীমাধব বলেন, একবার চিন্তা ক'রে দেখ গুরুবাণী কত মহান, কত শ্রেষ্ঠ। নিজের মনকে নিজেই প্রশ্ন ক'রে দেখ, গুরু কে?

একমাত্র তিনিই হ'লেন গুরু যিনি অনন্ত বিশ্ব হ'তেও বড়। অনন্ত এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা হ'য়েও যিনি নিজ মাহিমা গুণে সারা

বিশ্বের প্রতিটি অনুপরমাণুতে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত; তিনিই তো একমাত্র গুরু। তিনি যে অন্ধের যষ্ঠি, আঁধারের দীপশিখা, অজ্ঞানের জ্ঞানালোক এবং তিনিই তো দেহোপযোগী দেহের মাধ্যমে গুরুরূপে নিজ নামমন্ত্র বীজরূপে কর্ণে প্রদাণ করেন, যার অনুশীলনে শিষ্য হ'য়ে উঠবে আদর্শবান। কাজেই প্রকৃতপক্ষে যে গুরুবাণীকে অন্তর থেকে অনুশীলন করে না, গুরুদেবের বাহ্যিক চলন, বলন, পোষাক পরিচ্ছেদকেই বড় ক'রে দেখে এবং অনুকরণ করে সে গুরু নিয়ে খেলাই করে বটে, কারণ সে যে গুরুবাণীর যথার্থ অর্থ অনুভব করে না। গুরুকে নিয়ে খেলা ক'রেই তারা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

শ্রীমাধব বলেন, গুরুকে খেলার সাথী কর তাতে কোন ক্ষতি নেই, তবে গুরু যেন খেলার বস্তু বা বিষয় না হন। গুরুকে খেলার সাথী করার অর্থ হ'ল গুরুবাণী অনুকরণশীল হ'য়ে আদর্শের দিকে এগিয়ে যাওয়া, আর গুরুকে খেলার বস্তু বা বিষয় করাই হ'ল গুরু নিয়ে খেলা। যে সকল মানবমানবী গুরুবাণীর যথার্থ অর্থ অনুধাবন করতে পারে তারা কখনও গুরুকে খেলার বস্তু করে না।

পাখী যেমন প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সব খড়কুটোই সংগ্রহ করে বাসা বাঁধবার জন্য কিন্তু তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'ল ডিম পাড়া, গুরুদেবও তেমনি বাছবিচার না ক'রে সকল মানবমানবীকে নিয়েই সমাবেশ তৈরী করেন কিন্তু তাঁর আসল লক্ষ্য থাকে বাণীরূপ ডিম পাড়ার দিকে। খড়কুটো বাছতে গেলে যেমন পাখীর বাসাটি আর থাকে না তেমনি ভালমন্দ লোক বাছতে গেলে শ্রীগুরুদেব যে পরিবেশটি তৈরী ক'রেছেন সেটিও ভেঙ্গে যেতে পারে। আবার চিন্তা করলে দেখা যায় যিনি মহান, আপামর জনসাধারণকে আশ্রয় দেওয়াই যে তাঁর রীতি।

আপামর জনসাধারণের মধ্যে গুরুদেব যে আদর্শের বাণী প্রচার

ও প্রয়োগ করেন, পরস্পরের সহযোগিতায় একদিন না একদিন সে বাণী সফল হ'য়ে উঠে। পরস্পরের সহযোগিতায় যে তাপ সৃষ্টি হয় সেই তাপেই বাণীরূপ ডিম ফোটে।

পাখীর ডিম যখন ফোটে তখন আর পাখীর প্রয়োজন থাকে না। ডিম যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ খড়কুটোই ডিমকে রক্ষা করে। পাখী যখন দেখে যে বাসাটি ডিম পাড়বার মত মজবুত হ'য়েছে তখনই সে ডিম পাড়ে অর্থাৎ ডিম রক্ষা করার মত শক্তি যখন খড়কুটোর আসে তখন পাখী ডিম পাড়ে। গুরুর ক্ষেত্রেও সেইরকম। খড়কুটোর মত আপামর জনসাধারণই গুরুদেবের বাণীরূপ ডিমকে রক্ষা ক'রে থাকে। বাসার শক্তি অনুযায়ী শ্রীগুরুদেবও তাঁর বাণীরূপ ডিম পাড়েন। কাজেই সকল প্রকার মানবমানবীই গুরুদেবের বাণীকে নিজ শক্তিদ্বারা অনুশীলন ক'রে আদর্শের পথে এগিয়ে যেতে পারে।

মধুমঙ্গল ও চিত্রাসখী

গত মঙ্গলধামে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় প্রায় সকল শ্রোতাই প্রশ্ন উত্থাপনের ব্যাপারে নিস্পৃহ ছিলেন। এই নিস্পৃহতার কারণে শ্রীমাধব নিজেই একটি তত্ত্বপূর্ণ সরস কাহিনীর অবতারণা করেন। কাহিনীটি এইরূপ—

রাজার নাম সামন্ত এবং তাঁর একমাত্র সুশিক্ষিত পুত্র হ'ল সুমন্ত। লেখাপড়া যখন সমাপ্ত হ'য়েছে তখন পুত্রের মনে এই বুদ্ধি জাগে যে, সংসারে এলে সংসারের ন্যায় নিষ্ঠার মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সম্ভব তা যদি অপূর্ণ থাকে তবে সে ব্যক্তির জীবনও অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আদরে লালিত পালিত একমাত্র পুত্রকে রাজা দূরদেশে যাত্রা বা কোন ভয়াবহ কর্ম্মে ও চিন্তান্বিত কর্ম্মে ব্রতী হ'তে বা বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী যেতে দিতেন না।

একদিন পুত্র পিতাকে প্রশ্ন করে, 'বাবা! আমার মধ্যে তো সর্ব্বপ্রকার শক্তিরই সমাবেশ আছে, তাই না?'

পিতা বলেন, 'আজ তোমার মনে কেন এ প্রশ্ন জেগেছে?' পুত্র উত্তর দেয়, 'আমার ইচ্ছা শিকার করতে যাই। হরিণ শিকার করতে গেলে শিকারীর মনে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটে তা আমাকে জানতে হবে।'

পিতা ভীতচকিত কণ্ঠে বলে উঠেন, 'সে হয়না বাবা, শিকার যদি সম্মুখে আসে শিকারী তখন নিজেকে ভুলে গিয়ে শিকারের পিছনে ছোটে, এ অভিজ্ঞতা আমার আছে। তেমনি আবার যারা ঈশ্বরকে চায় তারাও নিজেকে ভুলে ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রে পাগল হ'য়ে উঠে।'

পুত্র পিতার সঙ্গে একমত হ'তে পারে না, বলে, আমাকে যে যেতেই হবে বাবা, তুমি তো আমার সব জেদই পূর্ণ কর, এটা অবশ্য আমার জেদ নয়, একে আমি মানবতার আদর্শ ব'লে মনে করি।'

পিতা বলেন, 'জগতে এত কিছু থাকতে, এই অভিজ্ঞতা লাভের, আগ্রহই বা তোমার মনে জাগল কেন, তাই ভাবছি।'

পুত্র বলে, 'আমার এ ইচ্ছায় তুমি বাদ সেধনা বাবা, অনুমতি দাও।'

উপায়ান্তর না দেখে পিতা বলেন, 'দেখ, তোমার মা অনুমতি দেন কিনা।'

মায়ের কাছে গিয়ে সুমন্ত আব্দার ক'রে বলে, 'মা! আমার যে বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে কিছু খেতে দাও।'

মা দুটি নাড়ু হাতে তুলে দেন।

গল্পচ্ছলে সুমন্ত মাকে বলে, 'মা! তোমার ছেলে যদি শ্রেষ্ঠ বীর হয় তবে কি তোমার আনন্দ হয় না?'

মা খুসী হ'য়ে বলেন 'হ্যাঁ বাবা, নিশ্চয়ই হয়।'

সুমন্ত আবার বলে, 'তোমার ছেলে যদি শ্রেষ্ঠ বিদ্বান হয় তবে কি আনন্দ হয় না?'

মা বলেন, 'হ্যাঁ, হয় বৈকি।'

এবার সুমন্ত আসল কথা পাড়ে, 'আচ্ছা মাগো, তোমার ছেলে যদি শ্রেষ্ঠ শিকারী হয় তবে তোমার আনন্দ হয় না?' মা চমকে উঠে বলেন, 'ওরে বাবা! ওকথা বলিস না। শিকারী হবি কিরে? শিকার করতে গিয়ে যদি বাঘ ভাল্লুকে তোকে খেয়ে ফেলে, তখন আমি তোকে কোথায় পাব?'

সুমন্ত কাঁদতে থাকে, বলে, 'আমাকে যে যেতেই হবে মা, তুমি বাধা দিও না, অনুমতি দাও মাগো।' ছেলের কান্না দেখে মা নরম হ'য়ে বলেন, 'বেশ তো, যদি যাবিই, তবে হাতী ঘোড়া লোকজন সঙ্গে নিয়ে যা।'

এমন সময় রাজা অন্তপুরে এসে স্ত্রীকে ডেকে বলেন, "কি গো ষোড়শী, তোমার ছেলেকে শিকারের কথা কি বললে? আমি তো কিছু বলিনি, জানি তুমি অনুমতি দেবে না তাই তো তাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলাম।'

রাণী বলেন, 'আমি তো তাকে অনুমতি দিয়ে দিয়েছি।'

কি আর করা যায়, ছেলে যখন যাবেই তখন রাজা পর্য্যাপ্ত হাতী, ঘোড়া, লোকজন সঙ্গে দিলেন আর সকলকে শাসিয়ে দিলেন 'সাবধান! আমার ছেলের যদি কিছু হয় তবে কিন্তু তোমাদের কারুরই আর ধড়ে মুণ্ড থাকবে না।'

সুমন্ত শিকারে চলেছে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর যখন তারা বনের পথে ঢুকেছে তখন প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা সুরু হ'ল, কিন্তু রাজার

ছেলে সুমন্তর গতিরোধ করে কার সাধ্য, ঝড়ের তাণ্ডব উপেক্ষা ক'রে এগিয়ে চলার মহামন্ত্রেই যে সে দীক্ষিত হ'য়েছে।

এখানে শ্রীমাধব শ্রোতাদের কাছে ভগবৎ তত্ত্বের সারকথা আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, মানবমানবী যখন ভগবৎ পথে অগ্রসর হয়, তখনও বাধাস্বরূপ প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝার পরিবেশ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ মায়াপিশাচী তাকে ঘিরে ধরে। সাধক যদি তখন সব কিছু উপেক্ষা ক'রে এগিয়ে যেতে পারে তবে জয়ের পথ প্রশস্ত হয়। ঝড়ঝঞ্ঝা, বাধাবিঘ্ন সাধনার পথে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে কিন্তু সাধকের দৃঢ়তা, ভগবৎ পথে এক লক্ষীভূত হয়ে অনুকূল পরিবেশের রচনা করে এবং একে একে শত্রুকূল বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

রাজার ছেলে সুমন্তর মনেও ঐ একই ভাব জেগেছিল, তার মনের ভাব বুঝেই হয়তো ভগবান প্রলয়ঙ্কর ঝড়ঝঞ্ঝার পরিবেশ সৃষ্টি ক'রেছিলেন। সেই ঝড়ে হাতী, ঘোড়া, লোকজন কে যে কোথায় পালিয়ে গেল তার কোন হদিস্ মেলা ভার। সুমন্ত নিকটে একটি গাছের গুহায় আশ্রয় নিয়ে প্রাণে বেঁচে গেল। অজ্ঞান অবস্থায় সেই গুহাতে তার রাত কাটে। পরের দিন সকালে জ্ঞান ফিরে এলে সে দেখে চারিদিকে একটি শান্ত সমাহিত ভাব, নবীন অরুণোদয়ে চারিদিক ঝলমল করছে। সুমন্ত মনে মনে ভাবে আমার জীবনেও যে নূতন সূর্য্য জেগে উঠেছে। হে ভগবান! যে মনুষ্যত্ব, যে মানবিকতা আমার অন্তরে সুপ্ত হ'য়ে আছে, আজ যেন সে জেগে উঠে, তবেই আমি আমার লক্ষ্যপথে নির্বিঘ্নে এগিয়ে যেতে পারব এবং জয়লাভ করব।'

গুহা থেকে বেরিয়ে সুমন্ত দেখে লোকজন, সঙ্গীসাথী, হাতী, ঘোড়া কেউ নেই। কেউ বা আবার ঝড়ের কবলে প্রাণ হারিয়েছে। সুমন্ত ভাবে, বাবা নিশ্চয়ই অস্থির হ'য়ে আমার খবরের জন্য লোক পাঠাবেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় তার দেহ অবসন্ন, সঙ্গে যে সব খাবার ছিল

ঝড়ের প্রকোপে তাও সব নষ্ট হ'য়ে গেছে। সে তখন এগিয়ে গিয়ে এক দরিদ্র গৃহস্থের খড়ের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। জীবনে এও এক নূতন অভিজ্ঞতা। গৃহস্থ ধীবর। সুমন্ত দেখে গৃহস্থের এক অপূর্ব্ব রূপসী কন্যা বৃষ্টির জল নিয়ে গৃহের আঙ্গিনায় খেলা করছে। ঝড়ে প্রায় সব ঘরই নিশ্চিহ্ন কিন্তু গৃহস্থের খড়ের ঘরখানা অটুট আছে। গৃহস্থের কন্যাকে দেখে সুমন্ত অবাক হ'য়ে ভাবে, 'এ কি! আমি তো হরিণ শিকারে এসেছি কিন্তু একি হ'ল? কেন আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলছি? আমি কি তবে এই নারীর রূপমোহে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছি'? এসব ভেবে কাউকে কিছু না ব'লেই সে বাড়ী ফিরে আসে। সঙ্গের লোকজন যারা বেঁচে ছিল, তারা আগেই ফিরে এসেছে এবং রাজাকে ঝড়ের বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছে। ইতিমধ্যে সুমন্ত এসে হাজির। ছেলেকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেয়ে রাজা ও রাণী তো মহাখুসী।

রাজা বলেন, 'দেখ্‌লি তো বাবা, গুরুজনের কথা না শুনলে কি হয়?'

ছেলে বলে, 'সাহস ক'রে কোন কর্ম্মে অগ্রসর না হ'লে কি চলে? তোমাদের তো শুধুই বাধা আর বাধা, তাতেই তো আঁধারে পড়ে থাক্‌তে হয়।'

পিতা বলেন, 'বাবা, বাধা মানতেই হয়।'

ছেলে উত্তর দেয়, 'ন্যায় পথে বাধা মানতে গেলে ক্ষতির কারণ হয়। আমি আমার কর্ম্মের পরিণতি দেখতে চাই।' পিতা বলেন, 'কি তুমি বলতে চাও সুমন্ত? আবার কি শিকারে যাবে? ভেবে দেখ, আজ তোমার খেয়াল খুসীর জন্য কত লোকের প্রাণ গেল। এজন্য আমি নিজের কাছেই বা কি কৈফিয়ৎ দেব?'

সুমন্ত বলে, 'বাবা, কারুর জন্য কারুর প্রাণ যায় না—যার যাবার তাকে তো যেতে হবেই। আমার উদ্দেশ্যের পিছনে যে মঙ্গল লুকিয়ে আছে তা শুধু ভগবানই জানেন।'

পিতা বলেন, 'কি তুমি বলতে চাও?'

পুত্র উত্তর দেয়, 'অন্দর মহলে চল, মায়ের সম্মুখেই বলব।' অন্তপুরে গিয়ে সুমন্ত বলে, 'তোমাদের একটি বধূমাতার প্রয়োজন, তাই না?'

পিতা উৎসাহে বলে উঠেন, 'পাশে যে আমার মিত্ররাজা সেই রাজার কন্যাকেই তো ঠিক ক'রে রেখেছি।' সুমন্ত বলে, 'বাবা, প্রবল ঝড়ের পর নবীন সূর্যোদয়ে যে নবীনা সুন্দরী কন্যাকে দেখে এলাম, যদিও সে ধীবর-কন্যা তবুও সেই তোমাদের উপযুক্ত পুত্রবধূ। এছাড়া অন্য কাউকে আমি বিবাহ করতে পারব না।'

রাণী বলেন, 'মহারাজ! ছেলের ঐ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে যদি রাজ্যও যায় তাও করতে হবে।'

রাজা উত্তেজিত হ'য়ে বলে উঠেন, 'চুপ কর রাণী। ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ হ'যে ধীবর কন্যাকে ঘরে আনব?'

গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠে সুমন্ত বলে, 'তোমরাই তো বলে থাক, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। মানুষের ক্ষেত্রে এ বিচার কি তোমার মত লোকের পক্ষে শোভা পায়—এ বিচার করবে লোভের ক্ষেত্রে। তোমার পুত্রের উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে। প্রজার রক্ত শুষে খাবার জন্য তোমার পুত্র রাজা হ'তে চায় না। যেদিন আমার মধ্যে জ্ঞানালোক প্রস্ফুটিত হ'য়েছে সেদিন থেকেই আমি আমার উপযুক্ত সঙ্গিনীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

রাজা সক্রোধে বলেন, 'তুমি কি বলতে চাও, ধীবর কন্যা তোমার যোগ্য পাত্রী?,

সুমন্ত সবিনয়ে উচ্চারণ করে, 'গোময়ে যে পদ্মফুল ফোটে, দেবসেবায় তার যোগ্যতা কি কারুর চাইতে কম? গোময়ের মত ধীবর কুলে জন্ম হ'লেও দেবতারও লক্ষ্য আছে ঐ পুষ্পে।'

রানী বলেন, 'মহারাজ! ছেলে যা বলে তাই কর না?' শেষ পর্যন্ত মহারাজ লোকজন সঙ্গে নিয়ে হাতীতে চড়ে রওনা হ'লেন।

দূর থেকে মহারাজকে আসতে দেখে ধীবর বৌ বলে, সর্ব্বনাশ! জীবনেতো রাজাকে কোনদিন খাজনা দাওনি তাই বোধ হয় এবারে রাজামশাই নিজেই আসছেন।'

ধীবর ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়, 'বৌ, হয়তো তোমার অনুমানই সত্য।'

ঘর থেকে মেয়ে বলে উঠে, 'শুধু রাজা কেন, রাজার রাজাকেও আসতে হবে। প্রয়োজন হ'লে সব জায়গায়ই যে তাঁকে যেতে হয় বাবা'।

রাজা মশাই এলে ধীবর ও ধীবর বৌ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, বলে, 'মহারাজ! আমাদেরতো কিছু নেই, খাজনা দেব কোথেকে?

রাজা তাদের থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'ওহে! আমি খাজনা নিতে আসিনি, তবে একটা কিছু নিতে এসেছি।'

ইতিমধ্যে মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই রাজা তাকে দেখে ভাবেন, 'এ কি! এ যে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীঠাকুরুন! ছেলে কেন পাগল হবে না? বুঝেছি মা, চতুরতা করে তুমি এখানে থেকে যেতে চাও।' রাজা মেয়েকে বলেন, 'মা, তুমি কি কমলা?'

মেয়ে বলে, 'হ্যাঁ মহারাজ।'

রাজা বলেন, 'তা মা, তোমার কি বাপের ঘরে যেতে ইচ্ছে করে না?'

কমলা বলে, 'হ্যাঁ, তা করে, তবে একটা কথা আছে। মা যখন বলেছেন, তখন বলছি, যার ঘর থেকে মেয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তার জন্যও আপনারই মত রাজপ্রাসাদ তৈরী ক'রে দিতে হবে। আরও একটি কথা, আমাকে কেউ নিতে আসবে না। আমি স্ব-ইচ্ছায় মালা হাতে নিয়ে যাব; যতদিন খুসী থাকব, তারপর এখানে চলে আসব।'

রাজা বলেন, 'বেশ তাই হবে। তবে সামনেইতো শুভদিন আছে শুভকাজ যত শিগ্‌গির সম্পন্ন হয় তাইতো ভাল মা। তোমাকে যখন পেয়ে গেছি তখন ফেলে যাই কি ক'রে? আমি থাকব রাজপ্রাসাদে, আর তুমি থাকবে কুঁড়ে ঘরে, তা হয় না মা।'

মেয়ে তখন বলে, 'আগে এখানকার রাজপ্রাসাদ তৈরী হ'ক তারপর যাব।'

মহারাজ সহ ব্যবস্থাই করলেন।

তিনি ধীবরকে বলেন, 'কিহে! তুমিতো এখন বেয়াই হ'লে।'

ধীবর বলে, 'মহারাজ! কি আর বলব, মা জননীই সব জানে। জন্মের আগে সে স্বপ্ন দিয়ে এসেছে, সে নাকি আগের জন্মে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সখী ছিল, এ জন্মে এসেছে আমার ঘরে।' ফিরে যাবার আগে রাজা কমলাকে বলেন, 'মা, তোমার জন্য রক্ষী পাঠাব।'

কমলা উত্তর দেয়' 'না মহারাজ, রক্ষীর কি প্রয়োজন' আমি যাঁর, সে ভিন্ন আমার দিকে কে তাকাবে?'

মহারাজ বলেন, 'তুমিতো কৃষ্ণের। তবে কি তিনি এসেছেন?' কমলা বলে, 'পরমলক্ষ্য যার লক্ষ্য সে-ই আমাকে পাবে, সেই হবে আমার সাথী। আমার পতি হবার যোগ্যতা জগত পতি ছাড়া আর কার আছে, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়।

রাজা বলেন' 'বেশ তাই হবে মা, আমিতো তোমার কথাও কিছু বুঝতে পারি না, ছেলের কথারও কোন উত্তর দিতে পারিনা।'

যাক্ বিবাহের দিন স্থির ক'রে মহানন্দে মহারাজ আপন ঘরে ফিরে এলেন। এদিকে পণ্ডিত সমাজ বেঁকে বসেছে, বলে, 'ব্রাহ্মণ পারে না, একটা সামান্য ধীবরের কন্যাকে ঘরে আনলে জাতিচ্যুত হ'তে হবে। যখন এসব বাক্‌বিতণ্ডা চলছে তখন এক নৈয়ায়িক পণ্ডিত এসে বিধান দেন, 'উপায় আছে। ব্রাহ্মণ সন্তান যদি নিজ ইচ্ছায় অব্রাহ্মণ কোন কন্যাকে গ্রহণ করে তবে তা ন্যায় এবং গ্রহণীয়।

কান্যকুব্জ থেকে যখন পঞ্চ ব্রাহ্মণ এসেছিলেন তখন তাঁরা কি ব্রাহ্মণী সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন ? কাজেই এটা অন্যায় নয়, ন্যায়।'

এদিকে বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা সমাপ্ত। সবই ঠিক আছে, শুধু যার সঙ্গে বিবাহ সেই কন্যা নেই। ধীবর এসে বসে আছে কন্যা সম্প্রদান করতে। সবাই উৎকণ্ঠিত কন্যা কৈ ? ধীবর বলে, 'আমি তো তা জানিনা, কন্যা সম্প্রদান করতে হবে, তাই আগে থেকে এসে বসে আছি।

নৈয়ায়িক পণ্ডিত তখন বলেন, 'না, দান করার অধিকারতো তোমার নেই। পাত্রী নিজে মালা হাতে এসে বিবাহকার্য্য সম্পাদন করবে।'

এমন সময় দেখা গেল স্বয়ং লক্ষ্মী যেন সখীদের সঙ্গে নিয়ে বৈকুণ্ঠ থেকে আসছেন। যথাসময়ে মালা বদল হ'ল—বিবাহ কর্ম্ম সব সমাধা হ'য়ে গেল। দুদিন, পরে কমলা স্বামীকে বলে, 'এবার কিন্তু আমি চলে যাব।' স্বামী বলে, 'কোথায় যাবে ?'

কমলা বলে, 'কেন তোমরা যে আর একটি রাজপুরী তৈরী ক'রে দিয়েছ সেখানে ? সেখানে যাব আবার এখানেও আসব। আসা যাওয়া করব আমার ইচ্ছায় ; তোমার বাবার কাছেতো এই সর্ত্তেই বিবাহে রাজী হ'য়েছি।' স্বামী বলে, 'সত্ত ক'রেছ বিয়ের আগে, এখন আমি তোমার স্বামী, আমার কথাতো শুনতে হবে।'

কমলা উত্তর দেয়, 'তা হয় না তুমি যে আমার স্বামী, তা আগে বুঝতে দাও।'

এদিকে রাজা ছেলেকে ডেকে বলেন, 'এই কন্যার সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার ক'রো না। আমার মনে হয় এ সামান্য নারী নয়, হয়তো কোন দেবী হ'য়ে থাকবে।' পুত্র বলে, 'তোমার অনুমান সত্য, তথাপি লোকাচার, দেশাচার ব'লেতো একটা কথা আছে ?'

পিতা পুত্রকে বোঝান, 'দেখ, আমার মনে হয়, এই লোকাচার,

দেশাচার যে কিছু নয় তা বুঝাবার জন্যই হয়তো মায়ের এই অনাচার। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল আছে। মায়ের ঐ ভাবমূর্ত্তি দেখে আমি যেন কেমন হ'য়ে গেছি, ভাব্‌ছি মাকে ছেড়ে থাক্‌ব কি ক'রে'। একথা বলতে বলতে রাজার চোখে জল আসে।

শেষের কটি কথা শুনতে পেয়ে এবং মহারাজের চোখে জল দেখে কমলার চোখেও জল আসে।

সে বলে, 'আমিও আপনাদের ছেড়ে থাকতে পারব না বাবা। তবু আমায় যেতে হবে। প্রয়োজন আছে যে। আমার ইচ্ছামত যাওয়া আসা করব।'

রাজপুত্রকে কমলা বলে, 'দেখ, তুমি কিন্তু তোমার ইচ্ছায় আমাকে দেখতে যেও না। প্রয়োজন হলে বাবা তোমাকে লোক পাঠিয়ে নেওয়াবেন। তোমার সেকথা যেন মনে থাকে।'

একথা ব'লে সে সখাদের সঙ্গে নিয়ে চ'লে যায়। তখন সুমন্ত্র বাবাকে বলে, 'বাবা, হরিণ শিকার করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হ'ল তাতে তো তুমি তোমার মালক্ষ্মীকে পেলে। আমি তো তাকে হারালাম, এবার আমার আর একটি অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে হবে। আমি এখনও আমার মূললক্ষ্যে পৌঁছাইনি। কাজেই এবার আমি সওদাগরী করতে যাব।

এই বলে সুমন্ত্র সওদাগরী বজরা নিয়ে রওনা হল। মনে মনে সে ভাবে, 'কমলা ফিরে এসে আমাকে খুঁজবে—সেটাই তো আমি চাই।'

বাপের বাড়ী এসে কমলা মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করে বলে, 'প্রভু! তুমি যে কারণে আমাকে সংসারে পাঠিয়েছ, আমি তার কি করলাম? তুমি আমার সর্ব্বসার, তথাপি সংসারে পাঠিয়েছ। এই সংসারে এসে সংসারী মানুষের উপযুক্ত কর্ত্তব্য পালন করতে পারলাম কৈ? যাকে আমার জাগতিক স্বামী করেছ, স্বেচ্ছাচারিনী হয়ে তার

কাছ থেকে চলে এলাম। সংসারীর কি স্বেচ্ছাচারী হওয়া শোভা পায়? সংসারে থেকে সংসারীর পরিপূর্ণ কর্ত্তব্য করাই যে তোমার সেবা করা সেকথা তো আমার অবিদিত নয়। হে প্রভু! তুমি, আমার জাগতিক স্বামীকে আমার কাছে এনে দাও।'

ভক্তের আকুল আহ্বানে ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর লীলাপূরণে তৎপর হলেন। তাই হয়তো রাজপুত্রের সওদাগরী বজরা নদীর মধ্যে বালুচরে আটকে গেল। রাত হ'য়ে গছে, কোন উপায়ান্তর না দেখে সুমন্ত ছই-এর বাইরে এসে দাঁড়ায় এবং দেখে এ যে তার শ্বশুরের রাজ্য। ভাবে ভালই হ'ল শ্বশুরবাড়ী যাই।

সুমন্ত নদী সাঁতরে পাড়ে এসে উঠে এবং সেই ভিজা কাপড়ে রাজবাড়ীর দ্বারে গিয়ে বলে, 'ভিতরে খবর দাও, এ বাড়ীর জামাতা এসেছে।'

দ্বারী বলে, 'রাণীমার হুকুম ছাড়া রাজপুরীতে কারুরই প্রবেশের অধিকার নেই, অপেক্ষা করুন, আগামীকাল প্রত্যুষে রাণীমা জাগলে অনুমতি নেব।'

রাজপুত্র ভাবে, 'আজ রাতেই আমাকে কমলার কাছে যেতে হবে।' হঠাৎ সুমন্তর চোখে পড়ে যে রাজবাড়ীর উঁচু প্রাচীরের গা বেয়ে একটি মজবুত লতাগাছ বাইরের দিকে নেমে এসেছে। সেই লতাগাছের সাহায্যে সুমন্ত রাজবাড়ীতে প্রবেশের পথ আবিষ্কার করে।

এদিকে কমলা রাত্রে দুই প্রহর ঘুমায় ও দুই প্রহর জাগে অর্থাৎ সবাই যখন ঘুমায় তখন সে সাধনা করে এবং ধ্যানের মধ্যে কৃষ্ণলীলা দর্শন করে।

রাজপুত্র ভিজা গায়ে এবং ভিজা কাপড়ে একেবারে অন্দর মহলে এসে উপস্থিত। মানুষের সাড়া পেয়ে শত্রু ভেবে কমলা আত্মরক্ষার্থে তরোয়াল নিয়ে শত্রুকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। অমনি রাজপুত্র

বলে উঠে, 'এটা যদি করতে পার তবে ভালই হবে, আর কেউ তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না।'

কমলা স্বামীর কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বলে, 'এ কি! তুমি এত রাত্রে? আমার প্রতি তোমার এত আকর্ষণ? এই আকর্ষণ যদি জগত স্বামীর জন্য থাকত তবে কবেই তাঁকে পেতে।'

কমলার মুখ দিয়ে শ্রীমাধব একথাই আমাদের মনে গেঁথে দিতে চাইছেন যে জগত স্বামীর জন্য চাই মনের প্রচণ্ড আকুলতা।

সুমন্ত বলে, 'কমলা! তুমি আমাকে ভুল বুঝ না। তোমার দেহের প্রতি আমার কোন আকর্ষণই নেই। তুমি আমার সহধর্ম্মিনী। আমাদের দুজনের ধর্ম্মই এক। আমার কর্ম্মে তোমার সহায়তা যে একান্ত প্রয়োজন, তাই আর কাল বিলম্ব করতে চাই না।'

সুমন্তর কথায় কমলা অভিভূত হয়ে পড়ে বলে, 'সত্যই তুমি ধন্য, আজ তোমাকে একটি প্রণাম করি।' প্রণাম ক'রে সে বলে উঠে, 'সত্যই প্রভু আমার অন্তর্যামী, তাই যে প্রার্থনা আমি ক'রেছিলাম উনি তা পূর্ণ ক'রেছেন। সে কারণেই সওদাগরী করতে তুমি বিদেশ রওনা হ'য়ে এখানে এসে পৌঁছেছ।'

সুমন্ত মাঝপথে কমলাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'না, না কমলা! এটা তুমি ভুল বলছ, বিদেশে তো আমি রওনা হইনি; এই তো আমাদের বিদেশ। বিদেশ থেকে আমি স্বদেশে যেতে চেয়েছিলাম আর তাইতো আমার তোমাকে এত প্রয়োজন। চলো আর দেরী নয়, এবার যাই।'

শ্বশুরবাড়ী গিয়ে শ্বশুর শাশুরীকে প্রণাম ক'রে কমলা বলে, 'আমার ভুল ভেঙ্গেছে। আর বাপের বাড়ী যাব না, এখন থেকে আপনাদের সেবায়ই জীবন কাটাব।'

বাপের বাড়ী থেকে আসার সময় কমলা একটি সোনার ঝাঁপি সঙ্গে নিয়ে আসে। রাজপুত্র বলে, 'এটা আবার কি?

কমলা উত্তর দেয়, 'এয়োস্ত্রীকে এটা সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।' যাক্ কিছুদিন সুখে সংসার করার পর একদিন সুমন্ত বলে, 'আচ্ছা কমলা, রোজ রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন তুমি ঐ ঝাঁপি খুলে কি দেখ? আমায় বলতে হবে কি আছে ওতে'?

কমলা উত্তর দেয়, 'ঐ ঝাঁপিটা কি জান? আমাদের এই দেহটি যেমন ঠিক তাই অর্থাৎ এই দেহটিও তো একটি ঝাঁপি ছাড়া আর কিছু নয়! এই দেহরূপ ঝাঁপির মধ্যে যে কৃষ্ণ রয়েছেন তা কি কেউ খুলে দেখে? যদি দেখে তবে কি আর সে সংসারে থাকতে পারে? অর্থাৎ মায়ারূপ এই দেহ ঝাঁপিটি যদি কেউ উন্মুক্ত করতে পারে তবে কি আর সংসারে থাকা চলে? তেমনি ঐ ঝাঁপি খুলে দেখলে আমাকেও আর পাবে না। মায়াঝাঁপির কবল থেকে মুক্ত হ'তে পারলে অমৃত আস্বাদন করা যায়। একবার অমৃত আস্বাদন করতে পারলে আর কি কেউ বিষ আস্বাদন করবে'?

সত্য আর সত্তার মধ্যে যে আবরণ সেটিই হ'ল এই মায়াঝাঁপি। ঝাঁপি উন্মুক্ত করতে পারলে তো আবরণ আর থাকে না—তখন দেখা যায় কে কার সন্তান, কে কার কি!

দেহথাকাকালীন যদি কেউ এই মায়াঝাঁপি উন্মুক্ত করতে পারে তবে তার আত্মদর্শন হয়। আত্মদর্শনই কৃষ্ণদর্শন—কৃষ্ণদর্শনই গুরুদর্শন।

সব শুনেও সুমন্ত জেদ ধরে 'ঝাঁপি আমার দেখতেই হবে। বলো, যদি তোমাকে হারাই তবে কোথায় গিয়ে তোমাকে পাব?'

কমলা বলে, 'দেখ, কৃষ্ণই সর্ব্বসার, কৃষ্ণই সব, তাঁর কাছেই আমাকে পাবে।'

শ্রীমাধব বলেন, এই কমলা হ'ল বৃন্দাবনের অষ্টসখীর এক সখী। সমগ্র জগতময় সে একমাত্র কৃষ্ণচিত্রই দেখে তাই বৃন্দাবনে তার নাম চিত্রাসখী।

রাজপুত্র সুমন্ত হ'ল কৃষ্ণসখা মধুমঙ্গল। কৃষ্ণকে পেতে হ'লে কৃষ্ণসখীকে কৃষ্ণসখার ঘরেই আসতে হয়। জগতের মানবমানবীর শিক্ষার কারণে কৃষ্ণ অনুগত মধুমঙ্গল এবং কৃষ্ণ অনুরাগিনী চিত্রা রাজপুত্র সুমন্ত ও ধীবর কন্যা কমলা রূপে রূপ গ্রহণ ক'রেছে।

কমলা বলে, ঝাঁপি খুলব না, আমায় ছেড়ে দাও।'

সুমন্ত জেদ ধরে, 'না, ঝাঁপি আমায় দেখাতেই হবে।'

কমলা বলে, 'বেশ, তাহলে মা বাবাকে প্রণাম করে আসি। আর তো আমায় পাবে না।'

রাজপুত্র সুমন্তর জাগতিক বুদ্ধি জেগে উঠে, 'কি! চলে যাবে?' এই ভেবে সমস্ত কাপড চোপড দিয়ে কমলাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে।

কমলা বলে 'সত্যই তুমি সুমন্ত! কেউ যদি কৃষ্ণপাদপদ্মে চলে যায়, তাকে কি কেউ বেঁধে রাখতে পারে? আর এই মায়াঝাঁপির চাবিটি কি জান? সেটি হ'ল কৃষ্ণনাম। মায়ার ঝাঁপি খুলতে হ'লে কৃষ্ণনাম প্রয়োজন। দেখ, অন্তরের অন্তঃস্থলে যদি কেউ এই কৃষ্ণনাম অর্থাৎ এই মহামন্ত্র পায় তবেই সে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হ'তে পারে। এখনও বলছি, আমায় ছেড়ে দাও, আমার এ সংসার ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না।'

শ্রীমাধবের একথা অবতারণা করার অর্থ সুদূর প্রসারী চিত্রাসখী, যে কৃষ্ণবই আর কিছু জানেনা, জাগতিক সংসারে সে-ও যদি এমনি মোহগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে বলে যে, 'সংসার ছেড়ে যেতে চাই না' তবে বুঝতে হবে এ কত বড় কঠিন কাজ। তাই আমাদের মত অতি সাধারণ মানব মানবীর পক্ষে কৃষ্ণনামরূপ মহামন্ত্র আশ্রয় ক'রে চলা ছাড়া আর কি কোন পথ আছে?

যাই হ'ক রাজপুত্রতো নাছোড়বান্দা-ঝাঁপি খুলতেই হবে। তখন কমলা কৃষ্ণনামরূপ চাবি দিয়ে ঝাঁপি খুলতেই একটা মহাধ্বনি হয় এবং কমলার দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। রাজপুত্র সুমন্ত দেখে কমলা

যেন দিব্যদেহে চলে যাচ্ছে। ঝাঁপির ভেতর পড়ে আছে কৃষ্ণমূর্ত্তি।

সুমন্ত তখন ভাবে, 'তুমি আমাকে কৃষ্ণের সন্ধান দিলে, মূর্ত্তি থেকে বিমূর্ত্তে যাবার পথ দেখালে, আর ভেবেছ আমি কৃষ্ণমূর্ত্তি আগলে পড়ে থাকব? না, তা হয় না।'

এসব চিন্তন করতে করতে তার সমাধি হয়, সমাধিস্থ হ'য়ে সে হৃদয় বৃন্দাবনে বিচরণ করে। দেখে কৃষ্ণ সেখানে হাল বইছেন। তখন সে ভাবে, হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার নামরূপ বীজকে কর্ষণ ক'রে হৃদয়রূপ জমিকে উর্ব্বররূপ ক'রে তোল এবং সেই উর্ব্বর জমিতে বীজ রোপণ কর, আর তোমারই বিকর্ষণ সেই বীজ থেকে যে বৃক্ষলতার সৃষ্টি হয় তা ফলে ফুলে সুসজ্জিত ক'রে তোল, আবার তোমারই আকর্ষণে সকলকে কাছে টেনে নাও। তুমি ছাড়া এই কর্ষণ, বিকর্ষণ ও আকর্ষণের অপূর্ব্ব ক্ষমতা আর কার আছে?

সুমন্ত যেন তার স্বপ্নের মধ্যে পর পর প্রতিটি দৃশ্য প্রত্যক্ষ ক'রে যাচ্ছে। সেই দৃশ্যপট দেখতে দেখতে সে বলে উঠল, 'আচ্ছা, কমলা কোথায় তা কি কেউ তোমরা বলতে পার?'

এমন সময় দেখে এক বৃদ্ধ তপস্বী। তিনি বলেন, 'কে তুমি কমলাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ'? এই বৃদ্ধ তপস্বী হ'লেন মনুষ্যত্বের প্রতীক গর্গঋষি। তিনি সুমন্তকে পথ নির্দ্দেশ ক'রে বলেন, 'মনুষ্যত্বের গুণাবলী অর্জ্জন করে মানবিকতার পথে, এগিয়ে যাও তবেই তোমার ঈপ্সিত ধন খুঁজে পাবে।'

আবার কিছুদূর এগিয়ে সুমন্ত দেখে, এক ধোপা। সে বৃন্দাবনের সখীদের কাপড় ধোয়। সেখানে দেখে তারই দেওয়া কমলার সাড়ী সে চিনতে পারে, ভাবে এই সাড়ী পরে গেলে নিশ্চয় কমলা আমায় চিনবে। তাই কমলার সাড়ীখানা টেনে নিয়ে পরে অর্থাৎ নারী না হ'লে তাঁর সঙ্গেতো মিলন হয় না, কেননা তিনিইতো একমাত্র পুরুষ

আর সবইতো প্রকৃতি। সুমন্তুর মূল লক্ষ্য হ'ল কৃষ্ণ, আর বাইরের লক্ষ্য হ'ল কমলাকে খোঁজা।

এখানে কথা হ'ল, যে সখীর যে লক্ষণ সেই লক্ষণে চিত্রিত হ'লে তবেই তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। আরও এগিয়ে দেখে রোদের দিকে পিছন দিয়ে অষ্ট সখীরা মিলে চুল শুকোচ্ছে। মনে হয় সবাই দেখতে একই রকম—কেননা প্রত্যেকের মনে যে সেই একই কৃষ্ণভাব। চিনতে পেরে সুমন্তু গিয়ে চিত্রাসখীর চুল টেনে ধরে, সেও যে নারী সেজে গেছে।

বিভিন্ন সাধনার বিভিন্ন রূপ হ'ল প্রকৃষ্ট মনুষ্যত্বেরই প্রকাশ বিকাশ।

চিত্রাসখী অপর একজন সখীকে শুধায়, 'এখানে এসে যদি কোন পুরুষ কৃষ্ণের কাছে যেতে চায়, তবে আমরা কি করব?'

সখী উত্তর দেয়, 'কেন তাকে নারী সাজিয়ে নিয়ে যাব?' মানুষের আমিত্ব বুদ্ধির সীমানা হ'ল গর্গঋষির আশ্রম পর্যন্ত। সেটি পার হ'লেই কৃষ্ণের কাছে যেতে আর কোন বাধা নেই।

সখীদের কথোপকথনের মাঝখানেই কৃষ্ণ এসে সখা মধুমঙ্গলকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

'নিরপেক্ষ না হইলে না হয় কৃষ্ণ ভজন'

মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক শিষ্য প্রশ্ন তোলেন, 'বৈষ্ণবশাস্ত্রে বা চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলেছিলেন, 'নিরপেক্ষ না হইলে না হয় কৃষ্ণভজন'—এই নিরপেক্ষ বলতে উনি কি বুঝিয়েছেন?'

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, সাধারণভাবে বলতে গেলে এ কথাই বলা যায় যে আপেক্ষিকতা নিয়ে সাধন ভজন করলে তা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয় না বা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমাধব বলেন, প্রথমেই আমাদের জানতে হবে আপেক্ষিক বলতে কি বোঝায় এবং নিরপেক্ষ কথাটিরই বা প্রকৃত অর্থ কি?

শ্রীমাধব বলেন, আপেক্ষিক বলতে একথাই বোঝায়—যখন কোন কাজ অপর আর একটি কাজের সাহিত জড়িত বা নির্ভরশীল। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বলা হয় যে সাধনপথে চলতে গিয়ে যদি অন্য কোন বিষয়ের অপেক্ষায় সময় কাটাতে হয় তবে সাধন ভজন পথে বিঘ্ন ঘটে।

শ্রীমাধব কয়েকটি উপমা দ্বারা আপেক্ষিক কথাটির বিস্তারিত আলোচনা করেন। যেমন, তুমি যখন ধ্যান করবে ব'লে সঙ্কল্প ক'রেছ তখন ভাবছ সংসারের সব কাজের ঝামেলা মিটে যাক, তারপর সুস্থির হ'য়ে ব'সে ধ্যান করব। দেখা গেল সংসারের ঝামেলা মিটে যেতে [illegible] পুরো সময়টাই কেটে গেল। আবার হয়তো কেউ বলে, কেউ একজন এলে একসঙ্গে [illegible]। অনেক সময়ই দেখা যায় তার অপেক্ষায় থেকে অনেক সময় চলে গেল, কোন কারণে হয়তো তার আসা হ'ল না। [illegible] এবং [illegible] গুরুদেবকে প্রণাম করবে, [illegible] যোগাড়ের অপেক্ষায় থেকে গুরুদেব [illegible] হ'ল। [illegible] দেবতার জন্য গঙ্গাজল, ফুল, তুলসী ও বেলপাতার অপেক্ষা করছ, এর সবগুলো হয়তো সময়মত এসে পৌঁছাল না তাই আর পূজোয় বসা হ'ল না। এরকম কত অপেক্ষাই তো জীবনে আসবে, তার জন্য বসে থাকলে কোনোদিনই তো উপযুক্ত সময়ে কর্ম্ম করা সম্ভব নয়। তাই বলেছি, সাধন ভজন পথে আপেক্ষিকতা

দিয়ে সাধন ভজন করলে তা সুষ্ঠুরূপে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

শ্রীমাধব বলেন, নিরপেক্ষ বলতে আমি একথাই বিশেষভাবে বলতে চাই যে, তোমার এখন যেরূপ সামর্থ্য, সেই সামর্থ্যের মধ্যে থেকেই ভজন সাধন কর। কি আছে, কি নেই তার অপেক্ষা না ক'রে সময়ের কাজ সময়ে করবে। অর্থের অপেক্ষায় থেকে গুরুদর্শনে যাওয়া স্থগিত রাখা ঠিক নয়। যদি নিরপেক্ষ হ'তে পার তবে সব অবস্থায়ই সব কিছু করতে পারবে।

নিরপেক্ষ বলতে, তোমার পথে তুমি অগ্রসর হও। কোন কিছুর জন্যই অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। ভজন পথে এ সব চিন্তা করা সমীচীন, তাতে তোমার মধ্যে যে সংস্কার আছে তা থেকেও মুক্ত হ'তে পারবে।

সংস্কার থাকলে সাধন ভজন পরিপূর্ণ রূপ নিতে পারে না আবার সংস্কার ছেড়েও চলে না, কারণ প্রথম পর্য্যায়ে সংস্কারের প্রয়োজন আছে। [illegible] পর্য্যন্ত সংস্কারে ডুবে থাকলে চলবে না। তাহলে [illegible] সুসংস্কার নিয়েই অন্ধ সংস্কার মুক্ত হ'তে হবে। [illegible] দিয়ে নিবেদন না করলে মনে হয় বুঝি ভগবান [illegible] নিবেদন [illegible]। এই ভুল [illegible] কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, [illegible] যা কিছু অবাধে নিবেদন করা যায় তাই তিনি গ্রহণ করেন। [illegible] তুলসী [illegible] ভাব এলেই সংস্কার [illegible] যায়। পূজা ক'র পুষ্প দিয়ে—এই পুষ্প কি? তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দল যেন পুষ্পের মত তোমার আরাধ্যের পাদপদ্মে বর্ষিত হয়। যে ইন্দ্রিয়ের কুফলে আমরা অনুক্ষণ ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে আছি সেই ইন্দ্রিয়ের সুফলই তাঁকে নিবেদন করা যায়। তখন দেখা যাবে একে একে ইন্দ্রিয়ের সকল কর্ম্মই নির্ম্মল ও পবিত্র হ'য়ে উঠছে। চক্ষুর দৃষ্টিকে কি উপায়ে ধীর স্থির করা যায়? দৃষ্টির

চঞ্চলতাকে অপসারিত করতে হবে, তবেই মন ধীর স্থির এবং দৃঢ় হয় ও গাম্ভীর্য্য প্রাপ্ত হ'তে পারে। শ্রবণও যদি দৃঢ় হয়, তখন যা শুনবে তা-ই মন দ্বারা অনুধাবন করা সম্ভব হবে। দৃঢ়তা মনের মধ্যে প্রতিফলিত হ'লেই শ্রবণ শুদ্ধ হয়, কেননা সবই তো মনেরই খেলা।

তারপর মনে কর নাসিকার কথা। যে কোন গন্ধ নাকে এলেই আমরা চঞ্চল হ'য়ে উঠি। সেই গন্ধের মধ্যে যদি দৃঢ়তা আনতে পারা যায় তবেই চঞ্চলতা দূর হবে। তাহ'লে দেখা গেল দৃঢ়তাই হ'ল প্রকৃষ্ট ভাব। স্পর্শেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। এইভাবে দৃঢ়তা দ্বারা যদি সব ইন্দ্রিয় সংশোধিত হয়, তবে সব ইন্দ্রিয়ের ফলই হবে পুষ্পের মত কোমল ও সুন্দর।

দৃঢ়তার মধ্যে যে সংযম সৃষ্টি হয় সেই সংযমই তো প্রকৃত সংযম এবং স্থায়ী সংযম। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া সংযম দ্বারা আমরা যে দৃঢ়তা আনবার চেষ্টা করি সে দৃঢ়তা কি স্থায়ী হয়? হয় না।

প্রকৃতপক্ষে দৃঢ়তার অর্থ কি?

কোন কিছু দর্শন ক'রে ধীর স্থির ভাবে চিন্তা ক'রে দেখ, এর মধ্যে কি সত্য লুকিয়ে আছে। জোর ক'রে কোন কিছুই যে ত্যাগ করা যায় না। যদি বোঝ যে, কোন লোকের সঙ্গ করলে তোমার ক্ষতি হবে, তবে সে সঙ্গ অবশ্যই ত্যাগ করবে। কিন্তু তার আগে তোমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ক'রে দেখতে হবে যে, সেখানে তোমার কোন স্বার্থের সংঘাত আছে কিনা।

এরকম সংস্কারকেও জোর ক'রে ত্যাগ করা যায় না। সংস্কারের পিছনে কি কারণ আছে সেটি চিন্তা ক'রে দেখতে হবে। সংস্কার হ'ল গাছের বাকলের মত। গাছের পরিপক্কতা এলেই বাকল ঝরে যায়; তাতে কিন্তু গাছকে কোন ক্ষতি স্বীকার করতে হয় না, গাছ আরও সবলতা প্রাপ্ত হয়। কাজেই সংস্কার হ'ল বৃক্ষরূপী মানবের

পরিপক্কতা আনবার জন্য। পরিপক্কতা এলে সংস্কার আপনি ঝরে পড়বে এবং তখনই নিরপেক্ষ হ'য়ে উঠবে। তখন আর ফুল, বেলপাতা, তুলসীর প্রয়োজন কি? চিন্তা ক'রে দেখ চন্দনটি কি জন্য? তোমার প্রতি ইন্দ্রিয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যখন সুগন্ধের সৃষ্টি হবে তখন যে কর্ম্মই কর না কেন তাতে সবাই সন্তুষ্ট হবে এবং সবার সন্তুষ্টির মধ্য দিয়েই তো আরাধ্যও সন্তুষ্টি লাভ করেন। তাই বলি, শুধু পায়ে ফুল, বেলপাতা ও তুলসী অঞ্জলি দিলে কি কোন সুসার আছে? প্রতি কর্ম্মে প্রতিটি মানবের যদি সুগন্ধ ওঠে তবে যেমন আনন্দ রাখবার ঠাঁই থাকবে না এও তেমনি। সুগন্ধ হ'ল সুযশ, তেমনি সংস্কার হ'ল ভজন পথের বাকল স্বরূপ, বাকলই যে গাছকে জল, ঝড়, তীব্র রৌদ্রতাপ থেকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা ক'রে থাকে।

প্রত্যেকটি সংস্কারের প্রকৃত কারণ যখন খুঁজে পাবে তখনই বুঝতে পারবে, বাকল ঝরে পড়ার আর দেরী নেই এবং তখনই প্রকৃষ্ট ভাবে নিরপেক্ষ হ'তে পারবে—নিরপেক্ষ হবার ভান করতে হবে না। যতক্ষণ সংস্কার ততক্ষণই পক্ষপাতিত্ব। সংস্কার মুক্ত হ'লেই নিরপেক্ষতা আসবে। এই পক্ষপাতিত্বটি কি জিনিষ? এটি হ'ল ভজন সাধনের পথে গণ্ডীবদ্ধতায় পড়ে থাকা। নিরপেক্ষ না হ'লে আত্মার ভজন হয় না। আত্মার ভজন বলতে কি বুঝি? আত্মাকে জানা ও চেনার চেষ্টা বা প্রণালীকেই এক কথায় বলে আত্মার ভজন। নিরপেক্ষ হ'লেই আত্মার ভজন অর্থাৎ অনুগত হ'তে পারবে, তার অর্থ হ'ল তুমি আত্মাতে ডুবে গেছ, আত্মা ছাড়া আর কিছু জান না, বোঝ না। আত্মাকে ভালবাসাই হ'ল আত্মভজন।

তাহ'লে এবার পরিষ্কার বোঝা গেল সংস্কার মুক্ত বলতে কি বোঝায়। তথাকথিত শাস্ত্রে ব'লে গেছে যে সংস্কার মুক্ত হবার চেষ্টা কর, মানসোপচারে পূজা কর। আমিও সেই একই কথা বলছি তবে

আমার উপদেশ হ'ল, সংস্কারযুক্ত বিধানেই ভজন সাধন ক'রে সঙ্গে সঙ্গে এটা বুঝতে চেষ্টা কর যে, ভজনের প্রতীকগুলো কোন্ কারণে ব্যবহৃত হ'য়েছে। সেটি যেদিন জানতে পারবে সেদিন প্রতীক আপনি ঝরে পড়বে এবং নিরপেক্ষ হ'তে আর কোন বাধা থাকবে না।

আপেক্ষিক অবস্থাটি হ'ল সংকীর্ণ অবস্থা আর নিরপেক্ষ অবস্থাই হ'ল প্রসারিত অবস্থা।

কৃষ্ণ ভজন অর্থে সাধারণত আমরা বংশীধারী কৃষ্ণকেই বুঝে থাকি। প্রকৃতপক্ষে এটাও একটা সংস্কার। কেন? তার কারণ হ'ল সবাই তো আর কৃষ্ণ ভজন করে না। কেউ যীশুকে বা ঈশ্বরকে ভজনা করে আবার কেউ বা আল্লাকে ভজনা করে। তাহ'লে বংশীধারী কৃষ্ণকে ভজন করার অর্থ হ'ল আপেক্ষিক। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ ভজন অর্থে কি বুঝতে হবে?

এখানে বুঝতে হবে যে, তুমি কোন্ আকর্ষণে স্থিতিমান আছ বা ঝুলে আছ বা চলমান আছ অর্থাৎ এগিয়ে চলছ। সেই আকর্ষণকে ভজনা কর। এর অর্থ হ'ল সেই আকর্ষণে ভজে যাও বা ডুবে যাও, ডুবে দেখ কোন্ আকর্ষণ তোমাকে স্থিতিশীল ক'রে রেখেছে বা ঝুলিয়ে রেখেছে বা চলমান ক'রে রেখেছে। দেখা যায় যে সত্যের আকর্ষণেই মানুষ স্থিতিশীল হ'তে পেরেছে বা পিছুটান ছেড়ে এগিয়ে যেতে পারছে। এই সত্যেরই আকর্ষণে অনন্ত জগৎ চলছে। আবার এই সত্যের বিকর্ষণে মানব যা কিছু পাচ্ছে তাতেই তার শান্তি, তাতেই তার আনন্দ। যেমন সৎকর্ম ক'রে যা কিছু পাচ্ছ তাতেই তুমি তুষ্ট হ'চ্ছ। সত্যের দ্বারা অসত্যকে কর্ষণ ক'রে বা চাষ ক'রেই সত্যকে উদ্ধার করতে পারা যায়। কর্ষণ—আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি আছে একমাত্র সত্যের। সেই সত্যকেই কেউ বা নাম দিয়েছে কৃষ্ণ আবার কেউ বলে ঈশ্বর, আল্লা ইত্যাদি। বৈষ্ণবশাস্ত্রে যে বলা হ'য়েছে—'নিরপেক্ষ না হইলে না হয় কৃষ্ণ ভজন' তাকে যদি

আমরা এই ভাবে ব্যাখ্যা করি তবেই তো সেটি হবে সার্ব্বজনীন ও বিশ্বজনীন ভজন। বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে ভেবে আমরা যে সত্যকে গণ্ডীবদ্ধ ক'রে ফেলছি। সত্য তো কোন গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। সত্যই যে কৃষ্ণ। সেই সত্যের ভজনা করতে গেলে তোমাকেও যে গণ্ডীর সীমা ছাড়িয়ে নিরপেক্ষ হ'তে হবে। সৎপথে চলতে গেলে কি নিরপেক্ষ হ'তে হয় না? 'নিরপেক্ষ না হইলে না হয় কৃষ্ণ ভজন': এ কথাটির মধ্যে ভুল কিছু নেই কিন্তু আমরা তাকে ব্যাখ্যা করি অন্য ভাবে।

এবার সত্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হ'ল। সংক্ষেপে সত্য বলতে বোঝায়—যাঁর আকর্ষণে অনন্ত বিশ্ব ঝুলে আছে, যাঁর কর্ষণে ফুল ফল সৃজিত হবার অবকাশ পাচ্ছে এবং যাঁর বিকর্ষণে সারা বিশ্ব ফুলে ফলে সুসজ্জিত হ'য়ে উঠছে—'তিনিই সত্য বা কৃষ্ণ ও সাধকের সাধ্যবস্তু।' এই ভাবে বুঝতে পারলে সমস্ত সংস্কার আপনা থেকেই ঝরে পড়বে এবং তখনই মানবমানবী নিরপেক্ষ হ'তে পারবে

প্রশ্ন উঠতে পারে তবে অনুষ্ঠানাদির কিবা প্রয়োজন?

শ্রীমাধব বলেন, অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে বৈকি! সমস্ত অবস্থায় শুদ্ধ হ'তে গেলে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান করতে করতে যখন তোমার নিজের মন থেকে প্রশ্ন উঠবে, এ গুলোর প্রয়োজন কি, তখনই তো সংস্কার মুক্ত হবে এবং সেটিই তোমার নিরপেক্ষ অবস্থা।

সভায় প্রশ্ন উঠেছিল তাহ'লে নিরপেক্ষ অবস্থার তো বাহ্যিক কোন প্রকাশই নেই, তাই নয়?

শ্রীমাধব উত্তর দেন. তা কেন? চিন্তা ক'রে দেখ, তুমি যে অন্তরে নাম করছ, কোন্ অবস্থায় যে তোমার জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ে সেই নাম উচ্চস্বরে ধ্বনিত হ'য়ে উঠবে তা তুমি নিজেও জান না, অর্থাৎ অন্তরের প্রকাশটা তুমি যে আর চেপে রাখতে পারছ না। প্রথমে তার প্রকাশ প্রতিফলিত হয় মুখদর্পণে, তারপর সেই নাম যদি

শব্দযন্ত্রে বা জিহ্বায় প্রকাশ পায় তখন তোমার কি কিছু করবার আছে? নিরপেক্ষ অবস্থাটি হ'ল স্বতঃস্ফূর্ত্ত অবস্থা, একে চাওয়াটাও যেমন আপেক্ষিক, বাধা দেওয়াটাও তেমনি আপেক্ষিক।

তুমি যখন সত্যের মাধ্যমে একটি কাজ ক'রে পূর্ণতা লাভ কর তখন তাতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ আসে, কেননা আনন্দবোধ করাটাই যে তোমার ধর্ম্ম। তেমনি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরও ধর্ম্ম আছে। যেমন, যাঁর প্রভাবে চক্ষুইন্দ্রিয় সংশোধিত হ'ল তাঁর প্রেমেই চক্ষুতে প্রেমাশ্রু বা আনন্দাশ্রু আসে কেননা এটা যে চোখের ধর্ম্ম। আবার জিহ্বার ধর্ম্ম হ'ল শব্দ প্রকাশ করা। স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে যখন সেই শব্দের প্রকাশ তখন সেটি নিরপেক্ষ কিন্তু তোমার ইচ্ছায় যখন সেটি প্রকাশিত হয় তখন তা আপেক্ষিক। তাই জিহ্বা সংশোধিত হ'লে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবেই আনন্দ প্রকাশ পায়। নিরপেক্ষ অবস্থায় প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় সংশোধিত হ'য়ে ইন্দ্রিয়ের যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে যার যার অন্তরের সত্য প্রকাশ করবে, আনন্দ প্রকাশ করবে। একেই বলে আত্মাকে জান', আত্মাকে বোঝা।

আমরা স্বার্থের স্পর্শ চাই, যেখানে স্বার্থ নেই সেখানে সেই স্পর্শের স্বাদও আমরা পাই না কিন্তু সংশোধিত হ'লে সেখানে স্বার্থ বা স্বার্থহীনতা কোনটিরই প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে স্বার্থের গন্ধ না থাকলে জীবন পথ চলে কি ক'রে?

শ্রীমাধব বলেন, স্বার্থ বলতে এখানে একথাই বোঝান হ'চ্ছে যে, আমাদের প্রয়োজনের সকল বস্তুই তো ঈশ্বর আমাদের জন্মক্ষণেই ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন, সেই বস্তু ব্যতিরেকে চরিতার্থের কারণে যা চাই সেটিই হ'ল স্বার্থ। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যে অর্থোপার্জ্জন সেটি স্বার্থের পর্য্যায়ে পড়ে না, কেননা যার যার প্রয়োজন অনুসারে তাকে তার ভাগ বুঝিয়ে দিচ্ছ, এখানে তো স্বার্থের প্রশ্ন নেই।

তবে কোথায় এই স্বার্থের প্রশ্ন উঠে? যেমন আমার সংসার

পরিপূর্ণ করার জন্য ঈশ্বর আমার পাশে একটি অর্দ্ধাঙ্গিনী দিয়েছেন। তার বাইরেও যদি আত্মচরিতার্থের কারণে আমি অন্য কিছু চাই তবে সেটাই স্বার্থ অর্থাৎ আত্মচরিতার্থে যা ভোগ করি তাকেই স্বার্থ বলা যায়।

যার যেটা প্রাপ্য তাকে সেটা অবশ্যই দিতে হবে। এই প্রাপ্য গুরুরও আছে। সেটি কি রকম? গুরু শিষ্যকে যে উপদেশ নির্দ্দেশ দেন, শিষ্য যদি সেই মত জীবনপথ পরিচালনা করে তাতে যে গুরুর তৃপ্তি, সেটাই গুরুর প্রাপ্য। তার উপরে যদি গুরু কিছু চান, সেটা পড়বে স্বার্থের পর্য্যায়ে। এখানে কিন্তু গুরুরও রেহাই নেই।

শিষ্যকে বিচার ক'রে দেখতে হবে কি করলে, কি ভাবে চললে, গুরুদেবের তৃপ্তির উপযোগী হওয়া যায় এবং কি কর্ম্ম করলে গুরু তৃপ্ত হন—সেই পথ অনুসরণ করাই শিষ্যের কর্ত্তব্য।

'জীবে উদ্বেগ নাহি দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান'

গত মঙ্গলবারে শ্রীমাধবকে জনৈক শিষ্য প্রশ্ন করেন, বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে—'জীবে উদ্বেগ নাহি দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।' এখানে প্রশ্ন হ'ল জীবকে আমরা কি ভাবে উদ্বেগ দিচ্ছি? এ কথাটির তাৎপর্য্য কি?

এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে শ্রীমাধব বলেন, এই কথা ভাষায় প্রকাশ করা যত সহজ, কিন্তু ইহা কাজে পরিণত করা তত সহজ নয়। আবার শাস্ত্র পড়ে যে সমস্ত তত্ত্ব আমরা জেনে থাকি সে সমস্ত মুখে বলা যত সহজ, প্রতিপালন করা কিন্তু তার চাইতে অনেক অনেক কঠিন।

'জীবে উদ্বেগ নাহি দিবে' এ ভাবটি কাজে পরিণত করা অনেক সময় সহজ মনে হতে পারে। যেমন কাউকে উদ্বেগ না দিয়ে নিজেই বাজার ক'রে এনে ভাতে ভাত খেয়ে রইলে এক্ষেত্রে কারুরই কিছু বলবার নেই। কেউ যদি স্ব-পাক করে তখন তাকে কি কিছু বলতে পারা যায়? স্ব-পাক কথাটি বলার অর্থ হ'ল কোন ব্যাপারেই কাউকে উদ্বেগ দেবে না। নিজের সকল কাজই নিজ হাতে করবে, নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী চলবে এবং কারুর সেবার উপর যেন নির্ভর না কর; কেননা কোন কারণে সেবার ত্রুটি হ'লে কথার আঘাত দিয়ে হয়তো তুমি তা'র উদ্বেগের কারণ হ'তে পার।

এবারে শোন এই উক্তির প্রকৃষ্ট অর্থ। এই উক্তির প্রকৃত অর্থ হ'ল—তোমার বাক্যে, আচরণে এবং কর্ম্মে তুমি যেন কারুর মনোকষ্টের কারণ না হও। তুমি যখন জানতে পার, বুঝতে পার, উপলব্ধি করতে পার যে সবার মধ্যেই কৃষ্ণ আছেন তখন কাউকে কষ্ট দেওয়ার অর্থ হ'ল কৃষ্ণকে কষ্ট দেওয়া অর্থাৎ তোমার আরাধ্যকে কষ্ট দেওয়া, সেই কারণেই শাস্ত্রে এই উক্তি করা হ'য়েছে। তবে একথার অর্থ এই নয় যে, কেউ যদি তোমাকে অনর্থক গালিগালাজ করে বা তোমার উপর অন্যায় অত্যাচার করে তাও তোমাকে নীরবে সহ্য ক'রে যেতে হবে।

অন্যায়ের প্রতিকার অবশ্যই করতে হয়। কারুর অন্যায় দেখলে সুষ্ঠুভাবে তার প্রতিকার করা উচিত। রুষ্টভাবে কখনও প্রতিকার করা যায় না অর্থাৎ প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছায় প্রতিকার করাই রুষ্টভাবের প্রকাশ। অন্যায়কারীকে তার ভুল কোথায় সেটি বুঝিয়ে দিতে হবে। তবে এমন কোন বাক্য প্রয়োগ বা এমন কোন কর্ম্ম করা উচিত নয় যাতে তোমাকে অপরের উদ্বেগের কারণ হ'তে হয় বা যার জন্য তোমাকে দায়ী করতে পারা যায়।

শ্রীমাধব বলেন, এই উক্তিটি ভক্তক্ষেত্রে এবং সাধকক্ষেত্রে যতখানি প্রযোজ্য সংসারক্ষেত্রে ততখানি প্রযোজ্য নয়। সংসার-ক্ষেত্রে একথা মেনে চলা বড় কঠিন; তবে সংসারে থেকেই যারা সাধনা করে তাদের পক্ষে এটি গ্রহণযোগ্য। যে সাধকের এই অনুভূতি এসেছে যে কৃষ্ণ সকলের মধ্যেই রয়েছেন সে যেন কাউকে উদ্বেগ বা কষ্ট না দেয়। মনে প্রশ্ন জাগে, যার এই জ্ঞান এসেছে তার কি কখন অন্যকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা জাগতে পারে?

শ্রীমাধব বলেন, একটি কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, রক্তমাংসের দেহে ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া বিক্রিয়া জাগে বৈকি। যতক্ষণ তুমি মনাধীন আছ ততক্ষণ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া যে তোমাকে মেনে চলতেই হয়। মনাতীত অবস্থায় যেতে পারলে ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সেখানে পৌঁছুতে পারে না। তখন মনে এই ভাব জাগে, 'জগতের সব কিছুই হয় তাঁর ইচ্ছায়, আমার ইচ্ছায় তো নয়।' এই ভাব মনে জাগলে কাউকে কষ্ট দেওয়ার অর্থ হ'ল তোমারই ইষ্ট বা তোমারই আরাধ্য কৃষ্ণকে কষ্ট দেওয়া।

সাধারণ মানবমানবীর ক্ষেত্রে শ্রীমাধবের উপদেশ হ'ল, কেউ কষ্ট পায় এমন কর্ম্ম বা ব্যবহার যেন আমরা কখনও না করি। আমাদের সকলেরই উচিত যথাসম্ভব সতর্ক হ'য়ে চলাফেরা, খাওয়া পরা, কথাবার্ত্তা ও আচরণ করা, যাতে কারুর কোন উদ্বেগের কারণ হ'য়ে না উঠি। রক্ত মাংসের দেহে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া তো থাকবেই।

উপমাস্বরূপ শ্রীমাধব বলেন, আমি নিজেই তো অনেক সময় আমার শিষ্যভক্তদের নিকট উদ্বেগের কারণ হ'য়ে উঠি। তারা যাতে জীবনপথে সুষ্ঠুভাবে পরিক্রমা ক'রে এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য কত বাক্যবাণ নিক্ষেপ ক'রে থাকি—এও তো একপ্রকার উদ্বেগ, তাই নয় কি? তবে যতক্ষণ আমার কথা বুঝতে না পারছে ততক্ষণই উদ্বেগ। আমার কথার তাৎপর্য্য বুঝতে

পারলে আর উদ্বেগ থাকে না। সেজন্য গুরু উপদেশ নির্দেশ দেন বটে তবে আদেশ বড় একটা করেন না; বলেন, 'চেষ্টা করো' কেননা আদেশ দিলে তা যদি পালিত না হয় তবে যে কারুরই রেহাই নেই।

এটা ক'রোনা, ও পথে যেওনা এসব কথা বলেন বটে, তবে এ তো ঠিক আদেশ নয়। একথা তো বলতেই হয়; সন্তান গর্ত্তে পা দেবে আর পিতা হ'য়ে জেনে শুনে কি সাবধান না ক'রে পারা যায়?

আলোচনার সূত্র ধ'রে শ্রীমাধব একটি কাহিনী শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরেন।

কাহিনীটি হ'ল মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী এক বিখ্যাত পয়গম্বরকে কেন্দ্র ক'রে। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। পিতা ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে নারায়ণ শিলা ও অন্যান্য নানা দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজা করেন। পূজার সময় তিনি শিশুপুত্রকে ঘরে ঢুকতে নিষেধ করেন তাতে ছেলে বড্ড রেগে যায়; ভাবে আমার যদি শক্তি হয় তবে কড়া হাতে এর ব্যবস্থা করব। পিতা পুত্রের হাবভাব লক্ষ্য করে একদিন বলেন, 'বাবা! আমার ঠাকুরের উপর তোমার এত রাগ কেন? ভক্তি-ভরে দেবতাকে বুঝবার চেষ্টা কর'।

ধর্ম্মপথে পুত্রের আগ্রহ বাড়াবার জন্য পিতা প্রায়ই তাকে নানাবিধ কাহিনী শোনান। লঙ্কার রাবণরাজার কাহিনী শুনে সে জানতে পারে যে, বৈরীভাবে যারা তাঁর ভজনা করে তারাও তাঁকে লাভ করে। একথাটি একেবারে তার মনে গেঁথে যায়।

একদিন পিতা যজমান বাড়ী যাবেন, অন্য এক পূজারী ব্রাহ্মণের উপর ঠাকুর সেবার ভার দিয়ে গেছেন। পুত্র ভাবে, আমিও তো ব্রাহ্মণেরই পুত্র, আমি কেন পূজো করতে পারব না? আজ আমিই পূজো করব। পূজারী ব্রাহ্মণ আসার আগেই সে ঠাকুর সেবায় লেগে

যায়। ঘরে ঢুকে প্রথমে তো সব ঠাকুর দেবতাদের নাড়াচাড়া ক'রে দেখে কেউ সাড়া দেয় কিনা। সাড়া না পেয়ে চটে গিয়ে এক ঠাকুরের মূর্ত্তিকে গলায় গামছা বেঁধে টানতে টান্‌তে রাস্তায় নামিয়ে আনে।

পাড়ার লোকজন জড় হ'য়ে, বাধা দেয়, বলে, 'এ কি করছ! ঠাকুর ঘরে নিয়ে যাও' এই বলে তারাই জোর ক'রে ঠাকুরের মূর্ত্তি ঘরে তুলে দেয়। দু'দিন পরে পিতা এসে সব বৃত্তান্ত শুনে অবাক হ'য়ে বলেন, 'সে কি কথা?'

পুত্র বলে, 'কেন, আপনিই তো বলেছেন বৈরিতাও তাঁকে পাবার একটি উপায় স্বরূপ? তাই তো বৈরিতা ক'রে দেখলাম, আর ভজনাঙ্গটা কি তাও দেখতে চাইলাম।'

পিতা বলেন, 'এ আমারই ভুল হ'য়ে গেছে, ধর্ম্মের তুই কি বুঝিস্।'

আর একদিন পিতার অনুপস্থিতিতে সে ঠাকুর ঘরে গিয়ে বলে, 'ঠাকুর! এবার তোমাকে মজা টের পাওয়াব। আমি ভজন পূজনও জানিনা—দীক্ষাও নিইনি, তবে আমি ব্রাহ্মণের পুত্র। বাবা তো তোমায় রোজই খেতে দেন, আজ আমি খেতে দিচ্ছি, ভাল চাও তো খাও, নয়তো টুকরো টুকরো ক'রে ফেলব।' পাথরের ঠাকুর খাননা দেখে সে ব্যস্ত হ'য়ে উঠে বলে, 'এ কি! খাচ্ছ না যে! ও: বুঝেছি, বাবা বুঝি তোমায় খাইয়ে দেন? তা বেশ, আমিও দিচ্ছি, এবারে খাও'। কিন্তু তবু ঠাকুর খাননা দেখে সে রেগে গিয়ে সত্যি সত্যি মুগুর নিয়ে আসে ঠাকুরকে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে ফেলবে বলে।

এমন সময় পিতা এসে উপস্থিত, বলেন, 'এ কি করছিস্? ঠাকুর সব ঠিক আছে তো?

পুত্র রাগান্বিত কণ্ঠে বলে, 'না, আজ আমি মুগুর দিয়ে ঠাকুরকে

অজ্ঞান অন্ধকার হতে মুক্ত হয়ে আলোতে পৌঁছায় তখনই মানুষ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে যে আমি পরম ব্রহ্মের অভিন্ন স্বত্বা অর্থাৎ মানুষের মনুষ্যত্বই পরম সত্যের অভিন্ন স্বত্বা। এই অবস্থার নামই অদ্বৈতবাদ এবং 'জীব ব্রহ্ম, অন্য কেহ নয়।'

জীব বলতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে প্রাণের সাড়া মেলে, সে সবই তো জীব। মানুষও তো জীবের বাইরে নয়! তবে কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী সহ সবাই যে কৃষ্ণদাস তা বুঝবার এবং বোঝাবার উপায় কি? কোন্ তত্ত্বের উপর লক্ষ্য রেখে মহাপ্রভু একথা বললেন 'জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস'? আবার দেখি অদ্বৈতমার্গে বলা হ'য়েছে, জীবই ব্রহ্ম। এই দুটি কথার সামঞ্জস্য কোথায়?

শ্রীমাধব বলেন, আমার মতে মহাপ্রভুর এ কথার 'জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস', প্রকৃত অর্থ হ'ল, আপাত দৃষ্টিতে জীব এবং জীবের স্বরূপ এই দুটি কথার মধ্যে পার্থক্য অনেক ব'লেই মনে হয়, আবার কোন পার্থক্যই নেই এ কথাও বলা চলে। যেমন, মনুষ্যত্বই হ'ল মানুষের স্বরূপ, পশুত্ব হ'ল পশুর স্বরূপ। এ ভাবে ব্যাখ্যা করলে জীবে আর জীবের স্বরূপে কোন প্রভেদ নেই, কোন পার্থক্যই ধরা পড়ে না। যে দেহ যখন যে রূপ ধারণ করে সেই দেহানুযায়ী স্বরূপেরও প্রকাশ বিকাশ হয়।

মূল কথা হ'ল—সমস্ত জীবই কৃষ্ণের দাস। মহাপ্রভুর একথা বলার উদ্দেশ্য হ'ল যে জীবমাত্রেই কোন স্বাধীন সত্তার অধিকারী নয়—সত্তা হ'ল তাঁর। জীব মনে করতে পারে যে, সে নিজ সত্তায় চলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্তা যে তাঁর। সত্যের অনুগামী হ'য়ে চলাই সত্তার বিধান। এখানে কি মানুষ, কি পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সবাই যখন তাঁরই সত্তা তখন সবাইকেই যে সত্যেরই অনুগামী হ'য়ে চলতে হবে।

কৃষ্ণ হ'লেন সত্য বা পরমসত্য। তাঁরই কর্ষণ, আকর্ষণ, বিকর্ষণে সারা বিশ্ব স্থিতিশীল আছে বা চলমান আছে এবং সত্যের সত্তা বলেই সমস্ত জীব আজ এই বিশ্বভুবনে প্রাণবন্ত হ'য়ে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। এখানে তার নিজস্ব কোন কৃতিত্বের বড়াই করার প্রশ্ন কি থাকে? সত্তাকে যে সর্ব্বদাই সত্যের আনুগত্য স্বীকার ক'রে চলতে হয়। যে অনুগত, অনুগামী হ'য়ে চলাই যার বিধিলিপি সে কি দাস ছাড়া আর কোন উপাধিতে ভূষিত হ'তে পারে? তাই মহাপ্রভু বলেছেন 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস'।

সত্য এক কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর রূপের যে অন্ত নেই। অনন্তরূপে তিনি রূপায়িত হ'য়ে আছেন। অনন্তরূপের মধ্যে অনুগত দাসের মত অনন্ত সত্তা জড়িয়ে আছে। সত্তা সে সত্যের একাংশ [illegible] না হ'য়ে পারে না। কোনটি আমাদের মধ্যে নেই; স্থান কাল অনুসারে নানা সংস্কারে বিভ্রান্ত হ'য়ে আমিত্ববোধে অন্ধ, সত্যকে এবং প্রকৃত সত্তাকে বিস্মৃত হ'য়ে গেছি। মনে করি আমার বুদ্ধি ও জ্ঞান [illegible] আমি পরিচালিত হচ্ছি, আমি স্বাধীন, আমি কারুর আনুগত্য স্বীকার করি না। সত্যের অনুগত সত্তা ছাড়া যে আমার অন্য কোন অস্তিত্ব নেই সেকথা স্মরণ, মনন করার জন্যই সাধন ভজনের প্রয়োজন। গুরুসঙ্গ, সৎসঙ্গ, সাধুসঙ্গ, মহাপুরুষ সঙ্গ ও সাধন ভজনের মাধ্যমে আমাদের ভুল ভেঙ্গে যাবে এবং প্রকৃত যে আমার সত্যের সত্তা সেই স্বরূপ ফিরে পাব।

সনাতন যখন মন্ত্রিত্ব ছেড়ে নানা কষ্টের অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করছিলেন তখন তিনি মহাপ্রভুকে প্রশ্ন ক'রেছিলেন,— 'কেন মোরে জারে তাপত্রয়'... ইত্যাদি। প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু সনাতনের নিকট এই উক্তি ক'রেছিলেন।

মহাপ্রভুর এই উক্তিকে সার্ব্বজনীন ভাবেই গ্রহণ করতে হবে। তাঁর উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, সত্যের সত্তা হ'ল সত্যের অনুগামী বা

দাস অর্থাৎ কৃষ্ণের ইচ্ছা ছাড়া জীবের এক পা-ও যে চলার ক্ষমতা নেই সেটি আমাদের অনুধাবন করতে হবে। আমিত্বের মদগর্ব্বে আমরা সত্য ও তাঁর অনুগত সত্তাকে বিস্মৃত হ'য়েছি ; সাধন, ভজনের দ্বারাই আবার তাকে চেতনার চৈতন্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। যতক্ষণ অভিন্নবোধ না আসে ততক্ষণ দাস হ'য়ে আমাদের তাঁর সেবা করতে হবে। এভাবে সেবা করতে করতেই বোঝা যায় যে, সত্তাই সত্যের অনুগত সেবক।

শ্রীমাধব বলেন, আনুগত্য কথাটির প্রকৃত অর্থ হ'ল দাস-ভাব। আনুগত্য না আসা পর্যন্ত গুরুসেবা বা কৃষ্ণ সেবা বা দেবদেবী সেবা প্রভৃতি সব সেবাই ব্যর্থ বলা যায়।

প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীমাধব জীব আনুকূল্য এবং কৃষ্ণ আনুকূল্য এই দুটি কথার বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, জীব আনুকূল্য অর্থে বোঝায় যে আমার আনুকূল্য অর্থাৎ আমার সহায়তার জন্য আমি তাঁর সেবা করছি। আর কৃষ্ণ আনুকূল্য হ'ল কৃষ্ণের অনুগত হ'য়ে কৃষ্ণেরই জন্য, কৃষ্ণ সেবা করা। জীব আনুকূল্যে প্রকাশ পায় আমিত্ব ভাব কিন্তু কৃষ্ণ আনুকূল্যে প্রকাশ পায় কৃষ্ণেরই একান্ত অনুগত দাস—এই ভাব।

দেশ দেশান্তর ঘুরে ঘুরে যখন জীবের কানে কৃষ্ণ নাম বিতরণ করা হয় যাতে তারা কৃষ্ণপন্থী হয়, সেটি হ'ল কৃষ্ণ আনুকূল্য। একেই বলে কৃষ্ণ বা গুরু আনুকূল্য। সেই কারণেই বলে, 'অনুগত হ'য়ে পূজে—তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে।'

বহিরানুগত্য থেকেই অন্তরানুগত্য আসে। সব কিছুরই কর্ত্তা একমাত্র তিনি, তাই সবই তিনিই করেন তবে তা প্রকাশ পায় সাধু—গুরু—ও বৈষ্ণবের মাধ্যমে। সেইজন্য সাধু—গুরু—বৈষ্ণবের সমস্ত কর্ম্মই হ'ল কৃষ্ণ আনুকূল্য। তাঁদের মধ্যে যদি এরকম কোন ভাব থাকে যে, আমি সাধু হব বা বৈষ্ণব হব তবে বুঝতে হবে যে এখনও

তিনি মহাপুরুষের পর্য্যায়ভুক্ত হ'তে পারেন নি, কেননা মহাপুরুষ কখন নিজ স্বার্থে কোন কর্ম্ম করেন না, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল সকলকে কৃষ্ণমুখী ও কৃষ্ণপথী করান, কারণ এখানেই যে তাঁর পৌরুষ। তাই বলে, 'সাধুর ঐশ্বর্য্য শুধু পরহিত তরে'। তাঁর মধ্যে যতটুকু কৃষ্ণপ্রেম হ'য়েছে সেই পন্থাই তিনি জীবকে জানান। একথা তিনি কখন চিন্তাও করেন না যে কৃষ্ণকে তিনি লাভ করবেন।

দাস ভাব যদি আসে তবে আর জীবের আমিত্ব ভাব থাকে না। সেটি কি রকম? মনে কর তোমাদের বাড়ীর দাসী ছোট শিশুদের মানুষ করছে, সেই শিশুদের কি সে নিজের ব'লে ভাবে? ভাবে না। সংসারের সমস্ত কাজই সে ক'রে যায় নিখুঁত ভাবে কিন্তু মনে ভাবে এ যে কর্ত্তার সংসার, সেখানে আমিত্ব ভাব থাকবে কি ক'রে? এরকম দাস ভাবে কৃষ্ণ অনুগত হ'য়ে কর্ম্ম করলে বা আমি তাঁর দাস এই ভেবে কর্ম্ম করলে আর আমিত্ব ভাব থাকে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে আমিত্ব ভাব না থাকলে সংসার করি কি ক'রে? সংসারে যে অযোগ্য হ'য়ে যেতে হবে।

শ্রীমাধব বলেন, সেটিই হ'ল আমাদের মস্ত বড় ভুল। সংসারে অযোগ্য তো হবেই না বরং যোগ্যতা আরও বেড়ে যাবে। তখন মনের ভাব হয়, 'এ যে তাঁরই সংসার, সংসারের মাধ্যমে তা আমি তাঁরই সেবা করছি, এটি হ'ল আমার কর্ত্তব্য'। কর্ত্তব্যবোধে যে সেবা তাতে অহং আসতে পারে না। মহাপ্রভু এই ভাবের উপর লক্ষ্য ক'রেই বলেছেন, 'জীব সর্ব্বদা কৃষ্ণের দাস'। আর অদ্বৈতবাদে বলেছে, 'জীবই ব্রহ্ম'। এ কথার অর্থ হ'ল বিশ্বে যত জীব আছে সে সমস্ত জীবের সমষ্টি হ'লেন ব্রহ্ম অর্থাৎ সব কিছু নিয়েই ব্রহ্ম। এই ভাব যখন সাধক সাধিকার মধ্যে উদয় হয় তখন সে যা কিছু দেখে তার মধ্যেই সে ব্রহ্মদর্শন করে। বৈষ্ণবশাস্ত্রেও বলা হ'য়েছে, 'যত্র তত্র নেত্রস্ফুরে—তথা কৃষ্ণ স্ফুরে'। কাজেই প্রকৃতপক্ষে এ দুটি

কথায়, কোন তফাৎ নেই। এই যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বা অনন্ত জীব তাদের সবার সমষ্টিই তো ব্রহ্ম, আবার এ সবই যে ব্রহ্মের মধ্যে আছে। এ কথার অর্থ হ'ল ব্রহ্ম একাধারে একক এবং খণ্ড। সূক্ষ্ম অর্থে বলা চলে, আমরা যে ব্রহ্মেরই অংশ, ব্রহ্মেরই অনুগত।

উপমা স্বরূপ শ্রীমাধব বলেন, জলের মধ্যে যখন বুদবুদ উঠছে তখন তার রূপ হয় আলাদা কিন্তু এই বুদবুদ তো জলেরই অনুগত, জলেই যে সে মিলিয়ে যাবে। দুটি কথায় এখানে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের ভেদবুদ্ধির কারণেই নানা বিচারের সম্মুখীন হ'তে হয়।

শ্রীমাধবের উপদেশ অনুসারে একথাই [illegible] সংসারের সমস্ত করণীয় কর্ত্তব্যই মানবমানবীকে ক'রে যেতে হবে কিন্তু তার মনের খুঁটিটি বাঁধা থাকবে সংসার [illegible] সমাধা করতে হবে তাঁরই অনুগত দাস হয়ে। [illegible] কর্ম্মেই ত্রিতাপ জ্বালার অধীনস্থ হতে হয় [illegible] ত্রিতাপ জ্বালার অবসান হয়।

গুরু কি এবং দীক্ষার প্রয়োজন হয় কেন?

গত মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় [illegible] প্রশ্ন করেন,—দীক্ষা গ্রহণের পরে কোন শিষ্য বা শিষ্যার ভাবান্তর দেখা যায়; যেমন কোথাও ভাগবৎ পাঠ, নাম গান, বা কীর্ত্তন ইত্যাদির সংবাদ পেলে পাগলের মত সেখানে ছুটে যান, আবার কেউ কেউ [illegible] ভাবান্তরের সমালোচনাও করেন—এর কারণ কি?

প্রশ্ন আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমাধব সুরু করেন—আমাদের দেশে গোরক্ষনাথের পূজো হ'ত। দেশে, গায়ে গরু প্রথম বিয়োলেই সেই

গরুর দুধে ক্ষীরের নাড়ু ক'রে গোরক্ষনাথের পূজোর আয়োজন হয়; কেউ কেউ আবার সেই ক্ষীরের সঙ্গে খানিকটা ভাঙ মিশিয়েও নাড়ু করে। পূজোর শেষে প্রসাদ বিতরণের সময় কারুর ভাগে পড়ে শুধু ক্ষীরের নাড়ু আর কারুর ভাগে হয়তো পড়ে ভাঙ মেশান নাড়ু। যারা শুধু ক্ষীরের নাড়ু খায় তারা নাড়ু খেয়ে আনন্দ পায়, আর ভাঙের নাড়ু যাদের ভাগে পড়ে তারা সে নাড়ু খেয়ে সেই যে বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়ে, পরদিনও সে ঘুম আর ভাঙতে চায় না। কেননা ভাঙের খুব নেশায় তারা যে তখনও মসগুল হ'য়ে আছে। শুধু ক্ষীরের নাড়ু যারা খেয়েছে, তাদের সেই নেশা আসবে কি ক'রে? তেমনিই সেইরকম যারা গুরুপ্রদত্ত নাম পেয়েছে, তাদের নামের প্রতি এত রুচি, এত নেশা জেগে উঠে যে, দিন রাত তারা কেবল শ্রীগুরু পাদপদ্মের ধ্যান চিন্তা করে, আর নামের জন্য যেন পাগল হ'য়ে যায়। যেখানে নাম গান, নামকীর্ত্তন সেখানেই তাদের মন পড়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমাধব একটি গল্পের অবতারণা করেন।

পূর্ব্বকালে সম্রাট অরিন্দম তাঁর একমাত্র পুত্র সুদর্শনকে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা দীক্ষায় সুশিক্ষিত ক'রে তুলেছেন। সকল পিতামাতাই পুত্রকে সর্ব্বপ্রকারে শিক্ষিত ক'রে গড়ে তুলতে চান। সম্রাট অরিন্দমের সেই ইচ্ছাটি তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুদর্শন ছেলেটিও ভাল ছিল, তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিতার অপত্যস্নেহ তাকে একটু অবাধ্য ক'রে তোলে। যেমন ঘোড়াশালে গিয়ে হুকুম করে 'ঘোড়া সাজাও, শিকারে যাব।' শিকারে যাবার জন্য একেবারে পাগল হ'য়ে উঠে পিতাকে মনের ইচ্ছা জানায়। সম্রাট অরিন্দম একটু চিন্তা করেন, 'এটা তো ভাল কথা নয়! শেষে আমার কথাও আর শুনবে না, যা ইচ্ছা তাই করবে।' ছেলে মনে করে, জ্ঞান আহরণের জন্য, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য, আমি যা ইচ্ছা তা অবশ্যই করব, আমি তো বিপথে পা ফেলছি

না, বা অধর্ম্ম কিছু করছি না; এই ভরসায় সে ক্রমশঃ স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে উঠে।' পুত্রের এ সমস্ত ব্যবহার মনঃপুত না হওয়ায় আদিত্যনাথ একদিন তাকে ডেকে বলেন, 'সুদর্শন। বড় আশা ক'রে তোমার মা তোমার নাম রেখেছিলেন সুদর্শন, তোমার চেহারা ভাল, বিদ্যাবুদ্ধিতেও তুমি কারুর চাইতে কম নও কিন্তু আমার স্নেহের আতিশয্যের সুযোগ নিয়ে তোমার এই স্বাধীনচেতা ব্যবহার অত্যন্ত পীড়াদায়ক। যদি আমার কথায় তুমি কষ্ট পাও, তবে হয় তুমি নিজেকে সংশোধন কর, নয় আমি তোমার পথ থেকে সরে দাঁড়াই।' একথা শুনে মা ছেলেকে বলেন, 'বাবা, পিতার কথা মেনে নিলেই তো সব গোল মিটে যায়। পিতা মনে ব্যথা পান এমন কাজ করবে কেন? আজ যদি তুমি এখান থেকে বিদায় নিয়ে ক্রমের পথেও চল, তবে যে এ রাজ্যের কোন কিছুই তোমার ভোগে লাগবে না, কোন কিছু স্পর্শ করবার অধিকারও তো তোমাকে হারাতে হবে অর্থাৎ পিতার অর্জ্জিত কোন কিছু, এমন কি জলও যে পান করতে পারবে না।'

পুত্র বলে, 'কেন? পুকুর বা দীঘির জল খাব?'

মা বলেন, 'না, যে পুকুর, দীঘি সবই তো তোমার পিতা খনন করিয়েছেন। একমাত্র ঝরণার জলে তাঁর কোন অধিকার নেই।'

পুত্র উত্তর দেয়, 'কেন? সে ও তো পিতারই রাজ্যের জল?'

মাতা বলেন, 'না, সেটা হ'ল ইন্দ্রের জল, সে জল যেখান দিয়ে খুসী গড়াতে পারে। জল যতক্ষণ কালাতিপাত না করছে ততক্ষণ জলকর নেই।' যেখানে জল কালাতিপাত করবে, সেখানেই জলকর দিতে হবে। পিতা অধৈর্য্য হ'য়ে বলে উঠেন, 'আজই এ ব্যাপারে ফয়সলা হ'য়ে যাক্, কোন সময় দেওয়া হবে না। হয় তুমি আমার নির্দ্দেশ মত চল, নতুবা রাজ্য পরিত্যাগ কর।' পুত্র নীরব। পুত্রকে নীরব দেখে আদিত্যনাথ বলেন, 'বুঝেছি, তুমি আমায় পরিত্যাগ

করাই শ্রেয় মনে করছ। যাবার আগে আমার শেষ কথা শুনে যাও। অন্তত ছ'মাস তুমি অন্যত্র গিয়ে নিজের উপার্জ্জনে কালাতিপাত কর। ছ'মাসের শেষে রাজ্যে ফিরে আসার সুযোগ তোমাকে দিলাম, কিন্তু ছয়মাস অতিবাহিত হ'য়ে গেলে আর আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না। যাবার আগে জবাব দেবার মত যদি কিছু থাকে তবে তুমি তা স্বচ্ছন্দে বলতে পার।'

সুদর্শন বলে, 'জবাব আমি আজ দেব না পিতা! সময় কালে এর জবাব দেব এবং সে জবাবে কেবল আপনি ও মা যে সন্তুষ্ট হবেন তা নয়, আপনার অগ্র পশ্চাতের সপ্তম পুরুষই সে জবাবে তুষ্ট হবেন' একথা ব'লে পিতামাতাকে প্রণাম ক'রে সুদর্শন রাজ্য পরিত্যাগ করে। পথ চলতে চলতে আপন অঙ্গের বেশভূষার দিকে নজর পড়তেই সুদর্শন ভাবে, 'তাইতো, এ সবই তো পিতার অর্জ্জিত'। একে একে সমস্ত বসন সে ত্যাগ করে। রাতের অন্ধকার যখন ফিকে হ'য়ে আসে তখন তার মনে পড়ে, 'ভোর তো হ'য়ে এল, উলঙ্গ চলেছি, একটা আবরণ তো চাই!' তাই ভূর্জ্জপত্র সংগ্রহ ক'রে সুদর্শন তার লজ্জা নিবারণ করে। তিনদিন, তিনরাত্রি অতিবাহিত হবার পর সুদর্শন দেখে এক বৃদ্ধ ধোপা অতিকষ্টে কাপড়ের বোঝা নিয়ে হাটছে আর বলছে, 'হায় ঠাকুর! একটি সন্তান যদি দিতে, তবে আর এত কষ্ট সহ্য করতে হ'ত না'। একথা শুনতে পেয়ে সুদর্শন কাছে গিয়ে বলে, 'বাবা! কাপড়ের বোঝা আমায় দিন, আমারও তো কেউ নেই'? সুদর্শনই ধোপার কাপড় বয়ে নিয়ে যায় এবং ধুয়েও দেয়। ধোপার সঙ্গে বাড়ী ফিরতেই ধোপানী বলে, 'এ আবার কে গা?' সুদর্শন বলে, 'আমি তোমার ছেলে মা! তিনদিন খাইনি, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, শিগ্গির আমায় কিছু খেতে দাও মা'। ধোপানী তাড়াতাড়ি রান্না ক'রে সযত্নে সুদর্শনকে খাওয়ায়। খাবার পর সুদর্শন সমস্ত ধোয়া কাপড় ইস্ত্রি ক'রে দেয়।

করছি, আপনার দয়াদাক্ষিণ্য আমার চিরকাল মনে থাকবে কিন্তু আপনার দান গ্রহণে আমি অক্ষম, আমার কিছুই চাই না।।'

রাজাও মনে মনে সুদর্শনকে ভালবেসে ফেলেছেন কিন্তু উপায় তো নেই, ধোপার ছেলে, জাত্যাভিমানে বাধে যে। ভাবেন, ধোপার ছেলে না হ'লে তো এরই হাতে মেয়েকে সম্প্রদান করা যেত। শেষ পর্য্যন্ত সুদর্শন সে রাজ্য থেকে বিদায় নেয়। সে ভাবে, লোকালয় তো দেখলাম; এবারে জঙ্গলে পশুদের মধ্যে গিয়ে দেখি। সম্রাটের ছেলে আমি, সেখানেও ঠাঁই হ'ল না, লোকালয়েও আমার স্থান নেই। পশুর মধ্যে না আছে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী, না আছে ঈশ্বর অনুভূতি, তাই এবার পশুর সঙ্গেই বাস ক'রে দেখি।

জঙ্গলে যেতেই এক সাধু সুদর্শনকে বলেন, 'আয় বেটা। তাড়াতাড়ি আয়, আমি যে তোর জন্যই অপেক্ষা ক'রে বসে আছি। পর্ব্বতের উচ্চশিখরে তোর জন্ম, সম্রাটের পুত্র তুই, সেখানে স্থান হ'ল না, শিখর থেকে গড়াতে গড়াতে সমতলে এসে পৌছুলি, সমতলের লোকালয়ও তোকে অতটুকু জায়গা ছেড়ে দেয়নি তাই একেবারে জঙ্গলে এসে হাজির হ'য়েছিস। আয় বেটা, এখানে আয়, এটাই তোর আসন।'

সুদর্শন অবাক হ'য়ে বলে, 'সেকি? এটা আমার আসন কি ক'রে?

সাধুবাবা বলেন, 'দীক্ষা নিলেই জানতে পারবি'।

সুদর্শনের মন মানতে চায় না, বলে, 'দীক্ষা নিলে জানা যায়, আর না নিলে জানা যায়না, এটা কিরকম? একথা আমাকে প্রকৃষ্ট ভাবে বুঝতে হবে। যে জ্ঞান এতদিনে হ'য়েছে তা হ'ল অৰ্জ্জিত জ্ঞান। এবার তুমি আমায় অন্তরানুভূতি এনে দাও'?

সাধুবাবা হেসে উঠেন, বলেন, 'ওরে পাগল! ওরে খ্যাপা, অন্তরানুভূতি কি কেউ কাউকে এনে দিতে পারে? অন্তরানুভূতির পথ দেখান যায়।'

সুদর্শন আকুল হ'য়ে বলে, 'বেশ, তাই দেখাও'।

সাধু বলেন, 'সে এত সূক্ষ্মপথ যে তোর জ্ঞানবুদ্ধির বোঝা নিয়ে সে পথে যাবি কি ক'রে? তবে সেই পথে যাবার মন্ত্র আমার জানা আছে, মন্ত্র আয়ত্তে এলে ঐ পথে যেতে পারবি'। কিন্তু যতক্ষণ পর্যান্ত তোর মন্ত্র নেবার প্রেরণা না জাগবে অর্থাৎ মনে শুধুই বিচার আসবে, পূর্ণ নির্ভরতা না জাগবে ততক্ষণ মন্ত্র নিসনা, ততদিন সঙ্গ কর। সমস্ত বিচারকে পেছনে ফেলে রেখে যেদিন ঐ প্রেরণার ব্যাকুলতা তোর একমাত্র সঙ্গী হবে সেদিনই মন্ত্র পাবি'।

সঙ্গ করতে করতে সত্য সত্য সুদর্শনের প্রেরণা বিচারকে ডিঙিয়ে গিয়ে ব্যাকুলতা জাগল। যখন তা রূপ ধারণ করে তখন ব্যাকুলতার কারণকে না পাওয়া পর্য্যন্ত শান্তি হয়না। সুদর্শনের যখন সেই অবস্থা হ'ল তখন সে একদিন সাধুবাবাকে বলে, 'ঠাকুর! এবার তুমি আমায় নাও, আর যে আমি পারি না। আমার আর তো কোন বিচার নেই'।

সাধু বলেন, 'সত্য সত্যই তুই এবার যুবতী হ'য়েছিস। ব্রহ্মবীর্য ধারণ করার শক্তি এবার তোর হ'য়েছে। সেই বীর্য্য ধারণ করলে সুফল ফলে। গুরুজিহ্বা লিঙ্গস্বরূপ ও শিষ্যকর্ণ যোনি স্বরূপ। সেই ব্রহ্মবীর্য যখন মহাসঙ্গমে হৃদয়ে যাবে, সেদিনই সুফল প্রসব করবে'।

শ্রীমাধব বলেন, মায়ের জঠরে স্থান পেয়ে আমরা নিম্নমুখে প্রসূত হ'য়েছিলাম। আর এই শৌর্য্যবীর্য্য কোথায় স্থান পায়, কোথায় প্রকাশ পায় জান? এই শৌর্য্যবীর্য্যের প্রকাশ হয় সহস্রারে, মেধাশক্তিরূপে।

এই ধরাধামে কোন নারী যদি পুরুষসঙ্গ না ক'রে মা হবার আশা করে তবে সেটি যেমন অসম্ভব, সেরকম গুরু-মন্ত্র বীজ ধারণ না করলে কর্ণরূপ যোনি দ্বারা কি ক'রে তা তোমার হৃদয় গর্ভে প্রবেশ ক'রে সুফল প্রসব করবে?

ভালবাসে তা আমাকে ভোগ করার জন্য নয়। আমার মধ্যেকার অপ্রকাশিত গুণগুলো ফুটিয়ে তোলার জন্যই তার ভালবাসা'। রাজা কন্যাকে ডেকে বলেন, 'ষোড়শী! সুদর্শন যা বলছে তা কি সত্যি'? ষোড়শী উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ বাবা, সম্পূর্ণ সত্য। আমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'তে চলেছে। উনি কি ছিলেন এবং কি হবেন তা আমি স্বপ্নে দেখেছি। আমাদের সম্পর্ক ভোগের সম্পর্ক নয়। আমিও ওঁর গুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করব ব'লে মনস্থির ক'রেছি। আমাদের দুজনের সম্পর্ক হবে গুরু ভাইবোন এবং আমাদের কর্ম্ম হবে ভগবৎ পিপাসুর পিপাসা মেটান অর্থাৎ যে পথে আমরা সত্যের সন্ধান পেয়েছি, দেশে দেশে সেই পথের সন্ধান জনসাধারণের কাছে প্রচার ক'রে তাদের এই পথে এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা যোগাব'। রাজকন্যা ষোড়শীকেও শ্রীগুরুদেব দীক্ষা দিলেন এবং সুদর্শন ষোড়শীকে সঙ্গে নিয়ে পিতামাতার কাছে গেল। পিতা বলেন, 'সুদর্শন! ঘুরে এসেছিস'? সুদর্শন বলে, 'হ্যাঁ বাবা, এসেছি, কিন্তু এ আসা তোমাদের সম্পদ এবং রাজ্যলোভে নয়। তুমি আমার জন্মদাতা পিতা আর মায়ের অসীম করুণায় আমি জগতের আলো প্রথম দর্শন ক'রেছি, তাই তোমরা উভয়েই আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র, আশীর্ব্বাদ কর, যে সেবামন্ত্রে আমি দীক্ষিত হ'য়েছি, তোমাদের সেবা ক'রে যেন তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার আমি করতে পারি'। পিতামাতা ভেবেছিলেন ষোড়শী বুঝি সুদর্শনের স্ত্রী। পরে তাঁরা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা জানতে পারলেন।

—সুদর্শনকে সবাই 'মহারাজা' ডাকে। শ্রীমাধব বলেন, এবারে বুঝে দেখ, কি ভাবে সুদর্শন সত্যরাজ্যের মহারাজা হ'ল। তিনি বলেন, এ গল্প বলার উদ্দেশ্য হ'ল গুরু কি এবং দীক্ষার প্রয়োজন কেন হয় সেটি বিশদ ভাবে বুঝবার জন্য।

দর্শনে কৃপা

গত মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্ত প্রশ্ন তোলেন, শ্রীগুরুকৃষ্ণ যখন ঈশ্বর স্বরূপ তখন তাঁর দর্শনমাত্র ঈশ্বর-কৃপা লাভ করা যায়, এ ধারণা কি ভুল ?

এই প্রশ্নে শ্রীমাধব রামভক্ত হনুমানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। কিষ্কিন্ধ্যার বানররাজ বালীর সেনাপতি ছিল হনুমান। একদিন রাজা বালী হনুমানকে প্রশ্ন করে, 'হনুমান! তোমার কি শুধু যুদ্ধ করতেই ভাললাগে ? আর কিছু ভাল লাগে না ? ঈশ্বর লাভের ইচ্ছা হয় না ?'

হনুমান বলে, 'মহারাজ! আমি বড় বোকা, বিদ্যাবুদ্ধিও আমার কিছু নেই, অতশত বুঝি না। আমি চাই দর্শনমাত্র যেন তাঁর কৃপা পাই। আমাকে বিদ্যার জন্য তো আপনি আপনার সেনাপতি পদে বহাল করেন নি, ক'রেছেন আমার শক্তির জন্য, কাজেই অতসব আমি বুঝি না।' যাক্ দর্শনমাত্র কৃপা লাভের সুযোগ হনুমানের এসে গেল।

শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতা উদ্ধারের কারণে যাত্রা করেন তখন একদিন দেখা যায় যে বহুদূরে দুটি মানুষ এই কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে প্রবেশ করছে। তাই দেখে হনুমান তার সহচর নল ও নীলকে বলে, 'এগিয়ে গিয়ে দেখ তো, মনে হ'চ্ছে দু'জন মানুষ এ রাজ্যে প্রবেশ করছে। এ রাজ্যে তো মানুষের প্রবেশাধিকার নেই ?'

হনুমানের আদেশে নল, নীল ছুটে গিয়ে রামলক্ষ্মণকে বলে, 'আপনারা কেন এ রাজ্যে এসেছেন ? এখানে তো মানুষের প্রবেশাধিকার নেই ?'

রাম উত্তর দেন, 'দেখ, আমি যুদ্ধ ক'রে তোমাদের রাজ্য দখল

করতেও আসিনি বা এখানে বসবাসও করতে চাই না। আমি এসেছি আমার প্রাণাধিকা প্রাণপ্রিয়া সীতাকে উদ্ধার করতে। তোমরা কি বলতে পার, দুর্বৃত্ত তাঁকে হরণ ক'রে কোন্ পথে নিয়ে গেছে ?'

নল ও নীল বলে, 'আমরা তো অতশত জানিনা, আমাদের সেনাপতি হনুমান হয়তো জানতে পারে।'

রাম বলেন, 'তবে তোমাদের সেনাপতির কাছেই আমাদের নিয়ে চল, তাকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি।'

তখন নল, নীল কঠিন প্রহরা দিয়ে রামলক্ষ্মণকে হনুমানের কাছে নিয়ে যায়। হনুমান সেই নবদুর্ব্বাদলশ্যামরূপ দেখে একাধারে চমৎকৃত ও মোহিত হ'য়ে যায় এবং শ্রীরামচন্দ্রকে ভক্তিভরে প্রণাম করে। তাই দেখে লক্ষ্মণ বলে, 'খুব ভক্তি দেখছি তো ?' রাম বলেন, 'ধৈর্য্য ধর, অপেক্ষা কর ভাই।' শ্রীরামচন্দ্রকে হনুমান বলে, 'আমাদের কি সৌভাগ্য, আপনি এখানে এসেছেন'

রাম বলেন, 'দেখ! আমি আমার প্রাণপ্রিয়াকে হারিয়েছি, তোমরা কি বলতে পার তাকে কোন্ পথে নিয়ে গেছে ?' রামচন্দ্র হনুমানের কাছে শুনতে পান যে, রাক্ষসরাজ রাবণ যখন তাঁকে হরণ ক'রে নিয়ে যায় তখন তিনি 'হা রাম, হা লক্ষ্মণ' ব'লে কাঁদছিলেন এবং বানরদের দেখে তিনি তাঁর উত্তরীয় ও আভরণ (অলঙ্কার) ফেলে দেন। বানরেরা সে সমস্তই কুড়িয়ে রেখেছে। এ সময় সুগ্রীবের সঙ্গেও রামের দেখা হয় এবং সে-ও ভক্তিভরে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করে।

সুগ্রীব রামকে বলে, 'প্রভু! আজ তুমি যেমন প্রাণাধিকা সীতাকে হারিয়ে পাগলপারা হ'য়েছ, তেমনি আমিও রাজ্যহারা এবং পত্নীহারা হ'য়ে ভৃত্যের ন্যায় জীবনযাপন করছি। সীতা উদ্ধারে আমি তোমায় সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করব, তবে তুমিও আমায়

হারানো রাজ্য ফিরে পেতে সাহায্য কর। বিনাস্বার্থে কাউকে দিয়েই কি কোন কাজ করানো যায়?'

সুগ্রীব বলে, 'প্রভু! পূর্ব্ববৃত্তান্ত তোমায় খুলে বলি। মহারাজ বালী আমার বড় ভাই। ক্ষমতায় দুজনে আমরা সমান। শুনেছি, ন্যায্যমতে আমার পিতা যখন বালীকে রাজ্য দিতে চান তখন সে বলে, 'আমি রাজ্য চাই না, আমি সাধনায় সিদ্ধ হ'তে চাই।' পিতা তখন আমাকে রাজ্য দান করেন। সাধনায় সিদ্ধ হ'য়ে ফিরে এলে আমি বালীকে বলি, 'দাদা! তুমি যদি রাজা হ'তে চাও তবে তুমিই সিংহাসনে বস, আমি তোমার পদসেবা করব।' দাদা তাতে রাজি না হ'য়ে বলে, 'আমার সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করতে হবে।' সুগ্রীব বলে, 'প্রবল পরাক্রান্ত বালী সাধনায় সিদ্ধ হ'য়ে আরও শক্তিশালী হ'য়ে উঠে এবং যুদ্ধে আমাকে পরাস্ত ক'রে রাজ্য দখল করে। আমি সেই হৃতরাজ্য ফিরে পেতে চাই।'

শ্রীরামচন্দ্র বলেন, 'তুমি যদি কথা দাও যে সীতা উদ্ধারে তোমরা সবাই মিলে আমাকে সাহায্য করবে, তবে আমিও তোমাকে তোমার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার ক'রে দেব।'

সুগ্রীব অবাক হ'য়ে বলে, 'সে কি ক'রে হবে? আপনারা তো মাত্র দুজন?'

রামচন্দ্র বলেন, 'সে চিন্তা তো তোমার নয়। যা করার আমি করব। তুমি বালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর। আমি থাকব তোমার পক্ষে।'

বালী ও সুগ্রীব কিন্তু দেখতে ঠিক একই রকম, যেন যমজ ভাই, তাই চেনা খুব কঠিন হ'য়ে পড়ে। ঠিক হ'ল পরিচিতি স্বরূপ রামের গলার মালা সুগ্রীবকে পরিয়ে দেওয়া হবে। হ'লও তাই।

সুগ্রীব তখন বালীকে সংবাদ পাঠিয়ে বলে, 'দাদা! আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে রাজ্য ফিরিয়ে নিতে চাই।'

বালী বলে, 'তা কেন ভাই? তুমি এমনিতেই রাজ্য গ্রহণ কর; যুদ্ধের কি প্রয়োজন?'

সুগ্রীব জবাব দেয়, 'তা হয়না দাদা! তুমিও তো যুদ্ধ ক'রেই আমার রাজ্য নিয়েছ, আমিও তাই যুদ্ধ ক'রে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চাই।'

শ্রীমাধব বলেন, গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, পশুদের মধ্যেও হৃতরাজ্য অর্থাৎ আত্মরাজ্য স্থাপনের জন্য মনোরাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। শ্রীমাধব বহুবার, বহু আলোচনায় এই হৃতরাজ্যের উদ্ধারের কথা বলেছেন। মানব-মানবী মনোরাজ্যে ষড়রিপু ও অষ্টপাশের অধীনে থেকে তাদের আত্মরাজ্যের অধিকার থেকে বিস্মৃত হ'য়েছে; তাই জীবন পরিক্রমায় ক্রমের পথে থেকে, তারা যে ঈশ্বরেরই অভিন্ন সত্তা এ সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে এবং যতদিন তাদের এ উপলব্ধি না আসে ততদিন তাদের সাধন সমর চালিয়ে যেতে হয়। সাধন সমরে জয়ী হ'তে পারলেই আত্মোপলব্ধি আসবে অর্থাৎ আত্মদর্শন হবে এবং এরই অর্থ হ'ল মনোরাজ্যকে সাধন সমরে হারিয়ে দিয়ে আত্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

সুগ্রীবের সঙ্গে বালীর যে যুদ্ধ সেখানেও সুগ্রীব তার হৃতরাজ্য অর্থাৎ আত্মরাজ্যের পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিল।

বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্র পেছন থেকে বালীকে হত্যা ক'রেছিলেন। এজন্য বালী রামচন্দ্রকে অনেক দোষারোপ ক'রেছে, বলেছে, 'হে রাম! তুমি এভাবে কেন আমায় হত্যা করলে, এতে জগতে যে তোমার কলঙ্ক থেকে যাবে। সাক্ষাৎ সমরে কেন তুমি আমায় হত্যা করলে না?'

দেহতত্ত্বের বিশ্লেষণে শ্রীমাধব বালীকে ব'লেছেন 'লোভ' এবং সুগ্রীবকে ব'লেছেন 'ক্রোধ'। লোভকে সামনে রেখে নিজেকে সংযত

করা বড় কঠিন তাই তাকে পেছন থেকে ধ্বংস করতে হয়, সেই কারণেই শ্রীরামচন্দ্রও বালীকে পেছন থেকে বধ ক'রেছিলেন, আর ক্রোধের বশে লোকে কাণ্ডজ্ঞানহীন হ'য়ে পড়ে, তবে ক্রোধ বা রাগ যখন শান্তরূপ ধারণ করে তখন যদি তাকে ঈশ্বরমুখী ক'রে তোলা যায় তবে সেই রাগ ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগে রূপান্তরিত হয়, তাই সুগ্রীব এই যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রের সহায়তা পেয়েছিল। যাক বালী সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারায়।

বালীর মৃত্যুতে তার পত্নী "তারা" শোকে অধীর হ'য়ে শ্রীরামচন্দ্রকে অভিশাপ দেয়, বলে, 'হে রাম! তুমি আমাকে স্বামী হারা ক'রেছ; স্বামীকে হারিয়ে যে গভীর দুঃখ ও বেদনা আমি ভোগ করছি, সেই দুঃখ ভোগ যেন তোমাকেও করতে হয়, এ অভিশাপ আমি তোমায় দিচ্ছি, প্রাণাধিকা সীতাকে উদ্ধার ক'রেও তাকে নিয়ে তুমি ঘর করতে পারবে না।'

তারার এ অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল তাই রাবণের হাত থেকে সীতাদেবীকে উদ্ধার ক'রেও শ্রীরামচন্দ্র তাকে নিয়ে ঘর করতে পারেন নি।

যুদ্ধ শেষ হবার পর হনুমান রামচন্দ্রকে বলে, 'প্রভু! সবাই তোমাকে দিয়ে কাজ গুছিয়ে নিল, কিন্তু আমার মনে বড় আশা ছিল, দর্শনমাত্র তোমার কৃপা পাব। আমাকে দিয়ে কাজও করিয়ে নিলে, তবু আমার ইষ্টলাভ হ'ল না।'

রাম বলেন, 'সে কি হনু? দর্শনমাত্র তোমার ইষ্টলাভ হয়নি, কৃপা হয়নি, এ ক্ষোভ কি তোমার এখনও রয়ে গেছে? দর্শনমাত্র যদি কৃপা না হ'য়ে থাকে তবে আমার সঙ্গলাভের অভিলাষ তোমার মনে জাগল কি ক'রে? এ অভিলাষ যে নিত্য-সত্য অভিলাষ। নবানুরাগের অভিলাষ কিছুদিন বাদে কর্পূরের মত উড়ে যায়, কিন্তু তোমার অভিলাষ যে দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। তুমি বলছ,

ইষ্টকৃপা হয়নি; ভেবেছিলে দর্শনমাত্র গুরুকৃপায় তোমার ইষ্টলাভ হবে। গুরু হ'য়ে আমি তোমার কানে যে নাম দিয়েছিলাম, সেটিই তো মন্ত্রদান। তুমি আমার নাম জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে," কানে কম শোন ব'লে আমি তোমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিলাম, আমার নাম—'জয় রাম, শ্রীরাম, রাম রাম জয়রাম', একেই বলে শিষ্যের কর্ণে গুরুর নাম দেওয়া, দীক্ষা দান করা।'

হনুমান বলে, 'এই কি দীক্ষা দান? আমি তো তা ভাবিনি?'

রামচন্দ্র বলেন, 'হ্যাঁ, একেই বলে দীক্ষা, এ নাম ছাড়া জীবের মুক্তি নেই।'

হনুমান বলে, 'সে কি কথা?'

রাম বলেন, 'হ্যাঁ, ঈশ্বর যখন যে নামে অবতীর্ণ হন, সেই নামই সেই যুগ হতে আরম্ভ করে অন্তযুগ পর্য্যন্ত অনুরাগীদের বীজমন্ত্র। তবে সব নামের আগে থাকে প্রণব'।

হনুমান প্রশ্ন করে, 'প্রণব কি?'

রামচন্দ্র বলেন, কানে নাম দিতে গেলে যে শব্দ বা ধ্বনি উত্থিত হয় সেটিই প্রণব ধ্বনি। আকাশে বাতাসে সর্ব্বত্র সেই প্রণব ধ্বনি। হাসতে গেলেও প্রণব, কাশতে গেলেও প্রণব, কান্নাতেও প্রণব, কথাতেও প্রণব। কথায় আছে, 'এই শব্দেই গণ্ডগোল বাধায় আবার এই শব্দেই গণ্ডগোল মেটায়।'

শ্রীরামচন্দ্র বলেন, 'কৃপা কি শুধু দর্শন মাত্র হয়? তোমার জন্মের আগে থেকেই এই কৃপা চলে এসেছে। লোকে সাধনা করে কেন? 'আমি কে, আমি কি তা জানার জন্যই সাধনা। তুমি কি ছিলে, বর্ত্তমানে কে তুমি, কেন তুমি, কেন এসেছ, কোথায় যাবে, তোমার কি কষ্ট করা উচিত, এটি জানাই হ'ল সাধনার মূল কথা।'

শ্রীমাধব বলেন, জীবনপথ অতিবাহিত করার সময় রাস্তায় চলতে গেলে যে সমস্ত কর্ম্মের প্রয়োজন, যথা হাসি-কান্না, শোক-তাপ,

ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি তা সবই করছ সংসারের মাধ্যমে কিন্তু কার কাছে যাচ্ছ, কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ, পরিণাম কি, এ সবই তো জানতে হবে? দেহপোষোগী দেহীর মধ্যে গুরুরূপে অবস্থান ক'রে একমাত্র ঈশ্বরই এ সকল প্রশ্নের সমাধান দিতে পারেন।

আমরা মনে ভাবি শ্রীগুরুদেব কেবলমাত্র পথনির্দেশক কিন্তু প্রকৃত অর্থ হ'ল এই যে সত্য তাঁর সত্তার নিকট নিজেই গুরুরূপে পথ দেখাতে আসেন। গুরু সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃষ্ট ধারণা গড়ে উঠেনি, তাই আমরা মনে করি গুরু শুধু পথ দেখান অর্থাৎ গুরু একজন আর ইষ্ট অন্যজন। গুরুই ইষ্ট, ইষ্টই গুরু এ বোধ আমাদের আসা প্রয়োজন।

আবার কেউ কেউ বলে, গুরু হ'লেন ঘটক অর্থাৎ দুজনের মধ্যে ঘটকালী করেন। ঘটক তো বটেই তবে এ ঘটকের অর্থ হ'ল, বিশ্বে যত ঘটনা, জন্ম, মৃত্যু, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সবই তো তিনিই ঘটাচ্ছেন।

তাই রামচন্দ্র হনুমানকে বলেন, 'তাঁকে যে নামে, যে মূর্ত্তিতেই কেউ ভজনা করুক না কেন, সব সেই একই জায়গায় পৌঁছাবে'।

হনুমান বলে, 'তবে এবার আমার করণীয় কি তাই বল প্রভু। তুমি না বোঝালে আর তো কিছু বলার নেই। তবে হ্যাঁ, এই যে সংসারে এসে সবাই যা করে, আমি তো সেটা থেকে সরে আছি। আমি তো বিবাহ করিনি তাই সংসারও নেই, সন্তান সন্ততিও নেই।'

রাম বলেন, 'দেখ হনু, সন্তান তোমারও আছে, শিগ্‌গিরই তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে'।

হনুমান অবাক হ'য়ে বলে, 'সে কি কথা? বিবাহ করিনি, সন্তান হবে কি ক'রে? একথা তোমাকে বোঝাতেই হবে, নইলে প্রাণ বিসর্জ্জন দেব'।

রাম বলেন, 'হ্যাঁ, তা তো দেবেই। দেখ হনু, জীবনটাই আমি। আমি যখন ইচ্ছা করি তখন জীবন যায়, তার আগে নয়'।

হনুমান বলে, 'তবে বল, কি ক'রে আমার সন্তান হ'ল' ?

রাম বলেন, 'তুমি যখন সাগর পাড়ি দিচ্ছিলে তখন এক রাক্ষসী তোমার আলিঙ্গন পাবার জন্য সাগরে ভেসে ভেসে তোমার সঙ্গে যাচ্ছিল। ক্লান্তিতে তোমার কপাল থেকে যে ঘর্ম্ম ক্ষরিত হয় সেই ঘর্ম্ম পান ক'রে রাক্ষসী গর্ভবতী হয়। তুমি তো ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারীর শৌর্য্যবীর্য্য রক্তে থাকে। তাই তার পক্ষেও গর্ভবতী হওয়া সম্ভব হ'য়েছিল। গর্ভবতী হবার লজ্জায় সে পাতালে গিয়ে বাস করছে। শিগ্‌গিরই তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে। হনু, তুমি ব্রহ্মচারী ব'লে তোমার মনে বড় অভিমান ছিল। সে অভিমান আজ নস্যাৎ হ'ল। জেনে রাখ, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি নানা কারণেই সন্তানের উৎপত্তি হ'তে পারে। পচনশীল অবস্থায়ও জীবের উৎপত্তি হয়; তাদের বলে স্বেদজ, সেখানে তো কোন পুরুষ নেই'। এইরূপ নানা উদাহরণ দিয়ে রামচন্দ্র হনুমানকে বোঝালেন, তবু হনুমানের বিশ্বাস হয় না, বলে, 'তুমি তো বোঝালে, কিন্তু না দেখা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছি কৈ' ?

পরে হনুমান যখন পাতালে গেল তখন পাতালের দ্বারে দ্বারী ছিল হনুমান পুত্র। পাতালে প্রবেশ করতে গিয়ে তার সঙ্গে হনুমানের যুদ্ধ বাধে। হনুমান ভাবে 'এ যে অবিকল আমারই অবয়ব, সত্যিই যদি আমার সন্তান হ'য়ে থাকে' ? তাই হনুমান যুদ্ধ করে বটে, তবে মারণাস্ত্র প্রয়োগে বিরত থাকে। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধে যখন হনুমান নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে তখন তার সন্তান হনুমানকে মায়ের কাছে বেঁধে নিয়ে যায়। রাক্ষসী-মা ভীত কণ্ঠে ব'লে উঠে, 'এ কি ক'রেছিস্ ? তোর পিতাকে হত্যা ক'রেছিস্' ?

পুত্র অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, 'আমার পিতা' ?

মা বলে, 'হ্যাঁ, তোরই পিতা'। এই ব'লে হনুমানকে সেবা শুশ্রূষা ক'রে ভাল ক'রে তোলে। সুস্থ হ'য়ে হনুমান রাক্ষসীকে প্রশ্ন করে,

'তুমি আমার স্ত্রী কি ক'রে হ'লে ? কবে তোমায় বিবাহ ক'রেছি ? সন্তানই বা হ'ল কি ক'রে' ?

রাক্ষসী, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত হনুমানকে খুলে বলে। পাতালপুরী থেকে ফিরে আসবার সময় হনুমান পুত্রকে সঙ্গে আনেনি, কেননা রামভক্ত হনুমানের নামে লোকের মনে যে শ্রদ্ধাভক্তি জাগ্রত হয়, তার পুত্রের কথা শুনলে হয়তো সেখানে বিভ্রান্তির ছায়া পড়বে।

পাতালপুরী থেকে ফিরে এসে হনুমান রামচন্দ্রকে বলে, 'প্রভু! তুমি যা বলেছ তা সবই মিলে গেছে, আমার আর কোন সন্দেহ নেই'।

পুরুষকার

গত মঙ্গলবার শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় কোন প্রশ্ন ছিলনা। শ্রীমাধব নিজেই পুরুষকার সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেন।

পুরুষকার শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথেই মনে প্রশ্ন জাগে, কে এই পুরুষ ? সাধারণ অর্থে পুং জাতীয় প্রাণীকে পুরুষ বলা হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রকৃত পুরুষ বলতে বোঝায় ঈশ্বরকে; তিনিই একমাত্র পুরুষ, আর তাঁর সৃষ্ট এই জগতে যা কিছু চোখে পড়ে সে সবই হ'ল প্রকৃতি।

প্রশ্ন উঠে, এই এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষের সংজ্ঞা কি ? এক কথায় তাঁর কোন সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়; তাঁকে জানতে হ'লে, চাই সুপ্রসারিত চিন্তাশক্তি এবং অন্তরানুভূতিশীল অবস্থা।

ঈশ্বর-চিন্তার গভীরে ডুবে গিয়ে অন্তরানুভূতিতে উপলব্ধি করতে পারলে দেখা যায়—যাঁর পৌরুষ এই অনন্ত বিশ্ব এবং যিনি নিজে অনন্ত বিশ্বরূপে

রূপায়িত হ'য়েও অনন্ত বিশ্বের বহিরান্তরে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত এবং বিজড়িত, সেই অদ্বিতীয় পৌরুষ যাঁর অভিব্যক্তি, তিনিই প্রকৃত পুরুষনামে অভিহিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় পুরুষ হ'ল পরম সত্য। বিশ্বের সমস্ত কিছু সেই সত্যেরই অভিন্ন সত্তা যেহেতু তিনি নিজে অনন্ত বিশ্বরূপে রূপ নিয়ে আছেন এবং অনন্ত বিশ্বে ওতপ্রোত-ভাবে বিরাজমান।

অনন্ত বিশ্বে তাঁর সৃষ্টি পরিমাপহীন। তার মধ্যে মানবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব বলে পরিগণিত, কেননা অন্তরানুভূতিরূপ বিশেষ ক্ষমতা বিশ্বস্রষ্টা মানবের ক্ষেত্রেই আরোপ ক'রেছেন, অন্য কোন জীবের সে ক্ষমতা নেই। এই একটি কারণেই মানব শ্রেষ্ঠ জীবের মহিমা লাভ করতে পেরেছে। অন্তরানুভূতি-সম্পন্ন মানব তার মনুষ্যত্বের জাগরণের মাধ্যমে, নিত্যসত্য পরমপুরুষের সে যে অভিন্ন সত্তা, সেই উপলব্ধি প্রাপ্ত হ'তে পারে। মনুষ্যত্বের মাধ্যমে সেই পরমপুরুষের বা নিত্য-সত্যের প্রতিভা প্রকাশ বিকাশ হয়। নিত্যসত্যের প্রতিভার সেই প্রকাশ বিকাশকেই বলে পুরুষকার।

কাজেই একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে পরম পুরুষের অদ্বিতীয় পৌরুষের প্রতিভা প্রকাশ বিকাশের একমাত্র ক্ষেত্র হ'ল অন্তরানুভূতি-শীল মানব মানবীর জাগতিক জীবনকে মনুষ্যত্বের গুণাবলী দ্বারা মহিমামণ্ডিত ক'রে তোলা। তবেই নিত্যসত্য পরম পুরুষের অভিন্ন সত্তা হিসাবে মানবের মধ্যে পুরুষকারের প্রকাশ বিকাশ হবে। এই পুরুষকার দ্বারাই সর্ব্ব কর্ম্মে জীবন পথে চলতে পরিপূর্ণভাবে সহায়তা করে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষকারের প্রকাশও হয় ভিন্নরূপ। যেমন ধর্ম্মের মাধ্যমে পুরুষকারের প্রকাশ বিকাশকে বলা হয় ধর্ম্মবল। এই ধর্ম্মবলই মনোবলকে উদ্দীপ্ত করে এবং দৃঢ় মনোবলের সাহায্যেই সকল কর্ম্মে প্রেরণা সঞ্চারিত হ'য়ে সাফল্যের পথ প্রশস্ত হয়। কাজেই সর্ব্বকর্ম্মে পুরুষকারই মানব মানবীকে তার জীবন পথে এনে

দেয় গতিশীলতা, উদ্যম এবং পরিয়ে দেয় অবশ্যম্ভাবী জয়টিকা।

শ্রীমাধব বলেন, বিভিন্ন স্তরে পুরুষকারের বিভিন্নভাবে প্রকাশ বিকাশ কি রকম জান?

যেমন একই মাটির রসে আঙ্গুর ফলের স্বাদ একরকম আবার খেজুর গাছের রসের আস্বাদন অন্যরকম। অর্থাৎ একই রস, পাত্র বিশেষে স্বাদের তারতম্য হয়।

মানব চরিত্রে যখন পুরুষকারের অভাব হয় তখন তার মধ্যে কু-রসের সঞ্চার হয়। প্রকৃত পুরুষকারের রস সর্ব্বদাই সু-রস। পুরুষকারই ক্রমের পথে বল সঞ্চার করে এবং মানব মানবীর সু-যশ প্রকাশ করে; আবার পুরুষকারের অভাবে যে কু-রসের সঞ্চার হয় তারই প্রভাবে মানব মানবী ব্যতিক্রমের পথ গ্রহণ ক'রে যশোহানির কবলে পড়ে।

শ্রীমাধব বলেন, পরম পুরুষের পৌরুষ-প্রতিভা প্রতিভাত হয় কখন? মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয় যখন। পৌরুষ হ'ল তেজ। এই পৌরুষরূপ তেজের অনির্ব্বাণ দাহিকাশক্তি জীবন পথের যত মালিন্য, যত আবর্জ্জনা তাকে পুড়িয়ে দিয়ে খাঁটি ও বিশুদ্ধ ক'রে তোলে।

দেহতত্ত্বের বিচারে বিশুদ্ধ জ্ঞানই হ'ল পুরুষকার। এই পুরুষকার ক্রমের পথেই জাগ্রত হয়। শিশুকাল থেকে যারা পিতামাতা ও গুরুজনদের নির্দ্দেশিত ক্রমের পথ ধ'রে চলে, তাদের মধ্যে শৈশবাবস্থা থেকেই পুরুষকারের অঙ্কুর অঙ্কুরিত হ'তে থাকে।

প্রতীক উপসনা

গত মঙ্গলবার শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করেন,—শাক্ত, বৈষ্ণব বা শৈবের উপাসনা কি প্রতীক উপাসনা?

প্রশ্ন শুনে শ্রীমাধবের নিজ অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে যায়। তিনি বলেন, সে বহুদিনের কথা, পাঞ্জাবে গিয়েছিলাম। সবে ঘুম থেকে উঠেছি, সঙ্গীরা বলে, 'এবার স্বর্ণমন্দিরে (Amritswar Golden Temple) চলুন, গ্রন্থসাহেব এখন সিংহাসনে আরোহন করবেন'। মন্দিরে গিয়ে সবাই হাত পা ধুয়ে পবিত্র হ'ল। হঠাৎ কানে আসে সবাই বলছে,—'ঐ যে যাচ্ছে, দেখ, ঐ যায়'। তাকিয়ে দেখি, যাচ্ছে একটি সোনার পাল্কি কিন্তু কেউ যে কাঁধ বদল করছে তা আর বোঝা যায় না। চোখে পড়ে সোনার পাল্কি, সোনার মন্দিরে সিংহাসনে উঠেন। আরও এক অদ্ভুত ব্যাপার নজরে আসে, শত শত লোক ভক্তিভরে দুহাতে মন্দির দ্বারের চৌকাঠ টিপছে। জিজ্ঞাসা করি, তোমরা এ কি করছ? সেবা যদি করতে হয় তবে মন্দিরের ভিতরে গিয়ে করনা।

গাল বেয়ে তাদের চোখের জল গড়িয়ে পড়ে, বলে, 'ভিতরে যদি পৌঁছাতে পারতাম তবে তো অনেক কিছুই হ'ত। সাধনার সে স্তরে কি পৌঁছুতে পেরেছি? এই মন্দিরটিই তো তাঁর দেহ। এই দেহে গ্রন্থসাহেব যে পরমাত্মারূপে রয়েছেন। তাঁকে চেনবার জন্য মন্দিরস্বরূপ এই দেহটি যে তাঁরই প্রতীক। আমরা তাঁকে এই জাগতিক দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি কোথায়? জাগতিক দৃষ্টিতে তাঁর পদ বলতে পাচ্ছি এই চৌকাঠটিকে, তাই এ ভাবেই তাঁর সেবা করে যাচ্ছি'।

শ্রীমাধব বলেন, দেখ, কি সুন্দর কথা, কি পবিত্র ভাবধারা। যাঁর সেবা তাঁরা করছে তাঁর যে হাত, পা, চোখ, কান কিছুই নেই। তিনি হ'লেন সবার সমষ্টি। কাজেই কোনটি যে সঠিক বা যথার্থ আর কোনটি প্রতীক, এ নিয়ে দ্বন্দ্ব করে আমাদের লাভ কি? সঠিক এবং প্রতীক উভয়ই যে তিনি।

জাগতিক বুদ্ধিতে যতটুকু বোঝা যায় তাতে একথাই বলা চলে যে,

আমাদের দেহ-মন্দিরটিই হ'ল তাঁর বিহারের স্থান। কাজেই স্বর্ণমন্দিরস্বরূপ যে তাঁর দেহটি, সেই দেহের স্বদরূপ চৌকাঠটিকে সেবা ক'রেই তারা তৃপ্তি লাভ করে, মনে শান্তি ও আনন্দ খুঁজে পায়। তাই বলি, শিবই বলো আর কালীই বলো, সবই তো ব্রহ্ম। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ইত্যাদি যে কোন মার্গে বা শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গৌরীয়, রামাইত ইত্যাদি যে কোন মতেই সাধক সাধনা করুক না কেন, সে চিন্তা ক'রে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কি প্রয়োজন ?

বিশ্ববাসী সবারই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হ'ল সত্যকে জানা, বোঝা ও উপলব্ধি করা। এই লক্ষ্যে পৌছাতে হ'লে যে, যে পথেই যাক না কেন, তাতে তো কোন বাদবিসংবাদের প্রশ্ন নেই. কেননা সবারই যে লক্ষ্য সেই সত্য বা পরম সত্য।

এই সত্যকে জানতে কেউ হয়তো কোন প্রতীককে আশ্রয় ক'রে পথ চলে আবার কেউ হয়তো মূর্ত্তিপূজা ক'রে বিমূর্ত্তে যাবার পথ খোঁজে। এই মূর্ত্তিপূজা বা পুতুল পূজা নিয়ে অনেকে আবার উপহাসও করে। পূজা উপলক্ষ্যে উৎসবানন্দের বাহ্যাড়ম্বরই এই উপহাস ও নিন্দাবাদের প্রকৃত কারণ। তবে প্রতীক নিয়ে কারো মনে হিংসা দ্বেষ আসা উচিৎ নয়।

শ্রীমাধব বলেন, আমি নিজে কোন পথকেই প্রতীক-উপাসনা মনে করি না, কেননা এই প্রতীকই যে সঠিকের বা সত্যের পরিচিতি। তাই প্রতীক আর সঠিক আমার কাছে অভিন্ন, কোন পার্থক্য এতে নেই। দৃশ্যমান অর্থে সব কিছুই তো প্রতীক। যেমন ধর, গুরুর খড়ম পূজো করা। দৃশ্যমান অর্থে এটি প্রতীক তো বটেই, কিন্তু এর মূল লক্ষ্য হ'ল গুরুকে পূজো করা। খড়মটি গুরুর প্রতীকরূপে গ্রহণ করলেও পূজোর মূল লক্ষ্য হ'ল প্রতীকের মাধ্যমে সঠিকেরই বন্দনা।

শ্রীমাধব বলেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা যাঁকে সেবা করতে চাই

তাঁর তো কোন রূপ নেই, তাই যে রূপে তাঁকে ভাললাগে সেই রূপেই তাঁর আরাধনা করি। সেই প্রতীককে দেখে যদি কারো বিভ্রান্তি আসে তবে সেটি মূর্খতারই লক্ষণ, কেননা প্রতীক হ'ল মাধ্যম এবং মূললক্ষ্য হ'ল সঠিকের পূজা।

সার্ব্বজনীন অর্থে সঠিকই হ'ল সত্য। সভায় প্রশ্ন উঠেছিল, সত্যই যে আনন্দ সেকথা মানবমানবী জানবে কি ক'রে?

সে কথার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, আগে সত্যকে জান, তাঁকে বোঝ। সত্যকে জানতে পারলে এবং বুঝতে পারলেই এ উপলব্ধি আসবে যে, সত্যই সেই আনন্দঘন মূরতি।

তাইত বলে, সত্যম্—জ্ঞানম্—আনন্দম্ অর্থাৎ আগে সত্যকে জান তাতেই জ্ঞান আসবে এবং জ্ঞানের উদয় হ'লেই আনন্দে ভরপুর হ'য়ে উঠবে। সেই আনন্দে যখন নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারবে, সে দিনই শূন্যের শূন্য মহাশূন্যের হদিস পাবে।

ভক্তের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল—জীবের ভয়ের উৎস কি? কি ক'রে এই ভয় কাটে?

শ্রীমাধব বলেন, গুরুনানক ব'লে গেছেন, 'নির্ভৌঃ' অর্থাৎ নির্ভয় হও। নির্ভৌঃ বলতে সেই নিরঞ্জন পরমসত্যকেই বোঝায়; কেননা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হ'লে তবেই একমাত্র নির্ভয় হওয়া যায়। সত্য ব্যতীত যা কিছু সবই হ'ল ভয়ের আকার। জাগতিক জীবনে যত ঘটনা ঘটে তার কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় ভয়ই তার উৎস।

শ্রীমাধব বলেন, অনন্ত বিশ্বে সমস্ত জীবের মধ্যে একমাত্র সত্যই হ'ল প্রথম অভিনিবেশ আর ভয় হল দ্বিতীয় অভিনিবেশ। এই দ্বিয়েই জগত অভিনিবেশ পরিচালিত হ'য়ে চলেছে। অভিনিবেশ অর্থে এখানে আবাসস্থান বোঝান হ'চ্ছে। ভয়রূপ মায়াময় জগত অভিনিবেশে তোমরা সবাই বাস করছ এবং এটিকেই বলা হ'চ্ছে দ্বিতীয় অভিনিবেশ। আর যারা সত্যকে আশ্রয় ক'রে জীবন পথে

পরিচালিত হয় তারাই হ'ল প্রথম অভিনিবেশের অধিবাসী, কেননা সত্যাশ্রয়ী জনের মনে যে কোন ভয় নেই, তারা কোন সুখ দুঃখেরও অধীন নয়। ভয়ের অভিনিবেশেই সুখ ও দুঃখ।

প্রথম অভিনিবেশকে তাই অনাবিল আনন্দের স্থান বলা হয়। সত্য হ'ল এক এবং অদ্বিতীয় অভিনিবেশ। সেখানে আশ্রয় নিতে পারলে কোন ভয়ই তার কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। যারা মায়াময় জগতসংসার অভিনিবেশে বাস করে তারাই সর্ব্বদা নানারূপ ভয়ে ভীত হ'য়ে থাকে।

এ সময় প্রশ্নকর্ত্তা শ্রীমাধবের বক্তব্যকে সমর্থন ক'রে গীতার দু,চারটি শ্লোক উদ্ধৃত করেন এবং শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণ করেন।

তার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, 'আমার অন্তর থেকে যে শাশ্বত সত্যের বাণী প্রকাশ পায় তা যদি তোমাদের শাস্ত্রের সঙ্গে মিলে যায় তাতে খুবই আনন্দ হয়। রূপক শাস্ত্র সম্বন্ধে তোমাদের যে পড়াশুনা আছে তা তো আমার নেই কারণ শাস্ত্র যে আমি পড়িনি; আমার অন্তর শাস্ত্র থেকে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে যে সত্যবাণী বেরিয়ে আসে তাই তো আমি প্রকাশ করি'।

আমি এমন কোন কথা হয়তো বলিনা যাতে শাস্ত্রকে নস্যাৎ করা হয় বরং এমন কথাই বলতে চাই যাতে শাস্ত্রবাক্য উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়।

শ্রীমাধব বলেন, সত্য সন্ধানীর ক্ষেত্রে যে বাক্যে বা কথায় মানব-মানবীর অন্তর বিগলিত হয় সেটিই তার কাছে সত্যের মহামন্ত্র, সত্যের পথ। ভয়ে কিন্তু অন্তর কখনও বিগলিত হয় না। ভয়ে বা বিভ্রান্তিতে মন অনেক সময় বিগলিত হ'তে পারে কিন্তু অন্তর বিগলিত হয় না। মন আর অন্তরে যে অনেক তফাৎ। যাকে দেখলে অন্তর বিগলিত হয়, সে শত ঝড়ঝঞ্ঝা পেরিয়েও সত্যেই প্রতিষ্ঠিত থাকে।

যাঁরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সত্যে অধিষ্ঠিত তাদের কখনও 'গেল গেল' ভাব আসতে পারে না। ভয়ের অভিনিবেশে যারা আছে তাদেরই এই গেল, গেল ভাব, গেল ব'লে যত ভাবনা যত চিন্তা। কি গেল, কোথায় গেল, কার গেল, এ বিচার করতে করতে দেখা যাবে, সবই যে তাঁর, আমরাও তো তাঁরই। তিনিই একমাত্র সত্য আর জগতের সকল জীব তাঁরই অভিন্ন সত্তা—এভাবে বিচার করতে করতেই একাত্মবোধ জেগে উঠে।

শ্রীমাধবের আলোচনার মূল কথা হ'ল দেশ, কাল, পাত্রানুসারে যার যে পথ ভাল লাগে তাকে সেই পথেই এগিয়ে যেতে হবে। জগত সংসারে সকল মানবমানবীরই মূল লক্ষ্য হ'ল সত্যে পৌঁছান। যদি প্রতীককে আশ্রয় করে বা মূর্তিতে নির্ভর ক'রে অগ্রসর হওয়া মানবমানবীর কাছে সহজ ব'লে মনে হয় তবে সে পথই গ্রহণ করতে হবে। আবার বিমূর্ত্তের পথ সহজ বোধ হ'লে সে পথেই যাওয়া উচিত। মূল লক্ষ্য হ'ল সত্য; সবাইকেই তো পৌঁছাতে হবে সেখানে, ভিন্ন ভিন্ন পথে গেলে ক্ষাত তো কিছুই নেই।

সত্যের পথে পরিচালিত হ'তে পারলে এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারলে জীবনপথে ভয়ের উদ্বেগ কখনও আসতে পারেনা, কেননা সত্য হ'ল সুখ দুঃখের অতীত আর ভয় হ'ল সুখ এবং দুঃখের আকর।

সত্য

গত মঙ্গলবার শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করেন—বলা হ'য়েছে, 'সত্যকে ধ্যান কর'—যাঁকে জানিনা, চিনিনা,

যাঁর সম্বন্ধে কোন ধারণা গড়ে উঠেনি, তাঁকে ধ্যান কর বললেই কি ধ্যান করা যায়? গুরুমূর্ত্তি ধ্যান কর বললে যেমন দেহধারী গুরুর রূপ মনশ্চক্ষে ভেসে উঠে তেমনি সত্যের ধ্যান করতে হ'লে সত্য কি সে কথাতো আগে জানতে হবে—তারপর তো সত্যে পৌঁছাবার পথ খুঁজব?

প্রশ্নের সমাধান দিতে গিয়ে শ্রীমাধব বলেন, ঠিক কথাই বলেছ—সত্যের স্বরূপ কি সেকথা গুরুদেবের মুখ থেকে বা অন্য কোন লোকের কাছ থেকে বা পুস্তক ইত্যাদি পড়ে জানতে পারলে ধ্যানের পক্ষে সুবিধা হয়। সত্য কি লম্বা, না গোল, না জ্যোতিবিশিষ্ট সেটা জানলে তবে তো ধ্যান করতে পারা যায়। কথায় লোকে বলে ধ্যান-ধারণা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আগে আসে ধারণা পরে ধ্যান। ধারণাটি অংশত ক'রে ধারণা বা অনুমান ধারণা; তাহ'লেও এই অনুমান ধারণার উপর নির্ভর ক'রেই তো যাত্রা সুরু করতে হয়, তবেই তারপরে আসে ধ্যান। কাজেই আগে জানতে হবে সত্যের স্বরূপটি কি?

শ্রীমাধব শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করেন সত্যের স্বরূপ বলতে তোমরা কি বোঝ? ভক্তজন সমাবেশে কেউ বলেন 'সচ্চিদানন্দ', আবার কেউ বলেন, ভাগবতে ব্যাসদেব বলেছেন—'সত্যং পরমং ধীমহি' অর্থাৎ আমি সত্যকেই ধ্যান করি। একথা বলার অর্থ হ'ল, তোমরাও সত্যকে ধ্যান কর।

শ্রীমাধব বলেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন; তার কারণ হ'ল শাস্ত্রের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করার জন্য। কিন্তু আমরা সেই বিষয়বস্তু বা উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার চেষ্টাও করি না; শাস্ত্রের বয়ানটিকে নিয়েই মসগুল থাকি। কচিৎ কেউ যদি উপলব্ধি ক'রেও থাকে, সে-ও কিন্তু সেই উপলব্ধির বিষয়টি চেপে গিয়ে বয়ানটিই উচ্চারণ করে। এই যে বললে সত্যের স্বরূপ হ'ল

'সচ্চিদানন্দ' এটা বললে কি ক'রে ? উপলব্ধি ক'রে না কানে শুনে ? তোমরা যেমন শুনেছ সদাংশে সন্ধিনী, চিদাংশে সম্বিৎ ও আনন্দাংশে হ্লাদিনী ; এই সন্ধিনী বলতে কি বোঝায় ? সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দ এই দুটি কথা তো সহজ কিন্তু সন্ধিনী নিয়েই যত ঝামেলা।

শ্রীমাধব বলেন, সত্যকে জানতে হ'লে আগে একটা ধারণা চাই, অন্ততপক্ষে অনুমান ধারণাতো হবে। সৎ হ'ল সত্যের স্বরূপ কিন্তু তাই বলে তা'কে সত্য বলা চলে না। আমরা সবাই সত্যে পৌঁছাতে চাই কেননা সত্যই হ'ল আমাদের লক্ষ্য এবং প্রকৃষ্টভাবে বলতে গেলে সত্যই আমাদের আরাধ্য। নিগূঢ়ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যে ভাবেই চেষ্টা করি না কেন, যে পথ ধ'রেই চলিনা কেন, সবা'র লক্ষ্যই হ'ল সত্যে পৌঁছান।

সত্যের 'স' হ'ল মূল, মূলের অত্তা বা অস্তিত্ব অর্থাৎ মূলত্বও সত্য। মূলত্বের সমষ্টি নিয়ে সত্য কথাটি সুসম্পন্ন হ'য়েছে। 'স' এর মূলত্ব হ'ল সর্ব্ব বিশ্বের বীজ এবং তারই সমষ্টি সত্য। মূলত্ব নানাভাবে বিচ্ছিন্ন হ'লেও মূলতঃ তার অবিচ্ছিন্ন ভাবই বজায় থাকে। সত্যের এই অবিচ্ছিন্নতার কারণ হ'ল তার আকর্ষণ। সত্যের সেই আকর্ষণে আমরা সবাই অবিচ্ছিন্ন থাকতে পেরেছি কিন্তু সে উপলব্ধি আমাদের নেই। দৃষ্টতঃ আমরা বিচ্ছিন্ন হ'লেও মূলতঃ অবিচ্ছিন্ন ; তা নইলে সমষ্টি কথাটি আসে কি ক'রে ? তাহ'লে বিভিন্ন সত্তা যখন বিভিন্ন-ভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং নানা গুণ, জ্ঞান, কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের প্রকাশ বিকাশ হয় তখন সেটি হ'চ্ছে কি ক'রে এবং করাচ্ছেনই বা কে, এ প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

এ সব তিনিই করাচ্ছেন এ কথা সত্য কিন্তু সেটা আমাদের কানে শোনা কথা ; উপলব্ধির কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কর্ষণ শক্তি একে অন্যকে চাষ করে এবং তাঁর মধ্যে যে গুণাদি রয়েছে তা তাঁরই বিকর্ষণ শক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকৃষ্টভাবে এই কর্ষণ-আকর্ষণ-

বিকর্ষণই সত্যের স্বরূপ। এই আকর্ষণের ক্রিয়াতেই একত্বভাব আসে অর্থাৎ পরস্পরে স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম ও প্রীতির উদ্ভব হয় এবং তারই সাহায্যে সরলতা—নম্রতা—সহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণের প্রকাশ পায়। এই আকর্ষণই হ'ল সৎ।

সত্যের মধ্যে আকর্ষণ-কর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তি রয়েছে বলে সেই আকর্ষণে আমরা চলমান বা গতিশীল আছি; সেই কর্ষণে আমরা ক্রিয়মান হচ্ছি এবং ক্রিয়মান হ'লেই তার ফল বিকর্ষিত হ'চ্ছে। এটিই হ'ল সত্যের প্রকৃত রূপ।

শ্রীমাধব বলেন, এখন প্রশ্ন হ'ল এই সত্তাকে আমরা কি ভাবে ধ্যান করব? তাঁর কি কোন রূপ আছে? উত্তরে বলা যায়—আছে। সত্যের সে'রূপ কি জান? তা হ'ল অপরূপ, অতুলনীয় একত্বের রূপ। তাই সত্তা হ'ল এক এবং সনাতন অর্থাৎ চিরপুরাতন, সেই সঙ্গে সে যে আবার চিরনূতনও। তাহ'লে বলা যায় সত্যের মূলত্বই হ'ল আকর্ষণ-কর্ষণ-বিকর্ষণ।

শ্রীমাধব বলেন, এই সত্যই সচ্চিদানন্দরূপ। এই সচ্চিদানন্দের তিনটি শক্তির নাম—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ।

আনন্দভাবে যে শক্তি ক্রিয়া করে, তাহাই হ্লাদিনীশক্তি। এই শক্তিতেই ঈশ্বর নিজে আনন্দময়রূপে নিজের স্বরূপানন্দ উপভোগ করেন এবং জীবজগতকে আনন্দে রাখেন। জীব সেই আনন্দস্বরূপ থেকেই এসেছে—আনন্দ দ্বারাই বেঁচে আছে—আনন্দের অভিমুখেই চলেছে—আবার সেই আনন্দস্বরূপেই প্রবেশ করছে। হ্লাদিনী-শক্তির প্রকাশ আনন্দ। আনন্দের ঘনীভূত অবস্থাই প্রেম।

সৎভাবে যে শক্তি ক্রিয়া করে, তাহাই সন্ধিনীশক্তি। জগতে যা'কিছু বিদ্যমান এবং যা'কিছু সত্তা বলে প্রতীত হয়, তা' এই শক্তিরই আশ্রয়ে। এই যে সৃষ্টজগৎ বা জীবজগতের কর্ম্মপ্রবাহ, কর্ম্মপ্রবৃত্তি—এ সকলের মূলেও এই শক্তিরই ক্রিয়া।

চিৎভাবে যে শক্তি ক্রিয়া করে, তাহাই সংবিৎশক্তি। এই শক্তির ক্রিয়াতেই ঈশ্বর স্বতঃচেতন। এর দ্বারাই তিনি জীবজগতকে সচেতন করেন ও রাখেন এবং এর দ্বারাই জীব জ্ঞান-বুদ্ধির প্রেরণা পায়।

শ্রীমাধব বলেন, এই যে বাক্যস্ফূর্ত্তি অর্থাৎ জিহ্বা-ইন্দ্রিয় দ্বারা দন্তের সাহায্যে আমরা কথা বলছি এটি হয় কি করে? সত্যের যে স্বর বা ধ্বনি, তা হ'ল ওঙ্কার। সত্যের সেই সুর বা ধ্বনি আকাশ-বাতাস-জল-বৃক্ষলতাদি ধ'রে রেখেছে এবং প্রাণী তার জিহ্বা-ইন্দ্রিয় দ্বারাই সেই সুর বা ধ্বনি প্রকাশ করে—তাই প্রাণীর ক্ষেত্রে জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ই স্বর ও সুর প্রকাশের যন্ত্র। স্বর অর্থে বাণী ও সুর অর্থে তাল। সত্যের ওঙ্কাররূপ যে অস্তিত্ব তাহাই সত্যের প্রকাশরূপ ধ্বনি। আকর্ষণের যদিও বিভিন্নরূপ ও প্রকাশ দেখা যায় তারও মূল প্রকাশ হ'ল শব্দ। শব্দ বা সুর হ'ল চলমান অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে বিচ্ছুরিত হওয়া অবধি চলমান বা গতিশীল। গতি থেকেই শব্দ, শব্দের কোন স্থিতমান অবস্থা নেই। শব্দ তিনটি গুণ সমন্বিত অর্থাৎ ওঙ্কারের তিনটি গুণই এর মধ্যে আছে। শব্দে যখন তমের প্রভাব বেশী তখন ক্রোধের উৎপত্তি হয়, যখন রজের প্রভাব বেশী তখন কর্ম্মপ্রবণতার প্রেরণা জাগে আবার যখন সত্যের প্রভাব বেশী তখন প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা ও আনন্দের জোয়ার খেলে যায়। সৃষ্টি ক্ষেত্রে যদিও আগে সৃষ্টি হয় ইন্দ্রিয় তারপর বিষয় কিন্তু ক্রিয়াক্ষেত্রে বিষয় অনুযায়ী ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সুরু হয়। উপমাস্বরূপ শ্রীমাধব বলেন, যেমন গন্ধ হ'ল গুণেরই গন্ধ। গুণের গন্ধেই লোক গুণীর পিছু নেয়, আবার গুণের দুর্গন্ধে সঙ্গত্যাগও করে। কাজেই নিগূঢ় ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, কি সূক্ষ্মভাবে বস্তুতে এসে গন্ধ সৃষ্টি হ'য়েছে। এই গুণে আছে সত্ত্ব, রজঃ ও তমের প্রভাব। রজোগুণে কর্ম্ম করাচ্ছে

এবং সেই কর্ম্মের গুণে লোক গুণীর পিছনে ধায়। সত্বগুণে রয়েছে সরলতা, নম্রতা আদি বিংশতি প্রকারের গুণ তাই তো লোকে সেরূপ গুণীর এত আদর করে, তাদের এত মান দেয়।

শ্রীমাধব বলেন, সত্যের গুণ সম্বন্ধে ধারণা করতে গেলে এই গুণগুলো সম্বন্ধে বারবার ভাবতে হবে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই গুণ সকলকে গভীরভাবে চিন্তা করা, অনুধাবন ও অনুশীলন করার চেষ্টা করাই হ'ল সত্যের ধ্যান করা। এর মূল কথাগুলো আংশিকভাবে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে বটে কিন্তু তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই।

সত্বাংশে জ্যোতি ও দৃষ্টির প্রকাশ—এ জ্যোতিও হ'ল সত্যেরই। যেখানে সত্বের প্রকাশ সেখানেই জ্যোতি এবং জ্যোতি থেকেই দৃষ্টি। এ ক্ষেত্রে বিভিন্নভাব রজঃ এবং তমেরও জ্যোতি আছে, তবে সত্বের জ্যোতির কাছে তারা নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়ে। সত্য সবার মধ্যেই প্রবেশ ক'রে আছে কিন্তু অসত্য কখনও সত্যে প্রবেশ করতে পারে না। সত্যই হ'ল মূলত্ব। স্ব-এর অস্তিত্বই মূলত্ব। স-এর সঙ্গে অস্তিত্ব যখন যোগ হয় তখন 'স্ব' হয়।

শ্রীমাধব বলেন, আলোচনা এমন হওয়া উচিত যে মূল বিষয়বস্তু যেন ভাবপ্রবণতার আতিশয্যে হারিয়ে না যায়। ভাবের ঘরে যুক্তি থাকলেও ভাবপ্রবণতায় কোন যুক্তি নেই। আমাদের অজ্ঞানী মন সর্ব্বদাই সুখ সন্ধান করে বেড়ায়। জাগতিক ক্ষেত্রে সুখকেই আমরা সবচাইতে বড় ক'রে দেখি।

দীক্ষা কথার অর্থ এবং প্রয়োজনীয়তা

গত মঙ্গলবার শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করেন,—দীক্ষা কথার অর্থ কি এবং প্রয়োজনীয়তা কি?

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, সাধারণতঃ দীক্ষা বলতে আমরা শুনি পিতার ঔরসে মাতৃগর্ভে এসে আমরা এই পৃথিবীতে প্রথম ক্ষিত হ'য়েছি এবং গুরুদেব যখন দীক্ষাদান করেন তখন আবার দ্বিতীয়বার ক্ষিত হই অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্ম লাভ করি বা দীক্ষিত হই। কিন্তু আধ্যাত্মিক অর্থে দীক্ষা বলতে বোঝায় ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা মহামায়া বা মহাশক্তি থেকে আমরা ধরাধামে এসে প্রথম ক্ষিত হ'য়েছি অর্থাৎ তাঁরই ইচ্ছায় ধরাধামে আমাদের প্রথম আগমন এবং গুরুমন্ত্ররূপে ব্রহ্মবীজ যখন আমাদের কর্ণযোনি দ্বারা হৃদিগর্ভে স্থিত হয় তখন সেই নাম 'জপিতে জপিতে' কোন কোন ভাগ্যবান হয়তো তাঁর প্রেমরাজ্যে দ্বিতীয়বার ক্ষিত হয় অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এটিই হ'ল দীক্ষা কথাটির প্রকৃত অর্থ।

প্রশ্নকর্তা জানতে চান, দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি?

শ্রীমাধব বলেন, কোন পাখী বা হাঁসের ডিম তো তোমরা সবাই দেখেছ। সেই ডিমের ভিতরে আছে একটি পাখীর প্রাণ অর্থাৎ পাখীটির প্রথম জন্ম হ'ল সেই ডিমটি। আবার সেই ডিমটি পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হ'লে ভেঙ্গে গিয়ে বেরিয়ে আসে একটি ক্ষুদ্র পাখীর অবয়ব এবং সেটিই হ'ল তার দ্বিতীয় জন্ম। তেমনি আমাদের সবারও প্রথম জন্মটি হ'য়েছে মায়াকোষে। সেই মায়াকোষ থেকে মুক্ত হ'তে হ'লে অর্থাৎ সেই সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্ম সনাতনের সন্ধান পেতে হ'লে—শ্রীগুরুদেবের কাছে নামরূপ মন্ত্র গ্রহণ ক'রে দীক্ষিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণব্রহ্ম সনাতনই সেই গুরু; তিনিই দেহোপযোগী দেহে আধ্যাত্মিক গুরুরূপে জাগ্রত হন। তিনিই একমাত্র পুরুষ আর যা কিছু চারিদিকে দেখ, সে সকলই হ'ল প্রকৃতি। নামের মধ্যেই তিনি সর্বশক্তি নিয়োজিত ক'রে নিজ নাম নিজ জিহ্বারূপ লিঙ্গ দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমে শিষ্যের কর্ণযোনিতে প্রদান ক'রে তার হৃদয়গর্ভে স্থিত হন। ইহাই হ'ল দীক্ষার তাৎপর্য্য। কাজেই চিন্তা ক'রে

দেখ, মায়াকোষ থেকে মুক্তি পেতে হ'লে দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য।

মানবমানবীকে তাঁর পথে পরিচালনা করেন তিনি। জন্মের প্রারম্ভ থেকে যে মায়ান্ধকারে তারা পড়ে আছে সেখান থেকে মুক্তির আলোতে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি ছাড়া আর কে আছে।

শ্রীমাধব বলেন, গুরু শব্দের গু অর্থে বোঝায় অন্ধকার এবং রু অর্থে বোঝায় আলো। তাই তো বলে গুরু জ্ঞানশলাকা দ্বারা অন্ধ শিষ্যের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করেন।

দেশ দেশান্তরে যদিও দীক্ষাদানের প্রথা বিভিন্ন তথাপি দীক্ষার মূল লক্ষ্যে কিন্তু কোন প্রভেদ নেই।

শ্রীমাধব বলেন, আলোচনা সর্ব্বদাই নিরপেক্ষ হওয়া দরকার। দীক্ষা বিষয়টি আপেক্ষিক নয়, নিরপেক্ষ। সভায় প্রশ্ন উঠেছিল কোন কোন মহাপুরুষ তো দীক্ষিত নন্। সে কথার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, কে কি ভাবে জগতে ক্ষিত হ'য়েছে সেকথা জানবার বা বুঝবার ক্ষমতা কি আমাদের মত সাধারণ মানুষের আছে? আমরা অন্ধ, অজ্ঞান—মহাপুরুষদের বিচার করা কি আমাদের সাজে?

সাধারণ মানবমানবীর ক্ষেত্রে দীক্ষা গ্রহণ যে একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। দীক্ষা না নেওয়া পর্য্যন্ত মায়াকোষ থেকে মুক্ত হবার আর কোন পথই যে খোলা নেই অর্থাৎ তাঁর বাড়ীর সন্ধান তিনি ছাড়া আর তো কেউ বলে দিতে পারে না, তাই তো তিনি দেশ—কাল—পাত্রানুসারে দেহোপযোগী দেহীর মাধ্যমে মানবমানবীকে তাঁরই নামরূপ মহামন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে নেন অর্থাৎ মুক্তির সন্ধানে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যান।

সভায় প্রশ্ন উঠেছিল স্বপ্ন দীক্ষার কথা, তার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, স্বপ্ন-দীক্ষাকে কেউ কেউ হয়তো দীক্ষার সমতুল্য মনে করে তবে আমি একে বিশেষ কোন স্থান দিই না। আমার মতে স্বপ্ন

স্বপ্নই এবং সেটি হ'ল আপেক্ষিক। কোন একজন শ্রোতা অস্ফুট ভাবে উচ্চারণ করেন দ্রোণাচার্য্য তো একলব্যকে স্বপ্নে দীক্ষা দিয়েছিলেন,—প্রতিবাদের স্বরে শ্রীমাধব বলেন, কে বলেছে যে দ্রোণাচার্য্য স্বপ্নে দীক্ষা দিয়েছিলেন? তাছাড়া তিনি ছিলেন অস্ত্রগুরু, তাঁর সঙ্গে অধ্যাত্মগুরুর তো তুলনা করা চলে না। তাই যদি হ'ত তবে দক্ষিণাস্বরূপ গুরু কি কখন শিষ্যের আঙ্গুল কেটে নিতে পারেন? অধ্যাত্মগুরু এ কাজ কখনও করতে পারেন না। স্বপ্ন-দীক্ষা সম্বন্ধে যাদের বিশ্বাস আছে তাদের সে বিশ্বাসে ঘা দেওয়া আমার অভিপ্রায় নয় তবে স্বপ্ন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীমাধব বলেন, আমার জ্ঞানে, স্বপ্ন হ'ল অবচেতন অবস্থা। সেই অবচেতন অবস্থায় চেতনকে লাভ করা আমার বিচারে সম্ভব নয়, তাই স্বপ্ন-দীক্ষিতকে আমি বিশেষ স্থান দিতে পারি না। এটা আমার নিজস্ব মত, তাই ব'লে স্বপ্ন-দীক্ষা মিথ্যা একথা আমি বলি না।

আমি বলি, তিনি হ'লেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন এবং তিনিই তো চৈতন্য, কাজেই কৃপা যদি তিনি করেনই তবে ঘুমন্ত অবস্থায় কেন করবেন—জাগ্রত অবস্থায় সেই কৃপা করতে ক্ষতি কি?

শ্রীমাধব বলেন, স্বপ্নে কখনও অরূপ দর্শন হয় না, হয় রূপ দর্শন। গুরু যিনি, তিনি কখনও সুষুপ্তি অবস্থায় কাউকে দীক্ষা দেন না। আমি বার বার বলেছি যে, তিনি দেহোপযোগী দেহে জাগ্রত হ'য়ে শিষ্যের কর্ণে দীক্ষারূপে নিজ নাম বিতরণ করেন। যে দেহ দেখলেই ভক্তিতে মাথা নত ক'রে মানবমানবী তাঁর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে, তাঁকেই আমরা গুরু ব'লে প্রণাম জানাই। গুরুর গুরু কে, সে সম্পর্কে আমাদের কোন আগ্রহ থাকা তো সমীচীন নয়।

শ্রীমাধব বলেন, বৈষ্ণবগণ বলেন, গুরু কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণ নন্; আর যে গুরুর কথা আমি বলছি কৃষ্ণ, বিষ্ণু সবই তিনি, কেননা তিনি যে

কারুর স্বরূপ নন ; তবে গুরুর গুরু কথাটিকেও আমি অস্বীকার করি না, কারণ পিতাগুরু, মাতাগুরু, শিক্ষাগুরু প্রভৃতি অষ্টপ্রকার গুরুর কথা তো আমাদের সবারই জানা আছে। কিন্তু 'তিনি' হ'লেন তাদের সবার গুরু। সারা বিশ্বময় গুরু আর শিষ্য ; সে সম্পর্কের মাঝখানে আর কিছু নেই, কোন বাধাবিঘ্ন, কোন প্রতিবন্ধক কোন আড়াল সেখানে থাকতে পারে না। যে গুরুদেবের কথা আমি বলি, তিনি তো কারুর দালাল নন, কারুর ঘটক নন যে অন্য কাউকে ভজনা করবার পথ তিনি দেখিয়ে দেবেন !

আমি যে গুরুর কথা বলি. তিনি একদিকে পথনির্দেশক নন আবার পথনির্দেশকও বটে। সেটি কি রকম ? নিজপথ তিনি নিজেই দেখিয়ে দেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি পথনির্দেশক আবার গুরুই হ'লেন একমাত্র আরাধ্য—গুরু ভিন্ন জীবের আরাধ্য কি আর কিছু আছে ? তাঁকে চিনবার জন্য তো দেবদেবীর পূজা নয়। দেবদেবীকে পূজা করার কারণ হ'ল তাদের ভিতর দিয়ে গুরুকে উপলব্ধি করার জন্য।

শ্রীমাধব বলেন, আমার আলোচনার লক্ষ্য হ'ল গুরু সম্বন্ধে সবার ধারণা যেন আরও স্পষ্ট, আরও প্রকৃষ্ট হয় ; কোন গুরু বা দেবদেবীকে নস্যাৎ করা এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। মূর্তিপূজার কারণ হ'ল মূর্তির মধ্যে তিনিই যে স্বয়ং মূর্ত্ত আছেন সেটি উপলব্ধি করা।

পরমার্থ

গত মঙ্গলবার আলোচনার প্রারম্ভে জনৈক ভক্তের দুই চারিটি উক্তিকে কেন্দ্র ক'রে শ্রীমাধব কয়েকটি মূল্যবান বাণী প্রদান করেন

যাতে শিষ্য ভক্তদের আধ্যাত্মিক পথ চলা সহজ, সরল ও সুগম হয়।

ভক্ত প্রবর সবিনয়ে উল্লেখ করেছিলেন, আমরা সাধারণ লোক, আমাদের জ্ঞানও স্বল্প দৃষ্টিও প্রসারিত নয়। 'একবার যদি জ্ঞানের আলো পাই তবেতো কোন চিন্তা নেই। অন্ধকার ঘরে সুইচ্ টেপা মাত্র যেমন সমস্ত ঘরখানাই আলোকিত হয়ে উঠে, কোথাও অন্ধকারের লেশমাত্র থাকেনা এও তেমনি, একবার জ্ঞানের আলো পেলে আরতো কোন অনুশোচনা থাকে না।

উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, 'স্বল্প জ্ঞান, স্বল্প দৃষ্টি সর্ব্বপ্রকার দুঃখের কারণ, জ্ঞান ছাড়া কারো মনে কি অনুশোচনা জাগে? জাগে না। জ্ঞান তিন প্রকার—প্রথমে জড়জ্ঞান অর্থাৎ জগতকে জানা, তারপর আত্মজ্ঞান অর্থাৎ নিজেকে জানা, এবং সর্ব্বশেষ ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ তাঁকে জানা। ঋষিদের কথা নস্যাৎ করার কোন প্রয়াস আমার নেই তথাপি তাঁদের কথাকে স্থান-কাল-পাত্রানুসারেতো ব্যাখ্যা করা চাই। আর একটি কথা হ'ল, জগতে কতকগুলো চমৎকার উপমা আছে যার কোন জবাব নেই, সেগুলো বলতে ভাল, শুনতেও মধুর তবে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় সেখানেও অনেক ফাঁক থেকে যায়। এই যে বললে অন্ধকার ঘরে সুইচ টেপা মাত্র সমস্ত ঘরখানি আলোয় আলোময় হ'য়ে যায়, সেই সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এতদিন যে ঘর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, এক ফোঁটা আলোর আভাসও যে ঘর কোনদিন পায়নি, ঘরে যে হাজার হাজার বছরের ময়লা সে কি সেই আলোতে মুক্ত হ'য়ে যায়? যায় না। তবে হ্যাঁ, আলোয় ঘরের ময়লা ধরা পড়ে,—কাজেই ময়লা পরিস্কারের কথা তখন মনে জাগে।'

সেদিন সভায় যে প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয়েছিল সেটি হ'ল,—পরমার্থ কি? কি ভাবে তা পাওয়া যায়? পাওয়ার পথে

কি কি বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হ'তে হয় এবং সেই বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করার উপায়ই বা কি?

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, যাঁর ইচ্ছায় সর্ব্বপ্রকার অনর্থ বা অমঙ্গল নাশ হয় তিনিই পরমার্থ। মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, তাঁকে পরমার্থ বলা হয় কেন? তার উত্তরে বলি, সকল প্রকার অর্থের যিনি মূল তিনি পরমার্থ। যেহেতু তিনি সমস্ত প্রকার অর্থের মূল, সেইহেতু তাঁকে সবার স্রষ্টা-কর্ত্তা-বিধাতা-পরিচালক ইত্যাদি সব কিছুই বলা যায়।

আমার মতে তিনি লাভের বা পাওয়ার বস্তু নন। যা আমার কাছে নেই কিন্তু অন্যের কাছে আছে বা আমার কাছে ছিল বর্ত্তমানে হারিয়ে গেছে তাইতো লোকে খোঁজে, তাই নয় কি? কিন্তু সদা সর্ব্বদাই যিনি আমার মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত আছেন সেক্ষেত্রে তাঁকে পাওয়া এবং হারানো এ দুটির কোন প্রশ্নই উঠে না। আবার তিনি লাভের বস্তুও নন কেন? কারণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোন কর্ম্মের বিনিময়ে তো তাঁকে লাভ করা যায় না। কর্ম্মের ফল স্বরূপ লাভ লোকে আশা করে কিন্তু তিনি কর্ম্মের ফলস্বরূপ নন্। তাই তিনি কোন লাভের বিষয় হ'তে পারেন না।

অনেক সময় অবশ্য আমরা ঈশ্বর লাভের কথা শুনে থাকি মহাপুরুষগণ সর্ব্বদাই যুগোপযোগী কথা বলেন। কঠোর তপস্যা বলে যে ঈশ্বর জ্ঞানের উদয় হয় সেই জ্ঞানে জানা যায়,—তিনি পরম সত্তা আর আমি তাঁর অভিন্নসত্তা। এই জানাটাকেই লাভ বলা যায় কিন্তু তাঁকে লাভ হ'ল একথাতো বলা যায় না। এই অর্থে পাওয়া এবং লাভ কথাটিও একেবারে নস্যাৎ করা যায় না। তিনি আমার মধ্যেই যখন আছেন তখন হারাবার বা পাবার প্রশ্ন উঠে না, তবে তাঁকে জানার প্রশ্নটি কিন্তু থেকে যায়।

শ্রীমাধব বলেন, যে পথে বহুদিন চলাফেরা বন্ধ থাকে স্বভাবতই

সে পথটি থাকে আবর্জনায় পরিপূর্ণ, আর নিত্য চলার পথটি পরিষ্কার হয় ব'লে মোটেই আবর্জ্জনা জমতে পারে না। আবর্জ্জনাপূর্ণ পথ হিংস্র জীবের বাসস্থান তাই দংশনের ভয়ও প্রচুর পরিমাণে থাকে। তাঁকে জানার পথে বা সাধন পথে চলতে গেলে প্রথম বাধাই হ'ল, সংসারের নানারকম জ্বালা যন্ত্রণা। সংসার যদি তাঁকে জানার পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়, তবে সংসার বাদ দিয়ে সাধন ভজন করাইতো শ্রেয়ঃ ব'লে মনে হয়, তাই নয় কি? শ্রীমাধব বলেন, পুরাকালের মুনিঋষিগণ হয়তো এ কারণেই সংসার ত্যাগ ক'বে পাহাড় পর্ব্বতের গুহায় বা বনে জঙ্গলে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতেন, কিন্তু আমার মত হ'ল, এ সংসারও যখন তাঁর এবং আমিও তাঁর, তখন সংসারকে বাদ দিয়ে তাঁকে জানার প্রয়োজন কি? তাঁর ইচ্ছায় সংসারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পালনে যখন আমি এসেছি তখন সংসার ত্যাগ করাতো দূরের কথা, সুষ্ঠুভাবে সংসার ধর্ম্ম পালন ক'বে যেতে পারলে তাঁকে আর আমাদের খুঁজতে হবে না, তিনিই আমাদের খুঁজে নেবেন, কেননা ভাল মালিক সর্ব্বদাই সুকর্ম্মী খুঁজে বেড়ায়। কাজেই শান্তি অশান্তির জন্য মাথা না ঘামিয়ে সংসাররূপ জীবন পথকে সুগম করার জন্য প্রত্যেক সংসারী জীবেরই সহজ, সরলভাবে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন ক'রে যাওয়া উচিত। সহজ যদি হ'তে পারি, প্রকৃতিতে যদি সরলতা প্রকাশ পায় তবে অন্তর থেকেই যে নম্র এবং বিনয়ের ভাব জেগে উঠে। কিন্তু আমরা যে বড় কঠিন, বড় বাঁকা। লোকালয়ে বা সভায় আমরা যেমন সরল, নম্র এবং বিনয়ের অবতার, প্রকৃতপক্ষে আড়ালেও কি তাই? মোটেই তা নয়, সেখানে আমাদের কৃত্রিম মুখোস খুলে যায় এবং প্রকাশ পায় স্বভাবের কঠোরতা, উগ্রতা, হিংসা পরায়ণতা, পরশ্রীকাতরতা, জুগুপ্সা ইত্যাদি।

কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রেই যার মধ্যে সরলতা, নম্রতা প্রকাশ পায় তার মধ্যে সহিষ্ণুতাও আপনা থেকেই উদয় হয়। আবার এই তিনটি

গুণের সমাবেশ যার অন্তরে আছে তার কাছ থেকে উদারতা কখনও দূরে থাকতে পারে না। উদারতা এলে অষ্টপাশ দমন করা যায়। উদারতা জাগ্রত হ'লে হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, জুগুপ্সা ইত্যাদির ঠাঁই সেখানে মেলে না। উদারতার সঙ্গী হ'ল প্রসারতা কেননা তারা যে একসূত্রে বাঁধা, এক বৃন্তে দুটি ফুল। এই প্রসারতা এলেই সঙ্কীর্ণতার নাশ অনিবার্য্য। মানব মানবীর সর্ব্ব দুর্ব্বলতা হরণকারী এই প্রসারতার প্রভাবে আবিলতা শূন্য স্বচ্ছ আনন্দের ঢেউয়ে চতুর্দ্দিকে প্লাবন বয়ে যায়। এই আনন্দই হ'ল পরম সত্য এবং আমরা যে সেই পরম সত্যেরই অভিন্নসত্তা, সে বোধ তখন মানব মানবীর অন্তরে অনুভূত হয়। এ জানার অর্থই হ'ল, আমি কে জানা, ব্রহ্মকে জানা।

শ্রীমাধব বলেন, আমরা যদি এ সকল কথা সহজ ও সরলভাবে গ্রহণ ক'রে পালনের চেষ্টা করি তবেই সব গোল মিটে যায়। তিনি বলেন, এ সকল শক্তি আমাদের সকলের মধ্যেই আছে, কেননা এই সরলতা, নম্রতা এ সবই মানবমানবীর চেষ্টা সাপেক্ষ। কার্য্যোদ্ধারের সময় আমরা তো কত সরলতা, কত নম্রতার অভিনয় করি কিন্তু কাজ হাসিলের পরে কোথায় থাকে সেই সরলতা আর নম্রতা? সভা সমাবেশে আমাদের সরলতা, নম্রতা, বিদ্যাবুদ্ধি আর বিনয়ের তো কোন অভাবই দেখা যায় না।

শ্রীমাধব বলেন, সে বহুদিনের কথা, মনে পড়ে আমার কাছে একজন ব'লেছিল, আমরা যে কে কত খাঁটি আর সভ্য সেটি বাতি নিভলে অন্ধকারে বোঝা যায় অর্থাৎ সভাসমিতির আড়ালে আমাদের চরিত্রের কুবৃত্তিগুলো আত্মপ্রকাশ করে। এই কুবৃত্তিগুলোকেই আমাদের সংশোধন করতে হবে।

আমরা যখন চোখ বুঁজে ধ্যানে বসি তখন হয়তো এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যে ধ্যান জপ ইত্যাদিতে একাগ্রতা রক্ষা করা দুরূহ হ'য়ে পড়ে। শ্রীমাধব বলেন, আমার কথা হ'ল, বাধাবিঘ্ন যদি

আসে তো আসুক, তুমি তোমার পূজা, জপ তপ, ধ্যান ক'রে যাও। তোমার কাজ তুমি ক'রে যাও, মনের কাজ মন করুক।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা প্রসঙ্গে সভায় জনৈক ভক্ত বলেন, ঠাকুর ভগবৎ তত্ত্ব আলোচনার সময় রাণী রাসমনিকে গালে চড় মেরেছিলেন। এ কথার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর জীব-শিক্ষার কারণেই রাণী রাসমনিকে চড় দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, যখন যা করার তখন তাই করবে, অন্য চিন্তা করবে না; রাসমনি বিষয় চিন্তায় নিমগ্ন হ'য়েছিলেন কি না। শ্রীশ্রীঠাকুর মায়ের ভোগ খেলেন তার মধ্যে রহস্যটি হ'ল—'তুমি যখন যে ইচ্ছা প্রকাশ করছ, কাঠের পুতুলের মত তাই তো আমি ক'রে যাচ্ছি',—এ বোধটি যার জাগে তার আমি সত্তা ব'লে কিছু আর থাকে না।

শ্রীমাধব বলেন, এ হ'ল যন্ত্রীর যন্ত্র চালানোর মত; যন্ত্র বলে যন্ত্রীকে, 'তুমি যেমন বাজাও তেমনি বাজি,—আমার মধ্যে তো কিছুই নেই।' এ বোধ যার আছে সেই হ'ল আমিত্ব নাশের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যন্ত্রীর হাতে পড়ে যন্ত্র কত সুরেলা পরিবেশই না রচনা করে। ভেবে দেখ, যার এ উপলব্ধি হ'য়েছে যে, তিনিই যন্ত্রী আমি তাঁর হাতের যন্ত্রবিশেষ কাজেই এ সুরের খেলাও যে তাঁরই ইচ্ছায় হয়, আমার ইচ্ছায় নয়, তার আমিত্ব নাশ হবে না, তো কার হবে।

শ্রীমাধব বলেন, যার ভুল ভ্রান্তি ঘটে তাকেই পিটুনী খেতে হয়, শ্রীশ্রীঠাকুরের তো ভুল কিছু হয়নি তাই রাণী রাসমনিকে চড় দিয়েও তাঁর পিঠে ঘা পড়েনি,—লোকে মারতে এসেছিল বটে। প্রকৃষ্ট নির্ভরতা এলে কোন কিছুতেই আটকাতে পারে না, আর যদি অভিনয় কর তবে তো মার খেতেই হবে।

নিয়তি

গত মঙ্গলবার শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্তের প্রশ্ন ছিল,—নিয়তি কি? নিয়তি আমাদের জীবনে এতসব প্রতিক্রিয়া করে কেন? নিয়তির প্রভাব কি ক'রে উত্তীর্ণ হওয়া যায়?

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, নিয়তি সম্বন্ধে আমাদের মত সাধারণ লোকের যে ধারণা বা বোধ রয়েছে সেটি কেবল ধারণামাত্র অর্থাৎ সেটি সত্য নয়। নিয়তি বলতে প্রকৃতপক্ষে যে কি বোঝায় তা আমরা অনেকেই জানিনা।

নিয়তি কথাটি তবে কি অর্থ বহন করে? নিয়তি ব'লে কি তবে কোন দেবী বা শক্তি আছে? আমাদের ধারণা নিয়তি একটা শক্তি, যে শক্তী জীবনপথে আমাদের পরিচালনা করে। নিয়তি কথাটির প্রকৃত অর্থ জানতে পারলেই আমাদের মনের সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর সহজ হ'য়ে আসবে। একটি লোক দেখলেই সে ভাল, মন্দ বা কৃতী তা যেমন আমরা বুঝতে পারিনা, সেরকম নিয়তির খেলাও আমরা সদা সর্ব্বদা দেখে যাচ্ছি তবে সেটি কি তা আমাদের জানা নেই।

নিয়ৎ কর্ম্মের ফল যা আমাদের নিয়মিত ভাবে ভোগ ক'রে যেতে হয়; সেই ফলটিই হ'ল নিয়তি। মনের সঙ্কল্প অনুযায়ী আমরা কর্ম্ম ক'রে যাই তাই সেই কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফলটিও নিয়ৎ অনুসারে ভোগ ক'রে যেতে হয়। যে নিয়ত বা নিয়মে ফলভোগ করতে হয় সেই অবস্থাকে বলে নিয়তি।

শ্রীমাধব বলেন, ধরে নাও একদিন এই বিশ্বে মানুষের কোন

অস্তিত্ব' ছিল না। প্রথম যখন মানুষ সৃষ্টি হ'ল তখন সঙ্কল্প ক'রে তারা কর্ম্ম সুরু করে। যতদিন তারা এই জগতসংসারে বেঁচে আছে ততদিন এই কর্ম্মের ফল তাদের ভোগ ক'রে যেতে হয়। কর্ম্ম করলে তার ফল সৃষ্টি তো হ'তেই হবে; সে সুফলই হ'ক আর কুফলই হ'ক। জন্মের পর যখন থেকে কর্ম্ম করবার বুদ্ধি জাগে তখন থেকেই নিয়ৎ কর্ম্মের সুরু, কর্ম্মের সাথে সাথেই কর্ম্মফলেরও সৃষ্টি। ফল সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ভোগের নিয়মও সৃষ্টি হয় যাতে ভালমন্দ ফল নিখুঁতভাবে ভোগ করতে পারে। মানুষ প্রথম জন্মে সুকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম কি ক'রেছে তা জানে বটে, কিন্তু তার সম্পূর্ণ ফল তো সে জীবদ্দশায় ভোগ ক'রে যেতে পারে না কেননা সেখান থেকেই যে কর্ম্মফলেরও সৃষ্টি। কর্ম্মের ফল এমন সূক্ষ্ম মাপকাঠিতে নির্দ্ধারিত হয় যে ঘটনা প্রবাহ মানুষকে সেই পথেই টেনে নেয়।

নিয়তির শক্তি প্রকাশের সীমানা মনোজগত পর্য্যন্ত কারণ মনের সঙ্কল্প থেকেই যে এর সৃষ্টি। এখন প্রশ্ন হ'ল নিয়তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি? নিয়তিই নিয়তির হাত থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেয়। শ্রীমাধব বলেন নিয়তির হাত থেকে মুক্তি পেতে হ'লে সাধু গুরুর শরণাপন্ন হ'তে হবে; এটিও একটি নিয়ৎ অর্থাৎ এর কোন পরিবর্ত্তন নেই এবং এই সাধু গুরুর উপদেশ নির্দ্দেশ পালন ক'রেই মনাতীত অবস্থায় যাওয়া যায়, কেননা নিয়তির কোন প্রভাব মনাতীত অবস্থায় পড়ে না। মনোরাজ্যে থেকে আত্মরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারলে বোঝা যায় যে, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয় এবং যা কিছু ভোগ তাও তিনিই করছেন। কিন্তু মনোজগতে থেকে একথা বলা সান্ত্বনাবাক্য ছাড়া আর কিছু নয়। আত্মরাজ্যে যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে তার পক্ষেই একথা বলা সাজে। তবে ঐ সান্ত্বনা বাক্যই আমাদের পরবর্ত্তী সকল কর্ম্মে শক্তি, প্রেরণা বা উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছে তা

নইলে যে আমরা ক্রমশঃ দুর্ব্বল, পঙ্গু ও শক্তিহীন হ'য়ে পড়ব্।

গুরুর উপদেশ নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমরা সাধনভজন, জপতপ ইত্যাদি ক'রে যাই বটে কিন্তু সে সম্বন্ধে আমাদের তো কোন অনুভূতি নেই। গুরুদেব বলেন ব'লেই আমরা এই জপতপ করি কিন্তু এই জপতপ ক'রে কি হবে বা আমরা কি পাব তা কি জানি? জানিনা। তখন ভাবি, 'হে গুরু কি পাব না পাব সে সবই তো তোমার ইচ্ছা'; এও এক প্রকার সান্ত্বনা বাক্য। যতক্ষণ আমাদের মন অশান্ত থাকে ততক্ষণই এই সান্ত্বনাবাক্য। গুরুনাম জপ করলে হয়তো তাঁর দর্শন বা মুক্তি পাব এই আশায় আমরা জপতপ করি। শতকরা নিরানব্বুই জন লোকই জপতপ করে অশান্তি, জ্বালাযন্ত্রণা দূর করার জন্য বা ব্যাধি মুক্তির জন্য, কেনন তাদের আশা যদি বেঁচে থাকি তবেই তো তোমার নাম করবার সামর্থ্য থাকবে! তাই প্রার্থনা জানাই, 'হে প্রভু! এ সংসার তো তুমিই দিয়েছ, সুস্থ না থাকলে সুষ্ঠু ভাবে সংসার করি কি ক'রে'? তাঁর কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে আমাদের মন অনেক শান্ত হয়।

শ্রীমাধব বলেন, অনেক সময় দেখা যায় গুরুনাম জপ করার পর হয়তো কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় তখন আমরা মনে ভাবি, 'হে গুরু! সবই তোমার করুণা'। গুরুর প্রতি এ শ্রদ্ধাও ভাল।

নিয়তির হাত থেকে মুক্তি পেতে হ'লে গুরুপ্রদত্ত নাম তরীতেই ভাসতে হয় তবে এও কিন্তু নিয়ৎ কর্ম্মেরই ফল। আমার নাক, আমার কান, আমার চোখ এই আমিত্ব ভাব যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কানা, খোঁড়া, অন্ধ সবই হ'তে হবে এবং ঠ্যাংও ভাঙ্গবে। আমার

আমার বোধটি যখন চ'লে যায় তখন কানা খোঁড়াও হ'তে হয় না আর ঠ্যাংও ভাঙ্গে না।"

শ্রীমাধব বলেন, তোমরা যে সোনার অলঙ্কার পর, তার কত জ্যোতি, কত সৌন্দর্য্য কিন্তু এই অলঙ্কারও তো বাঁকা হ'য়ে যেতে পারে, ভেঙে যেতে পারে। অলঙ্কার বাঁকা হ'য়ে গেলে বা ভেঙে গেলে সে যাকে আবরণ ক'রে আছে তার তো কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই; সেইরকম দেহটি হ'ল তাঁর অলঙ্কার, তাঁর আবরণ, নিষ্ক্রিয় আত্মারূপে তিনি সেখানে বিদ্যমান, কাজেই দেহের যদি কোন কিছু ঘটে তাতে তাঁর কি?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ক্যান্সার হ'য়েছিল, তা'তে ধর্ম্মপথে তাঁর কি কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হ'য়েছিল?

সভায় জনৈক ভক্ত একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেন; তার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, শ্লোকের কথাও সীমিত, মনোজগতের বাইরে তার স্থান নেই—কর্ম্মের পরিপ্রেক্ষিতেই শ্লোক তৈরী হয়। কর্ম্ম যাঁর কাছে যে ভাবে অনুভূত হ'য়েছে তিনি সেই ভাবেই তাকে ব্যাখ্যা ক'রেছেন, এবং পরিত্রাণের পথ দেখিয়েছেন—এ সবই শ্লোক। অনুভূতির দুটি ধারা। মনোজগতের অনুভূতিকে বহিরানুভূতি বলা হয় আর অন্তরের অন্তরে যে অনুভূতি তাকে বলে অন্তরানুভূতি। বহিরানুভূতিকে ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু অন্তরানুভূতি প্রকাশ করা অসম্ভব।

শ্রীমাধব বলেন, মানবমানবীর জীবনে দুটি তাগিদ দেখা যায়,—একটি বাঁচার তাগিদ, অপরটি ক্ষুধার তাগিদ। এই দুটি তাগিদই মানবমানবীর জীবন ঘিরে রেখেছে। আবার ক্ষুধাও বাঁচার জন্য এবং বাঁচাও ক্ষুধার জন্য। দৃষ্টির তাগিদে, বচনের তাগিদে, শ্রবণের তাগিদে, ইন্দ্রিয়ের তাগিদে এরকম সব তাগিদের পেছনেই রয়েছে

ক্ষুধা ও বাঁচার তাগিদ। এই দুটি তাগিদই আমাদের দিয়ে সকল কর্ম্ম করিয়ে নিচ্ছে।

তাই বলি, মনোরাজ্যে থাকাকালীন কারুর মনে যদি ঐ সমস্ত ভোগে পড়ে অনুশোচনা জাগে, তবে এ কথাই যেন তার মনে জাগে, 'এমন কর্ম্ম যেন না করি যাতে ভোগে পড়তে হয়; নিয়তির কাজ নিয়তি করুক, ভোগের কাজ ভোগ করুক। এমন কর্ম্মই যেন করি, যাতে নিত্যানন্দ পাই। যে কর্ম্মে নিত্য আনন্দ তার ফলও যে নিত্য বা আনন্দময়। সেখানে ভোগাভোগের প্রশ্ন তো আর থাকে না।'

শ্রীমাধব বলেন, ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হ'য়ে যে কর্ম্ম তুমি কর, যে দানধ্যান কর বা সৎ ভাব নিয়ে যে কর্ম্ম কর, সে সকল কর্ম্মেরই তো ফল আছে। কর্ম্মফলের হাত থেকে কারুরই যে রেহাই নেই। তাই মনে এই প্রশ্ন জাগে যে নিয়তিই যদি সর্ব্বশক্তিময়ী তবে আর গুরুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ ও সৎসঙ্গ করার প্রয়োজন কি? আর নামজপেরই বা কি দরকার? কিন্তু একথা ঠিক নয়। সাধু, গুরুর কাছে যে যেতেই হবে।

জনৈক ভক্ত বলেন, সাধু, গুরু ইচ্ছা করলে সর্ব্বদাই ভক্ত ও শিষ্যকে রক্ষা করতে পারেন। এ কথার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, তাঁদের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের গভীরতা কর্ম্মফল ভোগে ছত্ররূপে তোমায় রক্ষা করবে অর্থাৎ ফলবর্ষণ হ'য়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তার বেগটি কমে যায়। ঝড়বৃষ্টিতে ছাতা নিয়ে বেরুলে যেমন ছাতা দেখে ঝড়বৃষ্টি থেমে যায় না কিন্তু ছাতার শক্তি অনুযায়ী ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে তুমি কিছুটা রক্ষা পেতে পার, এও তেমনি। কারুর চোখের জল দেখে যদি সাধু-গুরু-মহাপুরুষ তাকে রক্ষা করেন তবে তো তাঁরা পক্ষপাতিত্ব দোষে দোষী হবেন। কাজেই ওঁ'রা সে কাজটি করেন না। তবে ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে তাঁদের কাছে কেঁদে কেটে পড়লে যদি বিপদ

থেকে রক্ষা পাও তখন তোমরা ভাব, তাঁদের কৃপাতেই রক্ষা পেয়েছ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ মুক্তি আসে তোমাদের ভক্তি-বিশ্বাসের জোরে।

এই ভক্তি-বিশ্বাসের মধ্যে যেমন আকর্ষণ-কর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তি রয়েছে তেমনি সাধু, গুরু, মহাপুরুষের মধ্যেও ঐ তিনটি শক্তিই আছে। সেই আকর্ষণই তোমায় সাধু, গুরুর কাছে টেনে নিয়ে যায় আর তখন তুমি তোমার আর্তি, তোমার আকুতি তাঁকে জানাও। এর দ্বারা এই শিক্ষাই দেওয়া হয় যে তোমরা সবাই গুরুমুখী হও। তাইতো বলে, সাধুর প্রতি, গুরুর প্রতি একান্ত ভক্তি থাকা চাই, পূর্ণ বিশ্বাস থাকা চাই।

গুরু ইচ্ছা করলে সব করতে পারেন—এ কথাটি যথার্থ সত্য কেননা গুরুই যে পরমসত্য। ভাষা দিয়ে কি তাঁর অপার করুণা কখনও প্রকাশ করা যায়? যায় না। গুরুই যে অনন্ত বিশ্বের বহিরান্তরে ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত থেকে সব কিছু ক'রে যাচ্ছেন সে'বোধ যখন আসে তখনই বলা যায়—আমি শ্রীগুরুদেবের অভিন্ন-সত্তা। তার আগে অর্থাৎ এই বোধ আসার আগে যখন আমরা এ সকল কথা উচ্চারণ করি তখন একে সান্ত্বনাবাক্য ছাড়া আর কি কিছু বলা যায়?

সভায় কথা উঠেছিল যে এমন অনেক সাধু, মহাপুরুষ আছেন যাঁরা জগতে মানবমানবীকে বহু রোগ, শোক, দুঃখ, দুর্দ্দশা থেকে রক্ষা করেন।

শ্রীমাধব বলেন, অনেক সময় দেখা যায় মহা মহা বিদ্বান অর্থাৎ জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, বিজ্ঞানী এদেরও বিশেষ বিশেষ খেয়াল থাকে। যেমন ধর, কোন বৈজ্ঞানিকের নাটক করার সখ আছে, এই নাটকের সঙ্গে বিজ্ঞানের কি কোন সম্পর্ক আছে? এরকম যিনি অনন্ত বিশ্বের গুরু তিনিও সময় সময় এই বিশ্বনাট্যশালায় এসে কত নাটক ক'রে যান। এই নাটকের সঙ্গে সেই পরম সত্যের কোন সম্পর্কই নেই।

মহাপুরুষদের এই সকল বিভূতিকেও আমি নাটক ব'লেই মনে করি।

পরমসত্যের সঙ্গে এ সকল নাটকের কোন সম্বন্ধ আমি খুঁজে পাই না। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—এ সমস্ত বিভূতিতে কেউ যেন না ভোলে।

আমার, মতে, নিয়তির কোন শক্তি বা প্রভাব আছে—এটি আমাদের ভুল ধারণা। নিয়তির সৃষ্টিকর্ত্তা আমি নিজে। তোমার নিয়তি যেমন তোমার কর্ম্মফলের উপর নির্ভরশীল তেমনি আমার নিয়তিও একান্তভাবে আমারই হাতে গড়া। জগতে মানবমানবী অবিরত এরকম অনন্ত নিয়তির সৃষ্টি ক'রে চলেছে।

সভায় প্রশ্ন উঠেছিল, যারা জন্মান্তরবাদ মানে না তাদের ক্ষেত্রে নিয়তির এই খেলাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? এ কথার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, যারা বলে যে জন্মান্তরবাদ মানি না তারাও প্রকারান্তরে জন্মান্তরকে মেনে চলে। কেননা তাদের ক্রিয়াকর্ম্মই যে সেটি প্রমাণ ক'রে দেয়। কাজেই এটি তাদের মুখের কথা ছাড়া আর কিছু নয়। চার্ব্বাক ঋষিও ব'লে গেছেন, 'খাও দাও, আমোদ কর—এ জন্মেই সব' অর্থাৎ এ জন্মে এমন কর্ম্ম কর যাতে জন্মান্তরের ফেরে তোমায় পড়তে না হয়।

জগতের মানবমানবীর প্রতি শ্রীমাধবের উপদেশ হ'ল, নামরূপ ভেলায় চড় অর্থাৎ পরমসত্যের উপর নির্ভর ক'রে জীবনপথ পরিক্রমা ক'রে যাও, কেননা সর্ব্বশক্তি নিয়ে সত্য যে তাঁর নামেই নিয়োজিত আছেন। সেই নামে তুমি নিজেকে নিয়োজিত কর অর্থাৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হ'লে যে বুদ্ধি জাগে সেই বুদ্ধিতে কর্ম্ম কর। মানুষের মনুষ্যত্ব আর সত্যের সঙ্কল্প কখনও নিয়তির অধীন হ'তে পারে না। সত্যের সঙ্কল্প আছে বিকল্প নেই, কেননা সেটি আত্মরাজ্যের অন্তর্গত। কিন্তু তোমরা যখন মনের অধীনে

কর্ম্ম কর সেক্ষেত্রে সঙ্কল্প-বিকল্প দুই-ই আছে, তাই ভোগও আছে। মনোরাজ্যের সঙ্কল্প-বিকল্প অবস্থা থেকেই নিয়তির সৃষ্টি, কেননা সেখানে কর্ম্মের বাসনা ও সংশয় দুটিই পাশাপাশি চলে তাই ভোগের অধীন, কিন্তু সত্যের ক্ষেত্রে 'একটিই সঙ্কল্প অর্থাৎ সৎপথে চল, সত্যবাদী হও, সৎ কর্ম্ম কর।

চিত্তশুদ্ধি

মঙ্গলবার শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করেন, চিত্তশুদ্ধি বলতে কি বোঝায়? চিত্তশুদ্ধি লাভ করার উপায় কি? শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, 'আহারো শুদ্ধৌঃ চিত্তশুদ্ধিঃ,' অর্থাৎ শুদ্ধাহার চিত্তশুদ্ধির সহায়ক। আপনার মঙ্গলালোকে আহার সম্বন্ধে তেমন কোন বিধিনিষেধ নেই। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন,' শাস্ত্রে মনকেও চিত্ত বলা হ'য়েছে আবার চিত্তকেও মন বলা হ'য়েছে। চিত্ত হ'ল ক্ষেত্র এবং এই ক্ষেত্রেই মনের সঙ্কল্প বিকল্পরূপ কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। মন আর চিত্তকে এক বলা হয় কেন? তার কারণ হ'ল, আমরা সাধারণত বলি মন যা চায় আবার সেই একই অর্থে চিত্ত যা চায় একথাও ব্যবহার করি, তাই উভয়কে এক বলা হয়। মনের বিষয় হ'ল সঙ্কল্প বিকল্প, আর যে ক্ষেত্রে এই বিষয়টি সম্পাদিত হয় সেটি হ'ল চিত্ত। ক্ষেত্র যদি পবিত্র না হয় তবে সে ক্ষেত্রে যে কর্ম্মই কর না কেন সেখানেইতো অপবিত্রতার ছোঁয়া লাগবে, তাই প্রথমে চিত্তকে অর্থাৎ ক্ষেত্রকে পবিত্র ক'রে নিতে হয়। সেটি কি ক'রে সম্ভব?

যে চিত্তক্ষেত্রে সঙ্কল্প বিকল্পরূপ বিষয় নিয়ে মন ক্রিয়া করছে, সেই

মনকে সংশোধন করার ক্ষমতা যে কারুরই নেই, কেননা আমরা কর্ম্ম করি মনের দাস হ'য়ে। কর্ম্মচারী বা আজ্ঞাধীন ভৃত্যের পক্ষে মনিবকে সংশোধন করতে যাওয়া যে বাতুলতা। কাজেই নিজে দাস না হয়ে মনকে যদি আমরা দাস করতে পারি তবেই তাকে সংশোধন করা চলে।

চিত্ত ক্ষেত্রটিকে পবিত্র করার আগে জানতে হবে চিত্তের স্বরূপ কি, তার স্বভাব ও ক্রিয়াইবা কিরকম। চিৎশক্তিতে লক্ষীভূত হ'য়ে জীবন যাপন করাই চিত্তের আদি লক্ষ্য, অপরদিকে মনের লক্ষ্য থাকে কি ক'রে সে বড় হ'তে পারে। বুদ্ধির লক্ষ্য হ'ল ভালমন্দ সর্ব্ববিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ক'রে সত্যোদঘাটন করা। মন, বুদ্ধি ও চিত্ত এই তিনে মিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তারই অভিমান হ'ল অহঙ্কার, কেননা অহঙ্কারের নিজের তো কোন ক্ষমতা নেই; এই তিন জনের গুণেই অহঙ্কার গুণান্বিত হ'য়ে উঠে। আবার এই অহঙ্কারই হ'ল সৃষ্টির মূল।

চিত্তের আদি লক্ষ্য যখন চিৎশক্তি বা পরম সত্য তখন তার কর্ম্মও হয় সেই রূপ। চিৎশক্তি বা পরম সত্যে লক্ষীভূত হ'তে পারলে মানব মানবী সত্য কথা বলে, সাত্ত্বিকী আহার করে, সদ্‌ভাবাপন্ন হ'য়ে সবার সঙ্গে মেলামেশা করে এবং সত্য হ'তে কখনও বিচ্যুত হয় না। কিন্তু চিত্ত যখন মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের অধীন থাকে তখনই দর্পণে মালিন্যের পুরু আবরণ পড়ে যায়। সেই অপবিত্র চিত্তে পরম চৈতন্য পরমেশ্বর কখন উদয় হন না, কেননা চিত্ত যে তখন মলিনতাপূর্ণ মনের সঙ্কল্প বিকল্পরূপ কর্ম্মের ক্ষেত্র, অহঙ্কারের অভিমানে অশুদ্ধ, বুদ্ধির বাক্‌চাতুর্য্যে গর্ব্বোন্মত্ত। সেই কারণেই নিত্য প্রজ্জ্বলিত, সচ্চিদানন্দ সদাজাগ্রত পরম সত্যকে আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই না।

কাজেই আমাদের সর্ব্বপ্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য হ'ল চিত্ত সংশোধন। এই চিত্ত সংশোধন বলতে মানব মানবীর জীবন পথ

সংশোধনকেই বোঝায়। শ্রীমাধব বলেন, আমাদের চিত্তটি তো এমন বস্তু নয় যে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দিলে বা দুধ দিয়ে ধুয়ে দিলেই পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। সেই কারণেই বলি, জীবন পথকে সংশোধিত ক'রে পরিচালনা করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করা যায়।

প্রশ্নকর্ত্তার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল,—শাস্ত্রকারেরা বলেছেন,—'আহারো শুদ্ধৌ: চিত্তশুদ্ধিঃ' অর্থাৎ শুদ্ধাহার চিত্তশুদ্ধির সহায়ক। এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, আমার বিচারে এখানে যে আহারের কথা বলা হ'য়েছে সেটি হ'ল চিত্তের ক্ষুধা। চিত্তের ক্ষুধা কিরকম? চিত্তের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় যদি সে সত্যের রস আস্বাদন করতে পারে। এই আহারে কেবল যে চিত্তশুদ্ধি হয় তাই নয়, এতে মনও শুদ্ধ হয়। চিত্তের শুদ্ধাহার হ'ল, সদ্‌ভাবাপন্ন হওয়া, সৎপথে চলা ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকারের নারকীয় কর্ম্ম ক'রে ক'রে আমরা চিত্তকে এত মলিন, এত আবর্জ্জনাপূর্ণ ক'রে তুলেছি যে, জাগতিক সাত্ত্বিকী আহার অর্থাৎ ফলমূল, দুধ ইত্যাদি খেয়েও সে মালিন্য কোনপ্রকারেই দূর হ'তে পারে না। কিন্তু সত্যের রস আস্বাদন করতে পারলে চিত্ত আবার স্বচ্ছ কাঁচের মত নির্ম্মল হ'য়ে উঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই শাস্ত্রে শুদ্ধাহারের কথা বলা হ'য়েছে। তাই বলি, আহারের উপর চিত্তশুদ্ধি তেমন কিছু নির্ভর করেনা। দেহের প্রয়োজনে উপযুক্ত আহার গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তবে সু-আহার ছাড়া কু-আহার গ্রহণ করা উচিত নয়। সু-আহার সুস্থ দেহ রক্ষা এবং সৎভাবে জীবনপথ পরিচালনার সহায়তা করে বটে, তবে তাতে চিত্তের মালিন্য দূর হ'তে পারে না।

জনৈক ভক্ত বলেন, শাস্ত্রে এবং গীতায়ও সাত্ত্বিক আহারের কথা বলা হ'য়েছে। এ কথার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন শাস্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের অমৃতবাণী গীতায় যা বলা হ'য়েছে তার কোনটিই মিথ্যা নয় কিন্তু আমরা যদি আমাদের সুবিধামত এই আহারকে দৈহিক আহারের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ব্যাখ্যা করি তবে কি চলে? আহারের সঙ্গে যোগ

হ'ল মূল দেহের কিন্তু তাই ব'লে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার বা সূক্ষ্ম-দেহের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে তার যোগ কোথায়? আমাদের চিত্তটি হ'ল একটি ক্ষেত্র বিশেষ অর্থাৎ একটি খাটের মত। কারুর খাট থাকে ভাঙ্গা আবার কারুর বা থাকে ফুলের মত সুন্দর খাট।

দুগ্ধ একটি পুষ্টিকর খাদ্য কাজেই দুগ্ধ পানে দেহের পুষ্টি সাধন হয়। এই দুগ্ধকে লক্ষ্য ক'রেই সাত্ত্বিকী আহারের কথা বলা হ'য়েছে, আবার ফলমূলাদি, ঘাসের রুটি ইত্যাদিও সাত্ত্বিকী আহারের মধ্যে পড়ে। আর তামসিক আহারে দেহের টাল সামলান কঠিন হ'য়ে পড়ে, তাতে সাধনভজনে বিঘ্ন ঘটে। তাই দেহকে সুষ্ঠু, সুন্দর, শান্ত ও নিরোগী রাখবার জন্য সাত্ত্বিকী আহারের বিধান আছে, কেননা তাতে শান্তিপূর্ণভাবে সাধনভজন করতে পারা যায়। তাই বলি, আহারের সম্পর্ক হ'ল দেহের সঙ্গে কিন্তু ভগবৎপ্রাপ্তির সঙ্গে আহারের কোন গূঢ় সম্পর্ক আছে ব'লে আমি অন্তত মনে করি না।

শ্রীমাধব বলেন, যার দেহবোধ চলে গেছে সে কু-আহার করবে কেন আর করবেই বা কি ক'রে? তবে তান্ত্রিক সাধক বা বনে জঙ্গলে যে সকল মুনিঋষিগণ সাধনা করতেন তাঁরা কি খেতেন না? যাঁরা অসাধারণ অর্থাৎ যাঁরা সাধক বা সাধু মহাপুরুষ তাঁদের খাদ্যাখাদ্য বিচারের অধিকার সাধারণ মানুষের নেই। তাঁদের উপদেশ নির্দ্দেশ অনুযায়ী সাধারণ লোকের চলাই বাঞ্ছনীয়। আমার মতে আহারের সঙ্গে সম্পর্ক হ'ল স্থূল দেহের, সূক্ষ্মদেহের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

সূক্ষ্মদেহের রসও কিন্তু কারণদেহ গ্রহণ করে না, তবে সূক্ষ্মদেহের কর্ম্মের অস্তিত্ব ক্রমে ক্রমে কারণদেহে গিয়ে পৌঁছায়।

জাগতিক জগতে জীবনপথে চলতে গেলে শুদ্ধাচারী হওয়া উচিত, তাহ'লে স্বাস্থ্যও সুখের হবে, জীবনপথও মধুর হবে। স্বাস্থ্য সুস্থ না থাকলে সাধন ভজনও মধুর হ'তে পারে না।

মায়ের পূজোয় পাঠাবলির কথা সভায় উঠেছিল; সে কথার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, এটি শাস্ত্রের নির্দ্দেশ হ'তে পারে না। সে যুগে পশুবধের মত অনাচারী ব্যাপার যারা পূজোর উপচাররূপে গ্রহণ ক'রেছিল তারা ছিল বর্ব্বর, নিজেদের খাদ্যের সঙ্গে এটিকে যুক্ত ক'রে হয়তো তারা আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রেছিল।

তখনকার পণ্ডিতদের মতানুসারে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে সহমরণে পাঠিয়ে সতী আখ্যা দেওয়া হ'ত কিন্তু বর্ত্তমান যুগে কেউ কি সেকথা চিন্তা করতে পারে? মৃত স্বামীর চিতায় জ্যান্ত স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার মত বীভৎস দৃশ্য আজ আর কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

শ্রীমাধব বলেন, শাস্ত্রকার বা পণ্ডিত যারাই এ সকল কথা বলুক না কেন এটি হ'ল তাদের ঔদ্ধত্যের প্রকাশ। শাশ্বত সত্যের বাণী এ হ'তে পারে না।

আহারের সঙ্গে এই সব আধ্যাত্মিকতার কোন সম্পর্ক নেই। জগত জননী একথা কখনই ভাবতে পারেন না যে, সন্তানের রক্ত দিয়ে তাঁর পূজো হবে, এত বড় পাষাণী কি তিনি হ'তে পারেন?

ভগবান ব'লে গেছেন, 'অনন্য ভক্তি দ্বারা যে আমাকে ভজনা করবে, আমার নামজপ ক'রে তার চিত্তশুদ্ধি হবে এবং তার চিত্তদর্পণে আমার দর্শন হবেই হবে।' তাই বলি, আহারের চিন্তা না ক'রে চিত্তের মালিন্য দূর করার চেষ্টা কর। চিত্তকে সত্যের রসরূপ শুদ্ধাহার দিলে চিত্ত শুদ্ধি হ'য়ে চিত্ত বলিষ্ঠ হয়, সেই বলিষ্ঠ চিত্তদর্পণে তাঁকে দর্শন করতে পারবে।

শ্রীমাধব বলেন, মানবমানবীকে ভুল পথে ঠেলে দেওয়া আমার অভিপ্রায় নয়। প্রত্যক্ষ সত্যই আমাকে প্রকাশ ক'রে যেতে হবে। তাই বলছি জড়দেহকে বলিষ্ঠ করার জন্য সাত্ত্বিকী আহার প্রয়োজন, তবে এর সঙ্গে সূক্ষ্মদেহ বা কারণ দেহের কোন সম্পর্ক নেই। চিত্তের শুদ্ধাহারের কথা সবাই বলে এসেছে এবং বলবেও। যেমন ধর,

আমাকেও তো একদিন চলে যেতে হবে কিন্তু মঙ্গলালোক থাকবে চিরকালের জন্য অর্থাৎ সত্যবাণীর কখনও নাশ নেই।

আমি বার বার বলেছি আহারের সম্পর্ক হ'ল জড়দেহের সঙ্গে, তবে এই আহারকে ধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত করার কারণ হ'ল—সাত্ত্বিকী আহারে জড়দেহ সুস্থ হবে এবং সৎ ভাবনা জাগবার সহায়তা হবে, তাই বলে সাত্ত্বিকী আহার করলে যে চিত্তের ময়লা ধুয়ে যাবে তা নয়। সে কারণেই আমি বলি, সৎ পথগামী হও, সৎ ভাবাপন্ন হও, গুরুমুখী হও, তবেই চিত্তশুদ্ধি হবে।

আমাদের চিত্তটি হ'ল ক্ষেত্র বা পাত্রমাত্র। যেমন ধর, গুড় আর গুড়ের ঝাঁকা, কিন্তু গুড়ের ঝাঁকাটি তো গুড় নয়।

কৃচ্ছ্রসাধন

গত মঙ্গলবার শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করেন,—ভগবান লাভের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন বা কষ্টকর উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন আছে কি?

আলোচনাকালে শ্রীমাধব বলেন, পৃথিবীতে যাঁরা বড় হন—যাঁরা সাধারণ থেকে অসাধারণ ব'লে পরিগণিত হন তাঁরা যখন যা বলেন, সে সকল কথা সাধারণের কাছে বেদবাক্যতুল্য অমোঘ বা সত্য বাক্য ব'লে মনে হয় এবং সে সকল মানুষ তাদের কাছে মহাজন হয়ে উঠেন। তাই তারা বলে, 'মহাজ্ঞানী-মহাজন যে পথে করে গমন হ'য়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়', সেই পথই সবার অনুসরণ করা উচিৎ।

প্রশ্নকর্ত্তা মীরাবাঈ এর ভজনের কথা উল্লেখ করেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমাধব বলেন, মীরার ভজনের প্রকৃত অর্থ কি? তাঁর

ভজনে তিনি একথাই বলতে চেয়েছেন যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা দেখি বহুবার স্নান ক'রে লোকে নিজেকে শুদ্ধ ও পবিত্র করতে চায়, কেননা তাদের আশা এই বাহ্যিক পবিত্রতাই হরি সন্নিধানে পৌঁছে দেবে কিন্তু তা যদি সম্ভব হ'ত তবে সব চাইতে আগে মাছেরই হরিপ্রাপ্তি হ'ত, কারণ সে যে জলেরই জীব ; আবার বলছেন ফলমূল ইত্যাদি সাত্ত্বিকী আহারে যদি হরিকে পাওয়া যেত তবে বাদুর, বানর এদের পক্ষেই হরিকে পাওয়া সহজ হ'ত, কেননা তাদের খাদ্যই যে ফলমূল। তাই মীরাবাঈ বলছেন, সেই সচ্চিদানন্দ পরমসত্তা নন্দদুলালকে পেতে হ'লে তোমাকে প্রেমে পাগল হ'তে হবে।

শ্রীমাধব বলেন, ধর, সাধারণ জগতে আমরা যে ভালবাসি, সেই ভালবাসারও যথাযোগ্য পাত্র চাই এবং উভয়ের সমতা থাকা চাই। মীরাবাঈ এর ভজন গানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন এখানে কৃচ্ছ্রসাধনের কথা আসে। ক্ষেত্রজ্ঞের ক্ষেত্র তৈরী হওয়ার জন্য যে সাধনা করতে হয় তাকেই বলে কৃচ্ছ্রসাধনা। কৃচ্ছ্রসাধনা অর্থে কঠিন ভাবে দেহকে কষ্ট দিয়ে একটি পথে নিয়ে আসা হয় ; এটিকেই আমরা বুঝি কৃচ্ছ্রসাধন করা, আসলে তা নয়। শ্রীমাধব বলেন, তুমি সেই ক্ষেত্রজ্ঞের যথার্থ ক্ষেত্র, সেটি প্রমাণ করবার জন্য প্রথমেই তোমার চিত্তক্ষেত্রকে প্রস্তুত ক'রে নিতে হবে। তাই মীরাবাঈ বলতে চেয়েছেন, তুমি যা-ই করনা কেন, ভালবাসার যোগ্যতা অর্জ্জন করে তাঁর ভালবাসার পাত্র হও, তবেই তিনি গ্রহণ করবেন। শ্রীমাধব বলেন, এই যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্যই কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজনীয়তা আছে। কৃচ্ছ্রসাধন হ'ল মনের পবিত্রতা আনয়নের জন্য—ভগবান লাভের জন্য নয়। বাহ্যিক কৃচ্ছ্রসাধনা করেই অন্তরের পবিত্রতা আসে, কেননা অন্তরে বাহিরে যে অচ্ছেদ্য যোগাযোগ রয়ে গেছে—একেরই তো দুটি ভাগ। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় এই যে আমরা বার বার স্নান করি তার অর্থ হ'ল, বহির্পবিত্রতার সাহায্যে

মনের পবিত্রতা আনয়ন করা। এর অন্তর্মুখী ভাব হ'ল, বার বার স্নান করে. ধুয়ে মুছে যেমন তুমি দেহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে তোল, তেমনি অনাদিকালের বহির্মুখতার ফলে তোমার অন্তর যে নানারূপ কর্ম্মের বীজে পরিপূর্ণ হ'য়ে আছে তাকেও তো ধৌত করতে হবে, নির্ম্মল করতে হবে। মানবমানবীর এই বহির্মুখতাই হ'ল অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতার আওতায় থেকে মানবমানবী যে সকল কর্ম্ম করে তাতে সর্ব্বদাই অন্তরবৈমুখী ফল সৃষ্টি হয়। সেকথা যখন মানবমানবী বুঝতে পারে তখন হয়তো অনুশোচনায় তার চোখে জল ঝরে. তাই বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা মানুষের চোখের জল পড়তে দেখি, তেমনি আবার তার অন্তর দৃষ্টিতেও জল ঝরে কিন্তু সেটি তো আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে, তাই আমরা তা দেখতে পাই না, বুঝতে পারি না। কিন্তু অন্তর দৃষ্টির জলে অন্তরের সমস্ত ময়লা বিধৌত হ'য়ে যায় এবং অন্তর পবিত্র ও নির্ম্মল হ'য়ে উঠে।

শ্রীমাধব বলেন, পূর্ব্বেও আমি বহুবার বলেছি যে আহারাদি হ'ল দেহপুষ্টির জন্য, ঈশ্বর পরিতুষ্টির জন্য নয়। ঈশ্বর-লাভের বা পাওয়ার বস্তু নন; তবে দেহ সুস্থ থাকলে সাধনভজনে কোন বিঘ্ন ঘটেনা, তাই সুস্থ দেহ তাঁকে জানার পক্ষে সহায়তা করে। কৃচ্ছ্রসাধনও সেইরকম, কেননা আমরা যে সমস্ত কর্ম্ম করেছি সেই সকল কর্ম্মের ফলে আমাদের চিত্তক্ষেত্র ময়লার কঠিন আবরণে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। সেই ময়লা বিধৌত করার কারণে বিভিন্ন সাধক বিভিন্ন পন্থা নির্দ্দেশ ক'রে গেছেন। মীরার ভজনও সেইরূপ একটি পন্থারই নির্দ্দেশ দেয়। তিনি বলেছেন, তাঁকে ভালবাস, তাঁর সঙ্গে প্রেম কর, তবেই তাঁকে জানতে পারবে। আবার কোন কোন মহাপুরুষ বলেছেন, তাঁর নাম কর. তবেই হবে, আর কিছু প্রয়োজন নেই।

শ্রীমাধব বলেন, সংসারে থেকে সর্ব্বদাই ক্রমের পথে জীবন

যাপন কর, মনুষ্যত্বকে জাগ্রত কর, তবেই ঈশ্বরকে জানতে পারবে। তাঁর মতে মানবমানবী, যদি মনুষ্যত্বকে জাগ্রত না ক'রে নাম করে, তবে নাম করার যে ফল সেটুকু সে নিশ্চয়ই পাবে, কিন্তু তাঁকে জানতে পারবে না। অনাদিকালের বহির্ম্মুখতায় এবং কর্ম্মফলে অন্তর যে পুরু ময়লায় আচ্ছাদিত হয়ে আছে তাকে পরিষ্কার করা তো সহজ কথা নয়। শ্রীমাধব বলেন, যে সকল সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধবাহু হ'য়ে থাকেন বা নীচে ধুনি জ্বালিয়ে বৃক্ষডালে শীর্ষাসনে ব'সে থাকেন তাঁদের এ সব কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনই আমাদের নজরে আসে; আর যাঁরা এসব করেন না তাঁদের কৃচ্ছ্রসাধন আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। যেমন এক লক্ষবার নাম করাটাও তো কৃচ্ছ্রসাধন। ভগবানকে জানার কারণে যে পথেই তুমি অগ্রসর হও না কেন, সেখানেই তো কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয় অর্থাৎ সে প্রেম—ভক্তি—ভালবাসার পথই হ'ক বা জ্ঞান, যোগ, তন্ত্রের পথই হ'ক সর্ব্বত্রই কৃচ্ছ্রসাধনার প্রয়োজন আছে।

সভায় প্রশ্ন উঠেছিল এ বিষয় আপনার মতামত কি? প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, আমার মত আর আমার পথ হ'ল আমার বর্ত্তমান জীবন। সবাইকে নিয়েই আমার সংসার। সংসারের ভালমন্দ, সুখদুঃখ সবই তো সমভাবে ভোগ ক'রে চলেছি। তোমাদের মত আহার বিহারও করছি, কাপড় চোপড়ও পরছি। আমার এই দেহদ্বারা, সেবাদ্বারা যতটুকু সম্ভব সবাইকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করি। মনে হয়, আমার যিনি ঈশ্বর তিনিই আমার জন্য ঘরে বাইরে, চতুর্দ্দিকে ছোটাছুটি করছেন। তিনিই যখন আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন তখন আমার আর তাঁকে খুঁজবার প্রয়োজন কি? এ সংসারে মনুষ্যত্বকে জাগ্রত ক'রে ক্রমের পথে চললে, তবেই তাঁকে জানা যায়। আগেই বলেছি, যাঁর দ্বারা যাঁকে খুঁজছ—তিনিই তো সে-ই অর্থাৎ ঈশ্বরজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে খুঁজছ; সেই জ্ঞানই তো

ঈশ্বর। এই বোধ যেদিন তোমার হবে, সেদিনই সব কিছুর সমাধান হবে।

সভায় ত্রিপুটি সাধনার কথা উঠেছিল। শ্রীমাধব বলেন, সাধক-সাধ্য-স্বাধ্যায়, এই তিন যখন এক হ'য়ে যায় তখনই বলা হয় ত্রিপুটি সাধন। সাধক অর্থে যিনি সাধনা করেন, সাধ্য অর্থাৎ যাঁকে সাধনা করা হয় এবং স্বাধ্যায় হ'ল সাধনার ক্রিয়া। সব জায়গায়ই কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে ভিন্ন ভিন্ন পথে ভিন্ন ভিন্ন মতে এর প্রকারও বিভিন্ন হয়। আমরা বাহ্যিক যে সমস্ত কৃচ্ছ্র সাধনের কথা শুনি, যেমন তান্ত্রিক মতে হঠযোগ ইত্যাদি যৌগিক ক্রিয়াতে এই কৃচ্ছ্র সাধনের রূপ বড় কঠোর। বর্ত্তমান যুগে এ সবের আর প্রয়োজন নেই।

শম, দম ইত্যাদি হ'ল সাধনার ফল, কেননা চিত্তের স্থিরতা, বাসনার নিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়-সংযম বা জিতেন্দ্রিয়তা ইত্যাদি শম, দম অভ্যাসের দ্বারা সফল হয়। যেমন বেদের উপনিষদ্ হ'ল সত্য, সত্যের উপনিষদ্ জ্ঞান, জ্ঞানের উপনিষদ্ শম ইত্যাদি। এ সকল কথা বলার উদ্দেশ্য হ'ল যে তোমার সাধন ভজনের উপনিষদ্ হ'ল তোমার সংশোধন, সংশোধনের উপনিষদ্ আনন্দ-আনন্দের উপনিষদ পরমানন্দ-পরমানন্দের উপনিষদ্ সমাধান।

এখানে উপনিষদ্ অর্থে—তোমার সব চাইতে যিনি নিকট তাঁকে জানার জন্য যে সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়, তাই হ'ল উপনিষদ্। যেমন তিনি সত্য, তাঁর সত্তা হ'ল তোমার মনুষ্যত্ব। আবার বলি, কোন ঋষির উপনিষদ্ জানতে হ'লে জানিতে হবে, তিনি কি প্রক্রিয়া দ্বারা ঈশ্বরকে জানতে পেরেছিলেন, সেই পন্থাটি লিপিবদ্ধ হ'লে তাকেই সেই ঋষির উপনিষদ্ বলা হয়।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীমাধব বলেন, গতকাল একটি প্রশ্ন উঠেছিল, জগতে মানুষের দেবার আছে কি, আর নেবারই বা কি আছে?

চিন্তা করলে দেখা যায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানবমানবীর নেবার মত একটি জিনিষই আছে ; সেটি হ'ল—জেনে নেওয়া। এই জেনে নেওয়াটিই হ'ল জ্ঞান। আবার জগতকে মানবমানবীর দেবার যদি কিছু থাকে সে-ও এই জ্ঞান। এই জ্ঞান আহরণ করতে করতেই একদিন তার আসবে ঈশ্বরজ্ঞান বা সত্যজ্ঞান বা পরমজ্ঞান। এই যে জানা অর্থাৎ যে জ্ঞানের সাহায্যে তাঁকে জানা যায় তা-ও তিনি আবার যাঁকে 'জানতে চাই, তা-ও তিনি। তাই ঈশ্বর বলছেন, 'জ্ঞানও আমি এবং জ্ঞানের বিষয়ও আমি। তাইতো আমি তোমাদের অজানা, আবার চিরজানা।'

শ্রীমাধব বলেন, জ্ঞান আহরণের সময় কোন বিচারের প্রয়োজন নেই কিন্তু জ্ঞানদানের সময় বিচার ক'রে দিতে হয়, কেননা যোগ্যপাত্রে দিতে হবে তো !

যেমন একটি শিশুর ক্ষেত্রে গুরুপাক খাদ্য দেওয়া চলে না, কেননা গুরুপাক খাদ্য হজম করা শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়, তাই তাকে দিতে হবে দুধ, জল বা ফলের রস। আবার সকল প্রকার ফলের রসও তাকে দেওয়া চলে না। সহজপাচ্য করার জন্য ফলের রসের সাথে জল মিশিয়ে দিতে হয়। তাই বলি, জ্ঞান দান করতে হ'লেও স্থান-কাল-পাত্রানুসারে যোগ্য বিষয়ে যোগ্য কথা জানাতে হবে।

তাহ'লে নেব কি—এ প্রশ্নের উত্তরে এ কথাই বলতে হয় যে, আমাদের জেনে নিতে হবে অর্থাৎ জ্ঞান আহরণ করতে হবে এবং দেবার সময় যা জেনে নিলে, তাই দিতে হয় কিন্তু দিতে গেলে বিচারের প্রয়োজন আছে, কেননা যদিও প্রত্যেকের গুহ্যতত্ত্ব আমরা প্রত্যেকেই জানি, তবুও সব কথা কি সকলের কাছে প্রকাশ করা উচিত ? উচিত নয়। দেওয়ার সময় বিচারটি রয়েছে ব'লেই জগতে এখনও শৃঙ্খলা বিদ্যমান আছে। কাজেই আমাদের সকলেরই উচিত দেওয়ার সময় বিচার ক'রে দেওয়া। তাই বলি, জানবার যা, তা

জেনে নাও কিন্তু বণ্টনের সময় বিচার ক'রে বণ্টন করতে হবে। কারুর গুহ্য বিষয় হয়তো তুমি জেনে নিলে কিন্তু তা ক্রিয়মান করলে যদি বিপদের আশঙ্কা থাকে তবে ক্রিয়মান না করাই শ্রেয়। তোমার শ্রুতি যা নেবার তা নেবেই। শ্রুতির কাজ হ'ল স্মৃতিপটে বা হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়া; এরকম অনেক ঘটনা ঘটে যা শ্রুতি গ্রহণ করে কিন্তু স্মৃতি তাকে ধ'রে রাখে না। দেবার সময় ক্রম ব্যতিক্রমের ফলেই যত অশান্তি। বণ্টন-কারীর বিচার না থাকলে জগত উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ হ'য়ে যেত, বিচার আছে বলেই আমরা কিছুটা শান্তির শান্ত প্রলেপ অনুভব করি।

শ্রীমাধব বলেন, আলোচনা দ্বারা প্রাচীন মুনিঋষিদের মতামতকে আমি হেয় প্রতিপন্ন করতে চাই না; কিন্তু তাঁদের মতামতের যে ভ্রান্ত বা বিকৃত ব্যাখ্যা অনেক সময় করা হয় সেটি সংশোধন করাই আমার কাজ। যেমন ধর, যাঁর নাম স্মরণে সমস্ত অপবিত্রতা মুক্ত হয় সেই নারায়ণশিলাকে সংস্কারবশে গোময় বা গোচনা দিয়ে পবিত্র করা হয়। যাঁর নামে বা স্পর্শে পবিত্রতা আসে তাঁকে গোময় বা গোচনা দ্বারা শুদ্ধ করার কি কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে? তাই বলি, এ সমস্ত সংস্কার যত শীঘ্র বর্জ্জন করা যায়, ততই মঙ্গল।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমিত্বের অহঙ্কার থাকে ততক্ষণ তাঁকে জানা বা বোঝা সম্ভব নয়। লোকে ভাবে, 'আমি তাঁকে দিই।' তাঁকে দেবার সাধ্য কার আছে? তিনি নিজে ইচ্ছে ক'রে যা নেবার তাই নেন, আমার দেবার সাধ্য নেই, এই বোধ যার হয়, তার সাধনাই সার্থক সাধনা, কেননা এতে অহঙ্কারের কোন গন্ধ নেই।

মায়ামোহ জ্বরে ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তির 'নামেই' অরুচির ঔষধ

গত মঙ্গলবারে শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্ত প্রশ্ন তোলেন, আমরা মায়ামোহজ্বরে আক্রান্ত, আশাভঙ্গের দরুণ বক্ষ-বেদনাও আছে, এই প্রকার আধিব্যাধিতে ভুগছি, তাই নামে অরুচি হ'য়েছে। এই ব্যাধির ঔষধ কি ?

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, অভিধানিক অর্থে আধিব্যাধি বলতে দৈহিক ও মানসিক পীড়া বোঝায় কিন্তু আমি একে বলি ক্ষুধা। এই ক্ষুধা বলতে সর্ব্বপ্রকার ক্ষুধাকেই বোঝায়, সে দৈহিক, মানসিক বা আত্মিক যে কোনপ্রকার ক্ষুধাই হতে পারে। ক্ষুধা যেখানে আছে ব্যাধিও সেখানে থাকে। ক্ষুধা থেকেই ব্যাধির সৃষ্টি, তাই একে বলে আধিব্যাধি।

বর্ত্তমান যুগটিই এমন যে মানুষ শাস্ত্রীয় কথা শোনা মাত্রই বিচার সুরু করে। বিচারে যুক্তিযুক্ত মনে হ'লে গ্রহণ করে, নইলে পরিত্যাগ করে। পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় বাণী, ধর্ম্মালোচনা, সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের উপদেশ নির্দ্দেশ লোকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করত কিন্তু এ যুগে শিক্ষাদীক্ষায় তারা এত উন্নত হ'য়েছে যে, বিচার না ক'রে শোনামাত্র গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

প্রশ্নকর্ত্তার জিজ্ঞাস্য হ'ল—আমরা মায়ামোহজ্বরে আক্রান্ত এবং আশাভঙ্গের দরুন বক্ষবেদনা অনুভব করি, তাই তাঁর নামেও অরুচি এসে যায়—এই ব্যাধির ঔষধ কি ?

শ্রীমাধব বলেন, নামে অরুচি এটি কি মর্ম্মে বলা হ'ল ? নাম আমরা করি দুটি কারণে—একটি হ'ল ভয়ে বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ; অপরটি হ'ল মুক্তি কামনায়। এখন প্রশ্ন হ'ল, অরুচিটা কিসে আসে ? কোন্ পর্য্যায়ের লোক নাম করতে চায় না ?

বৈষ্ণবের বিনয়ভাব সাধন ভজন পথে যেমন লোককে উন্নত করে তেমনি আবার ক্ষতিও করে। আমরা বলি, সারাদিন কাজকর্মে ব্যস্ত থেকে হে প্রভু, তোমার নাম করবার সময় কোথায় পাই। এ কথার অর্থ কি? কে না নাম করে? সারাদিন জপেতপে, কাজেকর্মে নাম তো ক'রেই যাচ্ছি কিন্তু প্রার্থনা করার সময় বলি, 'হে প্রভু! আমার যে নামে রুচি নেই।' আমার মনে হয় এটি হ'ল বৈষ্ণবভাবের বিনয়।

এছাড়া এমন লোক ক'জন আছে যারা নাম করে না! সত্যিই যারা নাম করে না তারা তো তস্কর। এদের কথা সাধকের মুখে উচ্চারণ করাও উচিত নয়। তস্করেরাও নাম করে বটে, তবে নাম করার প্রকৃত উদ্দেশ্যে তারা নাম করে না, কার্য্যসিদ্ধির কারণে তারা তাঁকে ডাকে।

শ্রীমাধব প্রশ্নকর্ত্তাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলেন—সবাইকে বোঝাবার জন্য তোমাকে উপলক্ষ্য ক'রে বলি, এই যে বল নামে রুচি নেই একথা কি বিশ্বাস্য? আজ আমি যদি বলি, আমার নামে রুচি নেই, তবে সেকথা কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে?

তস্করের যতদিন দস্যুবৃত্তিতে রুচি থাকে ততদিন তার নামে রুচি আসে না কিন্তু সাধক পর্য্যায়ে উন্নত হ'লে সেও প্রাণ মন ঢেলেই নাম করে। রত্নাকর দস্যুর কথা কে না জানে? আজ যে তস্কর, কাল তো তার সাধক হ'তে কোন বাধা নেই!

আমাদের মূল প্রশ্ন হ'ল—কিসে নামে রুচি হয়? আহারে যখন আমাদের রুচি থাকে না তখন তার কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখতে পাই জ্বরে মুখের রুচি নষ্ট ক'রে দিয়েছে, তাই আহারে অরুচি।

সেইরকম মায়ামোহজ্বরে আক্রান্ত হ'য়েই তাঁর নামে আমাদের রুচি নেই। কোন্ উপায়ে এই রুচি ফিরিয়ে আনা যায়! এই অরুচি বা চিত্তবিকারের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কি ক'রে? মূল

অরুচি এসেছে জ্বর থেকে তাই জ্বরের থেকে অব্যাহতি পেলে আপনিই মুখে রুচি ফিরে আসবে। এখন প্রশ্ন হ'ল এই জ্বরের প্রকোপ থেকে কি ক'রে রক্ষা পাওয়া যায়? জ্বরের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবার বিভিন্ন পন্থা শোনা যায়। কেউ বলে, গুরু নামরূপ মহৌষধে এই জ্বর ছেড়ে যায়, কেউ বলে গুরু বাণী অনুকরণশীল হ'লে জ্বর পালিয়ে পথ পায় না, আবার কারুর কারুর মতে কঠোর তপস্যা দ্বারা এ জ্বরের বিহিত করা যায়, কেউবা বলে শুধু সেবা দ্বারাই এই জ্বর সারে।

শ্রীমাধব বলেন, এ সব কথাই সত্য। প্রশ্ন উঠে এর মধ্যে কোন্‌টি বেছে নেব? গুরু নাম করব, না গুরুবাণী অনুশীলন করব, না কি কঠোর তপস্যা করব বা সেবাব্রত গ্রহণ করব? শ্রীমাধব বলেন, যার যেটি ভাল লাগে সে সেটিই গ্রহণ করুক না কেন, তবে যে পন্থাই অবলম্বন করুক তাকে গুরুত্ব দিয়ে জীবনপথ সেইভাবে পরিচালিত করতে হবে, তবেই সর্ব্বপ্রকার জ্বর অর্থাৎ কালাজ্বর, পালাজ্বর, মায়াজ্বর ইত্যাদি সব জ্বরই সেরে যাবে। গুরুত্ব না দিলে স্বয়ং গুরু এসে মহৌষধি পান করালেও সেই জ্বর কখনও সারে না। এই গুরুত্ব বলতে কি বোঝায়?

এ কথার অর্থ হ'ল নাম বা নামীর মহত্ত্ব বা মূল্য যেন কোন-ক্রমেই হ্রাস করা না হয়। যেমন নাম মহৌষধ; তাই ব্যথা পেলে সেই নামরূপী মলম মালিশ করতে সুরু করলে। দশ পয়সার ওষুধে যে ব্যথা সারে সেখানে ঐ নাম-মলম লাগিয়ে কি নামকেই ছোট করা হ'ল না? নামরূপী মলম কি কান ব্যথা, পেট ব্যথা বা চোখ ব্যথার জন্য? নামের এই অপব্যবহার ক'রে নামের গুরুত্বকে হ্রাস করা হ'ল নাকি?

যে নামের শক্তিতে অনাদিকালের বহির্মুখতা, অন্ধতা ও মহাপাপীর পাপভার মুক্ত হয়, যে নামের শক্তিতে নির্ভাবনায় মহামিলনের পথে এগিয়ে যাওয়া যায়, সেই নামকে পাঁচ পয়সার

পাচনের মত ব্যবহার করলে কি নামের মহত্ত্ব, নামের মূল্য বা গুরুত্বকে হ্রাস করা হ'ল না? নামের গুরুত্ব ভুলে গিয়ে আজ যেন তেন কাজে যেন তেন ভাবে তোমরা যে তার অপপ্রয়োগ করছ। প্রকৃতপক্ষে গুরুত্ববোধ না থাকলে অনন্তকাল সাধনা করলেও ব্যাধি-মুক্ত হওয়া যায় না। হয় তো প্রশ্ন উঠতে পারে, গুরুত্ব থাক্ আর না থাক্, ট্যাবলেটের মত, নামের ট্যাবলেট খেলে যদি ব্যাধি সেরে যায়, তবে সেটি করলে ক্ষতি কি?

শ্রীমাধব বলেন, যে নামের ভবব্যাধি দূর হয়, তা দিয়ে এ সকল ব্যাধি নিরাময়ের অপচেষ্টা ক'রোনা। আমি মনে করি, নামের গুরুত্ব না দিলে আমাদের লক্ষ্যপথে পৌঁছান বড় দুষ্কর। আরও বলি, চিন্তা ক'রে দেখ কোথায় নামের গুরুত্ব হ্রাস পায়? আমাদের জীবনপথে করণ কর্ম্ম বা প্রয়োজনীয় কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। প্রয়োজনীয় কর্ম্ম যে করতেই হয়। যেমন, বাঁচার জন্য অন্নজলের সংস্থান তো না ক'রে উপায় নেই। প্রয়োজনীয় কর্ম্ম ছাড়া আর যত কর্ম্ম সবই পড়ে বিলাসের মধ্যে অর্থাৎ প্রয়োজন বহির্ভূত সকল কর্ম্মই বিলাসকর্ম্ম। এই বিলাস থেকেই আমাদের মধ্যে তীব্রভাবে প্রকাশ পায় অভিলাষ।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'কর্ম্ম কর—ফলের আশা ক'রোনা'।

সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করলে দেখা যায়—কর্ম্ম করলে ফলের আশা না ক'রে পারা যায় কি? কর্ম্মের চিন্তামাত্রই মনে ফলের আশা জাগে। এই বিশ্বে এমন একটি মহাপুরুষ বা প্রাণী বা যিনি বলেছেন তিনি স্বয়ংও কি ফলের আশা না ক'রে কর্ম্ম করতে পেরেছেন? তা'হ'লে শ্রীকৃষ্ণের অমৃতবাণী গীতার কথা কি ভুল? না, তা নয়। তিনি যথার্থ কথাই ব'লেছেন। বর্ত্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনপথে চলতে গেলে কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে কর্ম্ম কর—এমন কথা কি শ্রীকৃষ্ণ ব'লে যেতে পারেন? তাঁর বাণী

সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের, সর্ব্বসাধারণের জন্য ; গুটি কয়েক বৈষ্ণব বা সাধকের মুখ চেয়ে একথা তিনি কখনই বলতে পারেন না। তাঁর বাণী উচ্চারিত হ'য়েছে সারা বিশ্ববাসীর জন্য, কেননা তিনি তো শুধু বৃন্দাবনের কৃষ্ণ নন বা কারুর একার নন, জগৎজোড়া সকল জীবই যে কর্ষণ—আকর্ষণ—বিকর্ষণকারী এই সত্যরূপী কৃষ্ণকে মেনে চলে তাই তাঁর বাণীও হ'ল বিশ্বজনীন।

গীতায় তিনি বলেছেন, 'তোমরা যদি মন থেকে বিলাস ত্যাগ করতে পার তবে অভিলাষ আপনা থেকেই উবে যাবে'।

অভিলাষ না থাকলে তো ফলের প্রশ্নই ওঠেনা। তিনি বলেছেন, 'কর্ম্মের ফলে তোমরা চাও বিলাস অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাহা তাই ; কিন্তু আমাকে তো কখন ভুলেও চাওনা। তোমরা নিজে সুখ ভোগ করতে চাও, পরিবারবর্গকে সুখে রাখ্‌তে চাও, এবং এইরূপে শান্তি পেতে ও শান্তি দিতে চাও কিন্তু এ সবই যে বিলাসের অন্তর্ভুক্ত'।

শ্রীমাধব বলেন, ভেবে দেখ কত বড় কথা, কত মূল্যবান কথা তিনি ব'লে গেছেন। যেমন ধর মদ্যপান আমাদের দেশে বিলাস কিন্তু শীতের দেশের পক্ষে অনেক সময় হয় তো সেটি প্রয়োজন। আবার দেখ, ঈশ্বর তোমার ভোগের জন্য, স্ত্রী, সন্তানসন্ততি, পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি দিয়ে তোমায় একটি সুন্দর সংসার সাজিয়ে দিয়েছেন, কেননা এটি মানবমানবীর ক্ষেত্রে প্রয়োজন ; কিন্তু এ ছাড়াও যদি অতিরিক্ত একটি পুত্র পালনের ইচ্ছা তোমার জাগে, স্ত্রী পাশে থাকা সত্ত্বেও অন্য নারীতে আকর্ষণ আসে, খেতে পাচ্ছ না অথচ ডানলোপিলো বিছানায় শোবার বিলাস জাগে তবে সেটিতো ঠিক নয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত যাহা তাহাই বিলাসের পর্য্যায়ে পড়ে, সেই বিলাসকে পরিত্যাগ করতে হবে। বিলাসকে পরিত্যাগ করতে পারলেই অভিলাষ লুপ্ত হ'য়ে যায়।

সভায় প্রশ্ন উঠেছিল, অভিলাষ যদি নির্মূল না হ'য়ে সুপ্ত থাকে তবে যে কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌বে না কি ?

এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, এই অভিলাষ আবার যখন জেগে উঠ্‌বে তখন তার হবে নব-কলেবর তখন সে আর বিষয় অভিলাষি নয়—ঈশ্বর অভিলাষি। সেটি কি রকম ? সেটি হ'ল বিষয় অভিলাষশূন্য নিষ্পাপ, নির্ম্মল চিত্ত। মানুষের মধ্যে সত্যের অভিলাষপূর্ণ নূতন পল্লব দেখা দেবে অর্থাৎ 'আমি যে সত্যের সত্তা, এ বিস্মরণ যেন কখন না আসে—এই অভিলাষ। তিনি ও আমি যে অভিন্নসত্তা, যে কর্ম্ম করছি সে সবই তো তাঁর কর্ম্ম।' এই অভিলাষ নিয়ে যে সকল কর্ম্ম আমরা করি, তার কোন পরিণাম বা ফল নেই, কাজে কাজেই সেখানে ভোগের কোন প্রশ্নও ওঠে না। এই অভিলাষ অনন্তভাবে বিচ্ছুরিত হয় এবং সর্ব্বদাই সত্য প্রেমে ডুবে থেকে তাঁর নামে আমাদের নিয়োজিত করে, তাই শত সহস্রবার তাঁর নাম ক'রেও যেন আশ মেটে না।

কর্ম্ম ক'রে তাতে কোন ফল পাব বা একটা কিছু হবে এ অভিলাষ যতক্ষণ আছে ততক্ষণই কর্ম্মফলের ভোগ, ততক্ষণই আকাঙ্খার নিবৃত্তি নেই এবং সে কারণেই তাঁর নামে অরুচি। বিলাসক্ষেত্রে যে অভিলাষ সেই বিলাস ত্যাগ করলেই অভিলাষ নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে। তাই বলি, বিলাস পরিত্যাগ করতে পারলেই মায়ামোহজ্বর বা যে কোন জ্বর সবই সেরে যাবে, কেননা বিলাস থেকেই তো সব জ্বর। আবার দেখতে হবে বিলাস পরিত্যাগ করার বিলাসও যেন কখন আমায় পেয়ে না বসে অর্থাৎ সাধু হ'য়ে যাব এই ভেবে বিলাস ত্যাগ করাও কিন্তু একটি বিলাস।

আমরা আহারের বিলাস, ভোগের বিলাস, দর্শনের বিলাস, চলন বলনের বিলাস ইত্যাদি সবরকম বিলাসে জড়িয়ে আছি বলেই অভিলাষ এত শক্ত ভিত গেড়ে বসে আছে। যেমন, কেউ জলকেলি

কর্‌ছে তা দেখে জলে নেমে পড়ার ইচ্ছা হয় অর্থাৎ বিলাস দেখে অভিলাষ জাগে। বিলাস দেখে যদি তাতে গা ভাসিয়ে দাও, তবে অভিলাষ তোমায় ছেড়ে দেবে কেন? আর জ্বরই বা সারবে কি ক'রে? তাই মনে হয়, কায়িক, বাচনিক, মানসিক ইত্যাদি অবস্থাকে শোধন করতে হ'লে বিলাস ত্যাগ করাই একমাত্র এবং অদ্বিতীয় পথ। আমরা যত সাধন ভজনই করি না কেন, বিলাস ত্যাগ না করলে সেই সাধন ভজনের আনন্দও হয় ক্ষণস্থায়ী। হয়তো সে সাধন ভজনে শিহরণ ও পুলক জাগে কিন্তু সেটি সেই বৃন্দাবনে গোষ্ঠ বিহারীর ঝাঁকি দর্শনের মতই ক্ষণস্থায়ী—এই এল, এই গেল।

এখন প্রশ্ন উঠে এই বিলাস পরিত্যাগের পথ কি? যে বিলাসে অভিলাষ জাগ্রত হ'তে পারে সেই বিলাসকে ক্ষান্ত রেখে তোমার নিজের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখতে হবে কোথাও সেই বিলাসের বিন্দুমাত্রও অস্তিত্ব আছে কিনা। নিজের সংসার ও পরিবেশে যা আছে, তাই নিয়েই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অপরের বিলাসে অনুপ্রাণিত হ'য়ে অভিলাষকে প্রশয় দেওয়া একেবারেই অনুচিত।

এই প্রসঙ্গে সভায় আত্মসমর্পনের কথা উঠেছিল অর্থাৎ আত্ম-সমর্পণ করতে পারলেই তো সব গোল মিটে যায়।

শ্রীমাধব বলেন, আত্মসমর্পণ সহজ কর্ম্ম নয়। তিনি বলেন যে নিজেকে জানে, একমাত্র তার পক্ষেই আত্মসমর্পণ করা সম্ভব। যে নিজেকেই জানে না, সে কি আত্মসমর্পণ করবে এবং কার কাছেই বা আত্মসমর্পণ করবে? যে 'আমার, আমার রূপ কাঁচা আমি থেকে মুক্ত হ'তে পেরেছে, সে-ই তার আরাধ্যের পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করতে সাহসী হয়। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে একথা প্রযোজ্য নয় যে, আমি তোমার হ'য়ে গেলাম। যে পবিত্র হ'তে পেরেছে, কাঁচা 'আমি'

থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে পাকা 'আমি'র পর্যায়ে উন্নীত হ'তে পেরেছে। তার পক্ষেই এই পবিত্র কথাটি অকাট্য।'

'আমার কথা হ'ল, মুখে মুখে আত্মসমর্পণ হয় না। আত্মসমর্পণ করে সে-ই নিজেকে জানে যে-ই। তবে এই আত্মসমর্পণ কথাটি যে আমরা সদাসর্ব্বদা শুনে থাকি সেটির তাৎপর্য্য কি? সেটি হ'ল, সুরুতে আমাদের মধ্যে যে নির্ভরতার অঙ্কুর গজায়, সেটিকেই আমরা আত্মসমর্পণ আখ্যা দিয়ে থাকি। এই নির্ভরতার পরিপক্বতা এলেই আত্মসমর্পণের অঙ্কুর জাগে। আর আত্মসমর্পণের পরিপক্বতা যখন আসে তখনই আরাধ্যের উন্মেষ, আবেশ অন্তরে জাগ্রত হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁর উন্মেষ, আবেশ বা অনুরাগ অন্তরে পরিস্ফুট হয় না।

আত্মসমর্পণের পথে সার্ব্বপ্রথম স্তর হ'ল নির্ভরতা, আর সাধন পথের সুরু হয় স্মরণ, মনন ইত্যাদি দিয়ে। সাধন ভজন ও আত্মসমর্পণের এই ধারা হ'ল সর্ব্বজনীন, বিশ্বজনীন। বিশ্ববাসী সবার জন্য এই একই পথ, এর মধ্যে সম্প্রদায়গত কোন বিভেদ নেই।

আলোচনা সভায় জনৈক ভক্ত, 'হরিবল্, হরিবল্' ব'লে স্বগতোক্তি করেন। একথা শুনতে পেয়ে শ্রীমাধব ব'লে উঠেন, দিনরাত মনকেই তো হরিনাম শিক্ষা দিচ্ছ, নিজে তো তাঁর নাম একবারও উচ্চারণ কর না। এই 'হরিবল্' বলতে বলতে নিজে যে দিন 'হরি-হরি' বলবে সেদিনই তোমার বলা সার্থক হবে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমাধবের একটি কাহিনী মনে পড়ে। কাহিনীটি হ'ল—

সামান্য এক গৃহস্থ ছেলেপুলে নিয়ে সংসার করে। বয়স হয়েছে, বাড়ীতে গুরুদেব এসেছেন। গৃহস্থের ছেলেকে গুরুদেব বল্লেন, 'সারাদিনতো কেবল চাষবাস নিয়েই থাকিস্, তাঁর নামতো একবারও করিস না, একবার অন্তত প্রাণখুলে হরিবল্।'

ছেলে ভাবে, 'গুরুবাবার এই বাণীইতো আমার দীক্ষা।' এর পর

সে বনে গিয়ে 'হরিবল্ হরিবল্' বলে নাম করতে থাকে। তার এই 'হরিবল্' বলা শুনে বনের পশুপাখীরাও মুগ্ধ। নারদ একদিন নারায়ণকে বলেন, 'এমন ভক্ত যে নামে মাতোয়ারা হ'য়ে গেছে, প্রভু। এর মুক্তির কি কোন পথ নেই?' নারায়ণ বলেন, 'কি করি, সে মনকে হরিনাম শিক্ষা দিচ্ছে, না বনের পশুপাখীদের শিক্ষা দিচ্ছে।

কিসের জন্য সে হরিবল্ বলছে, একবার তা খোঁজ নিয়ে দেখ তো?'

নারদ ছদ্মবেশে এসে বলেন, 'সত্যই তোমার কাছে এসে নাম করা শিখলাম। এই যে 'হরিবল্' বলছ এর উদ্দেশ্য কি? কাকে তুমি হরিনাম শেখাচ্ছ, বনের পশুপাখীকে, না নিজের মনকে? তুমি তো উপদেশরূপী শিক্ষাগুরুর কাজ করছ; জগতকে কেবল উপদেশ দিয়েই যাচ্ছ।'

গৃহস্থের ছেলে তখন বলে, 'সত্য সত্যই গুরুদেবের কত কৃপা। তাই আপনার মাধ্যমে আমার এত বড় ভুল ধরিয়ে দিলেন। সারাজীবন 'হরিবল্' ব'লে আমি কাকে শিক্ষা দিচ্ছি? আপনার কথায় আমার চেতনায় চৈতন্য জাগ্রত হ'য়েছে। যে নিজে 'হরি' বলতে শেখেনি, সে পরকে কি শিক্ষা দিতে পারে'?

তখন থেকে সে নামের মধ্যে ডুবে যায় এবং এই অনুভূতি তার আসে যে, হরিই পরম সত্য আর এই অনন্তবিশ্বের যা কিছু অস্তিত্ব তা সেই সত্যেরই অভিন্নসত্তা, আমি নিজেও যে তাঁরই অভিন্নসত্তা।

একেই বলে হরিদর্শন। এই কাহিনীর মাধ্যমে শ্রীমাধব এ উপদেশই সাধারণ মানবমানবীকে দিয়েছেন যে, অন্যকে হরিনাম শিক্ষা দেবার আগে তুমি নিজে হরিনামে ডুবে যাও, আগে এ অনুভূতি তোমার আসুক যে তুমি তাঁরই অভিন্নসত্তা, তবেই তোমার নাম করা সার্থক, তবেই তোমার হরিদর্শন হবে।

এই হরিদর্শন প্রসঙ্গে গত সোমবারেও শ্রীমাধবের আলোচনা

সভায় একটি প্রশ্ন উঠেছিল। তাই সে প্রশ্নের উত্তরটি এখানে জুড়ে দিলে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রশ্নটি হ'ল,—পাঁচ বছরের শিশু ধ্রুব যে তপস্যা ক'রেছিল, যার তপস্যার বলে সূর্য্য—বায়ু—পৃথিবী সব কিছুরই গতি থেমে গিয়েছিল; সে এমন কি মন্ত্র পেয়েছিল, যার জন্য এসব সম্ভব হ'য়েছিল? সেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য কি এবং সমস্ত ঘটনাটিরই বা তাৎপর্য্য কি?

শ্রীমাধব বলেন, ধ্রুবের সাধনা দ্বারা জগতকে এটাই বোঝান হ'চ্ছে যে রেচক দ্বারা যদি কেউ পূরক করে এবং পরিপূর্ণ পূরকের অবস্থায় যদি কেউ কুম্ভকে পৌঁছাতে পারে, তবে কুম্ভকের পরিপূর্ণ অবস্থায় সমস্ত কিছু স্থির হ'য়ে যায়। কুম্ভক পরিপূর্ণ হ'লে বায়ু স্তব্ধ হয় এবং সব কিছু নিশ্চল হয়ে গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে। তখন কূটস্থচৈতন্যের শরণাপন্ন না হ'য়ে আর কোন উপায় থাকে না।

ধ্রুব হ'ল পরম সত্যের অভিন্নসত্তা। সেই ধ্রুব যদি এ ভাবে সাধনা করে, তবে দেহের রিপুদেরতো অন্তিম অবস্থা। দেহের মধ্যে ইন্দ্রিয়রূপ যে সকল দেবতা বিরাজ করে তাদেরও দমবন্ধ হবার যোগাড় হয়; তাই চৈতন্যের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কি গতি আছে?

নারদ হ'ল চেতনা, তাঁকে কেউ বদ করতে পারে না, তাই চেতনা ধ্রুবকে বলে, 'তোমার মা যে মন্ত্র দিয়েছিল সেই পদ্মপলাশলোচনের নাম জপ করতে আমিও তোমায় নির্দ্দেশ দিয়েছিলাম। চেয়ে দেখ, তিনিই তোমার সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়েছেন।' ধ্রুব একবার চোখ মেলে দেখে আবার চোখ বোজে। নারদ এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় ধ্রুব বলে, 'কি করি? পদ্মপলাশলোচন দেখতে বললেন তাই দেখলাম। দেখে আমার কি হ'ল? আপনি গুরু, বুঝিয়ে দিন এই পদ্মপলাশলোচন কি বা কে?'

নারদ উত্তর দেন, 'পদ্মের পাঁপড়ির মত যাঁর লোচন এবং যে লোচনের রং হ'ল পলাশের মত তিনিই সে-ই, তিনিই পদ্মপলাশ-লোচন।'

পাঁচ বছরের শিশু ধ্রুব বলে, 'এই আকার বা রং দেখার জন্যই কি আমার এই কঠোর তপস্যা? আমায় কি একথাই বুঝতে হবে?'

নারদ বলেন, 'দেখ তুমি পাঁচ বছরের শিশু, তোমার কাছে সাধনার এক একটি স্তর এক একটি বর্ষের সমতুল্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার বছর জীবজ্ঞান। এর অতীত হ'লে আসে পরমজ্ঞান। পরমজ্ঞান লাভ হ'লেও তুমি শিশু, কেননা পাঁচ বছর পর্য্যন্ত মানব শিশুর পর্য্যায়েই থাকে। এর অতীত হ'লে দর্শনের ইচ্ছাও আর থাকে না। চার বছর অতীত হ'লে পরম জ্ঞানের মোক্ষে পৌঁছান যায়। এই চারটিই মুখ্য। চার বর্গের অতীত হ'লে পঞ্চম পুরুষার্থে পৌঁছে পরমকেই দর্শন করতে চায়। তুমি পরম দর্শনেরও অতীত হ'য়ে গেছ, তাই আর তাঁকেও দর্শন করতে চাও না।

পদ্মপলাশলোচনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শ্রীমাধব বলেন, অনন্ত বিশ্ব একটি পদ্মস্বরূপ এবং সেখানে অনন্ত বিশ্ববাসী এক একটি পলাশরূপে বিরাজ করছে। পলাশ হ'ল সত্যের সত্তা আর লোচন হ'ল সত্যের দৃষ্টি। অনন্তবিশ্বের বহিরান্তর কিছুই যে তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নয়। এভাবে যে জগতকে দর্শন করতে পারে তারই পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরিকে দর্শন করা হয়।

এখানে পলাশ কথাটি কেন বলা হ'ল? তার অর্থ এই যে, লোচন যেমন পলাশের রং এ রঞ্জিত তেমনি সারা বিশ্ববাসী এই বিশ্বকে রঞ্জিত ক'রে রেখেছ এবং সর্ব্বত্রই তাঁর দৃষ্টি রয়েছে।

বিশ্ব, বিশ্ববাসী ও তিনি, এই তিনে মিলে পদ্মপলাশলোচন বিশ্বের মানব মানবী পলাশরূপে তাঁর বিশ্বকে রঞ্জিত ক'রে রেখেছে ব'লে এক

একজন তাঁকে এক এক রং এ দর্শন করে। বিশ্ববাসী রয়েছে ব'লেই তাঁর দৃষ্টি অর্থাৎ জ্যোতি রয়েছে; বিশ্ববাসী না থাকলে তাঁর দৃষ্টিও নেই, জ্যোতিও নেই।

ভগবৎ পথে চলার গ্রহণযোগ্য উপদেশ নির্দ্দেশ এবং সৎ ও অসৎ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা

গত মঙ্গলবার আলোচনার প্রারম্ভে দূরাগত কয়েকটি আগন্তুককে লক্ষ্য ক'রে শ্রীমাধব বলেন, মনে যখন প্রেরণা জাগে তখন দূর দূরান্তরের পথও অতি নিকট ব'লে মনে হয় আর প্রেরণা না জাগলে নিকটতম পথকেও যোজনব্যাপী কষ্টসাধ্য দীর্ঘপথ ব'লে মনে হয়।

আগন্তুকগণ শ্রীমাধবকে মহাপুরুষ ব'লে শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রদর্শন করলে তিনি বলেন, আপনারা বারবার আমাকে মহাপুরুষ ব'লে মান দিচ্ছেন। আপনাদের এই উক্তি মিথ্যা নয়; কেননা এই পুরুষের মুখ থেকে যাঁর কথা আজ আপনারা শুনবেন, তিনি তো মহাপুরুষ বটেনই। একমাত্র পরমপুরুষই মহাপুরুষ; তাই ব'লে যে পাত্রটি সেই অমৃতবাণী বহণ করে, সে তো মহাপুরুষ নয়। ভুল ক'রে অনেক সময় আমরা গুড়বহনকারী ঝাঁকাকেই গুড় বলি, অবশ্য গুড়ের ঝাঁকার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, কেননা গুড়ের ঝাঁকা তো ভাল ক'রেই জানে যে, সে গুড় নয়। আমায় মহাপুরুষ ব'লে আপনারাও হয়তো গুড়ের ঝাঁকাকে গুড় বলার মতই ভুল ক'রে ফেললেন।

সেদিনের আলোচনা সভায় দুটি প্রশ্ন উঠে,—(১) একটি হ'ল ভগবৎপথে চলার যে উপদেশ, নির্দ্দেশ তা গ্রহণ ক'রে কি উপায়ে

জীবনপথে চলা সম্ভব? (২) দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—'যদ্ সংচাহং অর্জ্জুনঃ'—আমিই সৎ—আমিই অসৎ, আধ্যাত্মিক অর্থে সৎ বলতে নিত্য আর অসৎ বলতে অনিত্য বোঝায়। আবার জাগতিক অর্থে সৎ হ'ল ভাল এবং অসৎ হ'ল মন্দ। ভগবান যদি সৎ এবং অসৎ উভয়ই হন; তবে আধ্যাত্মিক পথে আমাদের নিত্য অনিত্যের বিবেক থাকবে কি? জাগতিক দিকেই বা তবে আমরা কি ক'রে ভাল আচরণ করব এবং মন্দের মোকাবিলা করব?

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, প্রকৃতপক্ষে প্রথম প্রশ্নটি হ'ল ভগবৎপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সর্ব্বদাই তো আমরা বহু উপদেশ নির্দ্দেশ শুনে থাকি কিন্তু কোন কিছুই যে ধারণ করতে পারিনা। এখানে ধারণ করা অর্থ গ্রহণ করা। তাহ'লে একথাই দাঁড়াল যে, সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের মুখে যখন ভগবৎবাণী শ্রবণ করি বা তাঁদের সঙ্গ করবার অবকাশ না পেলে যখন পুঁথি পুস্তকে ভগবৎ কথা পড়ি, তখনও তা গ্রহণ করতে পারি না। এক কানে শুনি, অপর কান দিয়ে তা বেরিয়ে যায়। তাই চিন্তা করতে হয়, এই ধারণ শক্তি তবে কার? ধারণ করার শক্তি হ'ল প্রকৃতির, পুরুষের নয়। এই প্রকৃতি বলতে আমরা জগতে যে নারীপুরুষ দেখি তা কিন্তু নয়। প্রকৃতি আমরা সবাই। ব্রহ্মের পরম অস্তিত্ব যে পরমসত্তা, তাঁরই অভিন্নসত্তা সকল জগতবাসী এবং সেই অর্থে জগতবাসী সবাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মানুষের মনুষ্যত্বই হ'ল প্রকৃত প্রকৃতি। মনুষ্যত্বরূপ প্রকৃতির অভাব যেখানে, সেখানে ধারণ করবার শক্তি আসবে কি ক'রে? যার সেই প্রকৃতি জাগ্রত, সে অম্লান বদনে সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের বাণী গ্রহণ করতে পারে এবং তাঁদের বাণী অনুকরণশীল হ'য়ে সত্তা ও সত্যের অভিন্নসত্তার মাঝে যে প্রাচীর গড়ে উঠেছে সেই প্রাচীর ভেঙে ফেলে অনায়াসে সেই দুর্গমপথ অতিক্রম ক'রে যেতে পারে।

অমানুষের প্রভাব যদি সর্ব্বদা আমাদের ঘিরে থাকে তবে সাধু—গুরু—বৈষ্ণবের বাণী আমরা ধারণ করব কি ক'রে? অমানুষের প্রকৃতি যে আমার মনুষ্যত্বরূপ প্রকৃতিকে আচ্ছাদিত ক'রে রেখেছে। তাই আমাদের বিচার ক'রে দেখতে হবে যে যদি আমি মানুষ হই তবে মনুষ্যত্বের প্রকৃতি আমার মধ্যে কতটুকু জাগ্রত আছে? মহাপুরুষদের বাণী ধারণ করা, উপলব্ধি করা বা পালন করার যে শক্তি, সেই শক্তিকেই বলা হয় মনুষ্যত্বরূপ প্রকৃতি। এর দ্বারাই তাঁদের বাণী ধারণ করা যায় বা অনুভবে আনা যায়। অমানুষের কাছে তাঁদের উপদেশ নির্দ্দেশের কোন মূল্যই নেই, তাই সাময়িক তাঁদের উপদেশ নির্দ্দেশ ভাল লাগলেও চোখের আড়াল হ'লে তার কোন প্রভাবই আর থাকে না; অর্থাৎ এক কানে শুনি আর অন্য কান দিয়ে তা বেরিয়ে যায়। কিন্তু মনুষ্যত্ব যার জাগ্রত, সে যখন ঐ বাণী বীজস্বরূপ গ্রহণ করে, তখন তার প্রভাবে অন্তর শান্তি, ভক্তি, আনন্দ, প্রীতি ও প্রেমে পূর্ণ হ'য়ে উঠে। ঐ বাণীকে বীজস্বরূপ বলা হয় কেন? তার কারণ হ'ল, আরাধ্যের বাণী বা গুরুবাণী বা মহাপুরুষের বাণীই যে বীজস্বরূপ। আমি যে মানুষ, তাই আমার মনুষ্যত্বই তাঁর প্রকৃত প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির মধ্যে পরমপুরুষ জাগ্রত হ'য়ে প্রেম—প্রীতি ও আনন্দের সৃষ্টি করেন।

শ্রীমাধব বলেন, এখন শোন, এই মনুষ্যত্বের আচরণ কিরূপ? ক্রমের পথে চলাই মনুষ্যত্বের আচরণ আর ব্যতিক্রমে চলাই হ'ল অমানুষের আচরণ। আমার এই কথা দেশ—কাল—পাত্রানুযায়ী নয়, এ বাণী হ'ল সর্ব্বজনীন, বিশ্বজনীন। প্রশ্ন উঠে, ক্রম বলতে আমরা কি বুঝব?

শ্রীমাধব বলেন, ক্রম বলতে এ কথাই বোঝায় যে, আমি যাঁদের করুণায় জগতের আলো দর্শন ক'রে সুস্থ হ'য়েছি অর্থাৎ আমার পিতামাতা এবং যারা আমার আশ্রিত; নিজ উপার্জ্জন দ্বারা তাদের

যথাযথ সেবা ও লালন পালন করা আমার অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য। আমার উপার্জ্জিত অর্থে ভিখিরি থেকে শুরু ক'রে সাধু, গুরু, বৈষ্ণব, আত্মীয়স্বজন সবারই যে অংশ আছে; সে অর্থ তো কেবল আমার একার জন্য নয়। কিন্তু আমাদের মনোভাব হ'ল আমি উপায় ক'রে সকলকে অন্নদান করি। এ মনোভাব সমীচীন নয়। উপার্জ্জনের অর্থ ন্যায্যভাবে বণ্টন ক'রে যদি নিজে পরিচালিত হই এবং সবাইকে পরিচালিত করতে পারি, তবে তাকেই বলা হবে ক্রম; আর অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আত্মচরিতার্থে ভোগ করাকেই বলে ব্যতিক্রম। যারা এই ভাবে ক্রমের পথে চলতে পারে তারাই মনুষ্যত্বের আচরণ করছে আর যারা ব্যতিক্রমে চলে তারা তো বাস্তবিকই অমানুষ। মনুষ্যত্বের আচরণে যারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পরমাত্মা পরমেশ্বর তাদের অন্তরে সদাজাগ্রত থাকেন। এমন যে জন, তার কি উপদেশ নির্দ্দেশের কোন প্রয়োজন আছে? ব্যতিক্রমের কোন ছোঁয়াই যে তার লাগেনা। পরমসত্য নিজ মহিমায় তার সত্তায় জাগ্রত থাকেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা সবাই তাঁরই অভিন্নসত্তা কিন্তু তা কি আমরা অনুভব করতে পারি? পারি না; যেহেতু অমানুষের আচরণে আমাদের আপন সত্তা যে পুরু কালিমায় ঢাকা পড়ে গেছে। উপমাস্বরূপ শ্রীমাধব বলেন, যেমন ধর পাশাপাশি দুটি লণ্ঠনই জ্বলছে কিন্তু যে লণ্ঠনের কাঁচে কালি পড়ে আছে তার আলো কখনও ফুটে বেরুতে পারে না, আবার কোন কোন লণ্ঠন এত পরিষ্কার যে চতুর্দ্দিকে তার আলো ঠিকরে পড়ে—এও সেই রকম।

এই মনুষ্যত্বের কথা যা বললাম তা সারা বিশ্ববাসীর জন্যই সত্য। আমি যে পরমসত্যের কথা বলছি তা সর্ব্বদেশেই গ্রহণীয়। শুধু রাম, শ্যাম ও যদুর জন্য আমার আলোচনা গণ্ডীবদ্ধ নয়। আমার আলোচনা বিশ্বের সবার জন্য, কেননা যথার্থ সত্য উদ্ঘাটন করাই আমার লক্ষ্য। এটা কিন্তু আমার অহঙ্কার নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল সৎ কি আর অসৎ কি? উভয়ই যদি তিনি হন তবে আধ্যাত্মিক পথে আমাদের বিবেক কিভাবে পরিচালিত হবে?

শ্রীমাধব বলেন, একটু আগেই বলেছি সত্যের অভিন্ন সত্তা যে মনুষ্যত্ব, সেই মনুষ্যত্বই হ'ল সৎ এবং অমানুষই হ'ল অসৎ। এটি হ'ল সর্ব্বজনীন ও বিশ্বজনীন কথা। সৎও তিনি অসৎও তিনি, একথা গীতায় বলা হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই সৎ—অসৎ প্রকৃতপক্ষে তিনি নন। ঈশ্বর কখনও সৎ—অসৎ হন না। তিনি তা হ'তে যাবেন কেন? তিনি যে পরমসত্য। তাঁর আবার সৎ—অসৎ কি? সৎ—অসৎ এর প্রশ্ন উঠে মানবমানবীর ক্ষেত্রে। যে সকল মানবমানবীর মধ্যে মনুষ্যত্ব সদাজাগ্রত তারাই সৎ, আর সে বালাই যাদের নেই, যারা অমানুষ, তারাই অসৎ।

আমাদের যে গোড়ায় গলদ—ঈশ্বরকে সৎ—অসৎ বলছি। একথা আমরা বলতে পারব সেদিন, যেদিন আমার মনুষ্যত্বের সত্তা তাঁর সাথে মিশে এক হ'য়ে যাবে, সেদিনই তো বুঝতে পারব যে, তিনিই সব। এপারে থেকে সেই ঊর্ধ্বস্তরের কথা কি বলা যায়? ওপারে পৌঁছে সত্যের অভিন্নসত্তা বোধ হ'লে একথা বলা চলে। যখন সেই সত্যে পৌঁছাবে, অদ্বৈতজ্ঞানে, পরম অদ্বৈতবোধে যখন সত্যে মিশে যাবে, তখন বুঝতে পারবে, তিনিই সৎ, তিনিই অসৎ, তিনিই সব। যেমন বলা হয়, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'। সত্যে পৌঁছালে দেখবে—ব্রহ্মও সত্য, জগৎও সত্য, কেননা জগৎ যে ব্রহ্মেরই প্রকাশ বিকাশ। সত্যে না পৌঁছিয়ে এপারে থেকে কি একথা বলা সাজে?

ঈশ্বর কি ক'রে অসৎ হবেন? অসৎ এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত তো আমাদের সকল কর্ম্মেই দেখা যায় কিন্তু ঈশ্বর ক্ষেত্রে কি সেরকম

অসৎ কিছু খুঁজে পাও? পাও না। বর্ত্তমান যুগই হ'ল যুক্তিবাদী যুগ। এখন ছেলেপুলের সামনে যা খুসী তাই বলা চলে না, সব কিছুই তাদের যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হয়।

শ্রীমাধব বলেন, অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন বটে, 'আমি সৎ আবার আমিই অসৎ,' কিন্তু একথা শুনে অর্জ্জুনতো খুসী হ'য়ে গাণ্ডীব ধরতে পা'রেননি? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর স্বরূপে অর্জ্জুনকে বলেছেন, 'বিশ্বের যা কিছু দেখছ সবই আমি। যত সৎ দেখছ, যত অসৎ দেখছ সবই আমি।' আমরা ভুল ক'রে ভাবি উনিই সদা সৎ কিন্তু তাতো নয়। উনি যে এক, বহু হ'য়েছেন, সেই বহুর মধ্যেই যত গণ্ডগোল। বহুর মধ্যে ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ সবই তিনি। তিনি ব'লেছেন—'যাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব জাগ্রত তাদের মধ্যেও আমি আর যারা অমানুষরূপ পঙ্কে ডুবে আছে, তাদের মধ্যেও আমি।' তাই ব'লে তিনি সদাসৎ নন, কেননা তিনি যে তার বহু উর্দ্ধে। তাই বলছেন, 'আমি পরম সত্য—আমি এক।' সত্য হ'ল একক আর বহুর ক্ষেত্রে সদাসতের প্রশ্ন। বহুর মধ্যে গুণ, ভাব সবই যে আছে। ভাল-মন্দ বহুত্বের প্রকাশ ঘটে বহুর মধ্যে। তা ব'লে একথা বলা চলে না যে পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণ সৎ ও অসৎ উভয়ই। অনন্ত বিশ্ববাসীর মধ্যে সৎ ও অসতের প্রকাশ। তিনি পরমাত্মা আর বিশ্ববাসী হ'ল জীবাত্মা। জীবাত্মা ক্ষেত্রেই সদাসতের প্রশ্ন কিন্তু পরমাত্মা ক্ষেত্রেতো এ প্রশ্ন উঠতে পারে না।

সভায় প্রশ্ন উঠেছিল ঈশ্বর এক এবং তিনি সত্য একথা মেনে নেওয়া যায় কিন্তু একের মধ্যে যদি সদাসৎ না থাকে তবে তিনি যখন বহু হন, তখন সেখানে সদাসৎ আসে কোথা থেকে?

একথার উত্তরে শ্রীমাধব উপমা দেন, গাভীর দুধ থেকে দই, দই থেকে ঘোল, মাখন ইত্যাদি সবইতো হয়। তা'হলে দেখা যায় সুধার মধ্যে সবই ছিল, কিন্তু থাকলেও তা ছিল অব্যক্ত, কারণ জীবজগতের

সে ক্ষমতা নেই যে সুধা থেকে তিক্তস্বাদ বের ক'রে দেয়। সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে সবই ছিল তবু তাঁকে সদাসৎ বলা চলে না। সদাসৎ কথাটি পরিণাম ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সচ্চিদানন্দ পরম সত্য যিনি, তাঁকে সদাসৎ বলা চলে না।

শ্রীমাধব বলেন, গীতার শ্লোকের যথার্থ অর্থ উদ্ধার করা বড় কঠিন। আমার মত মানুষেরাইতো যার যার জ্ঞান ও বিদ্যার গৌরবে নিজ নিজ ভাষায় গীতার ব্যাখ্যা ক'রেছেন, আর সেই ভাষার স্রোতে আমরাও ভেসে বেড়াচ্ছি। ভাষ্যকারেরা অনন্ত ভাবে, অনন্ত প্রকারে গীতার ব্যাখ্যা করতে পারেন কিন্তু তাই বলে গীতার শ্লোক তো মিথ্যা নয়।' শ্লোকের যথার্থ অর্থ উদ্ধার করতে হ'লে বার বার শ্লোক পড়তে হবে, তবেই একদিন না একদিন যথার্থ অর্থ তোমার অন্তরে প্রতিভাত হবে। চিন্তা ক'রে দেখ গীতায় এক জায়গায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছেন, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণংব্রজ।' এর অর্থ আমরা বুঝি, 'সব ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে আমার শরণাগত হও বা আমার পথে এসো।' কিন্তু ভাষ্যকারের ভাষায় কি প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায়?

মনুষ্যত্বের আচরণই সত্যের আচরণ আর অমানুষের আচরণ হ'ল অসতের আচরণ। মনুষ্যত্বের ক্রমরূপ অস্ত্র দিয়ে মনুষ্যত্ব-হীনতার এবং ব্যতিক্রমের মোকাবিলা আমাদের করতে হবে।

ঈশ্বর ক্ষেত্রে সদাসতের বা নিত্য-অনিত্যের প্রশ্ন উঠে না। যিনি নিত্য তিনিই পরম সত্য। সদাসৎ অর্থে পরম সত্যকে বোঝায় না। পরম সত্যের সত্তা ব'লে সৎকেও সত্য বলা হয়; যেমন সৎ লোক।

সবই যে ঈশ্বর এই বোধ যদি কারো আসে তবে আর দৃষ্টিতে সদাসৎ বলে আর কিছু থাকে না, কেননা সে যে সব কিছুই তখন ঈশ্বরময় দেখছে, তার কাছে সবার সমষ্টিই হ'ল ঈশ্বর। কিন্তু জাগতিক সকল মানব মানবীর কাছেতো সব কিছুই ঈশ্বর নয়, তাই এই দুটো এক ক'রে দেখলে ভুল করা হবে।

চিত্তের সংজ্ঞা এবং চিত্তমালিণ্য পরিষ্কারের প্রণালী

গত মঙ্গলবার শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করেন,—'চেতদর্পণঃ মার্জ্জনম্', প্রশ্ন হ'ল চিত্তের সংজ্ঞা কি? চিত্ত যদি ভগবান প্রদত্ত জিনিষ হ'য়ে থাকে তাহ'লে তাতে এত মলিনতা আসে কোথা থেকে? সেই মালিণ্য পরিষ্কারের প্রণালী কি?

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, আমাদের মূল প্রশ্ন হ'ল চিত্তের সংজ্ঞা কি, চিত্ত কেন মলিনতা প্রাপ্ত হয়, এবং চিত্তের সেই মালিণ্য দূর করার পন্থা কি?

তিনি বলেন, চিত্ত আর মনকে এই কারণে অভিন্ন বলা যায় যে, দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে যে পরিচালনা করে তাকে মন বলা হ'য়েছে এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে যে গ্রহণ করে তাকে বলা হয় চিত্ত। চক্ষু তার দৃষ্টি দ্বারা বাইরের যা কিছু দর্শন করে তা কিন্তু সে নিজে ভোগ করতে পারে না, তাকে প্রথমে গ্রহণ করে চিত্ত এবং তারপর ভোগ করে মন। তাই ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বিষয়কে চিত্ত গ্রহণ করলেও ভোগের বেলা মনই তাকে ভোগ করে। চিত্ত সব কিছু গ্রহণ করে, সে কারণেই বাইরের জগতের সকল ময়লাই চিত্তকে গ্রহণ করতে হয় এবং তাতেই চিত্ত মলিনতাপূর্ণ হ'য়ে উঠে। মন এত চঞ্চল, এত অস্থির যে কোন কিছুই তার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মন ও চিত্তকে অভিন্ন বলা চলে। মন ও চিত্তের মধ্যে চিত্তকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। চিত্তকে শ্রেষ্ঠত্বের স্থান দেওয়ার কারণ হ'ল, চিত্ত নির্ম্মল হ'লে সত্যের প্রতিবিম্ব চিত্তে পড়ে এবং তোমার নিজস্বরূপও চিত্তে ধরা পড়ে। এখানে তোমার রূপ বলতে আত্মজ্ঞান বা আত্মদর্শনকে বলা হ'চ্ছে। আত্মজ্ঞান বা আত্মদর্শন হ'তে হ'লে

চিত্তদর্পণকে ঘষে মেজে নির্ম্মল ও পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তাই মহাপ্রভু বলেছিলেন, 'চেতদর্পণঃ মার্জ্জনম্'।

শ্রীমাধব বলেন, দেখ! মহাপ্রভু কি সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেন, চিত্তকে যেমন নির্ম্মল ও পরিষ্কার করা যায় মনকে তেমন ক'রে পরিষ্কার করা যায় না; কেননা মন যে বড় চঞ্চল, পরিষ্কার করার জন্য যে রকম ধীর, স্থির হওয়া প্রয়োজন সে অবস্থা তো মনের কখনও হয় না; অপরদিকে চিত্ত হ'ল অত্যন্ত ধীর, স্থির এবং অচঞ্চল। যেহেতু চিত্ত ইন্দ্রিয়ের সকল বিষয় গ্রহণ করে সেই হেতু চিত্তভূমিতে মনের সহায়তায় কাম আপন খুসীতে নৃত্য করে, কেননা চিত্ত যে কামের অধীন এবং এই কাম রিপুরই প্রাধান্যে অন্যান্য পঞ্চরিপুও চিত্তভূমিতে অধিষ্ঠিত হ'তে সাহসী হয়। মনে কর, কোন স্থানে যদি কতকগুলো পশু এসে উপস্থিত হয় তবে তাদের কদাচার ও অপব্যবহারে যেমন সে স্থানের পবিত্রতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না তেমনি চিত্তভূমিতে ষড়রিপুরূপী পশুরা অধিষ্ঠিত হ'লে সেই চিত্তভূমিও কলুষিত হয়। চিত্ত—দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও আস্বাদনের সাহায্যে জগতের সব কিছুকেই আশ্রয় দেয় ব'লে তাকে চিত্তভূমি বলা হয় কিন্তু মনকে কখনও মনভূমি বলা হয় না। ষড়রিপুগণ সর্ব্বদাই মনকে দাসরূপে নিয়োগ ক'রে ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করে।

শ্রীমাধব বলেন, তোমাদের দর্শন দুই প্রকার। চিত্তভূমিতে একটি হ'চ্ছে সৎ-স্বরূপের দর্শন যথা গুরুদর্শন, ঈশ্বর দর্শন ইত্যাদি, অপরটি হ'ল অসৎ স্বরূপের দর্শন। তাই বলা হয়, চিত্তে যে সকল আবর্জ্জনা স্থান পেয়েছে তাদের পরিষ্কার ক'রে তুমি নিজে চিত্ত-ভূমিতে অধিষ্ঠিত হও, তবেই সৎ-স্বরূপের দর্শন ও অনুভূতি তুমি আস্বাদন করতে সক্ষম হবে।

এখন প্রশ্ন হ'ল, চিত্তবৃত্তিটি কি? চিত্তের বৃত্তি হ'ল সে যা কিছু

গ্রহণ ক’রে তাই মনকে আস্বাদন করায়। ধ’রে নাও, তোমার ছেলে চুরি করে। সেই চুরি করা বৃত্তি থেকে তাকে নিরোধ করতে পারলে তবেই তুমি শান্তি পাবে। ছেলে সৎপথী হ’লে তোমাকে হরিনাম শোনাবে, তাতে তোমার কত শান্তি, কত আনন্দ। সেই রকম চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা অর্থে বোঝায় চিত্তকে নির্ম্মল করা। চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করলেই তোমার সৎ-স্বরূপের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হবে। চিত্তবৃত্তি কি ক’রে নিরোধ হয় সেকথা আমাদের সকলেরই জানা উচিত।

সর্ব্বপ্রথম আমাদের জানতে হবে যে চিত্তকে কি ক’রে মার্জ্জন করা যায়। সেজন্য ইন্দ্রিয়গণকে আমাদের প্রথম থেকেই সংশোধন করতে হবে; ইন্দ্রিয়কে সংশোধন করার অর্থ হ’ল ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে সংশোধন করা। যেমন ধর, দর্শন। তুমি যা কিছু দর্শন কর তারই মধ্যে সৎ-স্বরূপকে দর্শন করতে হবে, অর্থাৎ দৃষ্টিকে এমন ভাবে সংশোধন করতে হবে যে, তাতে কোনরূপ লোভ, ঈর্ষ্যা ইত্যাদি না জাগে। এভাবে ইন্দ্রিয়ের সকল বিষয় যথা—শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন ইত্যাদি সংশোধন করা প্রয়োজন। চিত্ত নির্ম্মল হ’লে জ্ঞানসূর্য্যের আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত হ’য়ে উঠে একথা সত্য কিন্তু আমি বলি, ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল সংশোধিত হ’লে তুমি যে জ্ঞান আহরণ করবে তা হবে ভগবতীয় জ্ঞান, যে কর্ম্ম করবে তা হবে ভগবতীয় কর্ম্ম এবং তোমার দৃষ্টিও হবে ভগবতীয়। আমাদের এই কথা হ’ল আদিত্যজ্ঞানের কথা।

শ্রীমাধব বলেন, প্রকৃতপক্ষে চিত্ত কি বা চিত্তের সংজ্ঞা কি বা দেহের কোথায় চিত্তের অবস্থান এ সম্বন্ধে মানবমানবীর প্রকৃষ্ট ধারণা নেই। আমার মতে, প্রত্যেক জীবেরই একটা অস্তিত্ব আছে। মানুষের পক্ষে সেই অস্তিত্ব হ’ল তার মনুষ্যত্ব এবং সেই মনুষ্যত্বই হ’ল প্রকৃত প্রকৃতি। তাই বলি, চিত্তের প্রকৃত প্রকৃতি হ’ল মানুষের

মনুষ্যত্ব এবং সেই কারণেই চিত্তের ধারণ ও গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে। এই মনুষ্যত্বরূপ প্রকৃতি ছাড়া চিত্ত সংশোধিত হ'তে পারে না এবং ঈশ্বরকে জানতে বা উপলব্ধি করতে পারে না। মানুষ যদি মনুষ্যত্বের শক্তিতে বলীয়ান না হ'য়ে অমানুষে পরিণত হয়, তখনই তার চিত্ত মলিন হ'য়ে পড়ে। এই অমানুষের ভাব দূরীভূত হ'য়ে যখন মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয় তখনই চিত্ত পরিষ্কার এবং নির্মল হ'য়ে উঠে। তাহ'লে মানুষের অস্তিত্ব হ'ল তার সমস্ত দেহ নিয়ে। প্রশ্ন উঠে, তবে চিত্ত বলতে আমরা বক্ষঃস্থল দেখাই কেন? কারণ হ'ল যে, বক্ষঃস্থলেই গতিশীল জীবনের সমস্ত প্রকার ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়, তাই চিত্ত বলতে বক্ষঃস্থলকেই দেখান হয়।

চিত্ত দর্পণতুল্য সেকথা অতীব সত্য। মানুষের মনুষ্যত্বরূপ প্রকৃতিটিই হ'ল দর্পণ, আর চিত্তটি হ'ল সেই দর্পণের কাঁচ, কিন্তু কাঁচের পেছনে যে পারাটির সাহায্যে দর্পণে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় সেটি হ'ল প্রকৃতি।

দুঃখপূর্ণ অনিত্য এই মর্ত্যলোকে জীবের আগমনের আকর্ষণ

গত মঙ্গলবার শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈক ভক্তের প্রশ্ন ছিল—গীতায় ভগবান বলেছেন, 'অনিত্যং অসুখং লোকং ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্,' অর্থাৎ এই মর্ত্যলোক দুঃখপূর্ণ, অসুস্থ, অনিত্য এবং অস্থায়ী। এখানে যখন এসেছ, তখন ভগবানকে ভজনা কর। এখন জিজ্ঞাসা এই যে ভগবান কি জেনেশুনেই মর্ত্যলোককে দুঃখপূর্ণ ও অস্থায়ী ক'রেছেন? জগতের জীব যেন তাঁকে ভজনা করে সেই

কারণেই কি তাঁর এই বিচিত্র সৃষ্টি দুঃখে পরিপূর্ণ এবং অনিত্য? স্রষ্টার এই সৃষ্টি যদি অনিত্য বা অস্থায়ী এবং অসুস্থ অর্থাৎ দুঃখপূর্ণ হয়, তবে জীবের এ সংসারে আসার কি আকর্ষণ থাকতে পারে?

মানবমানবীর এই চিরন্তন জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীমাধব বলেন, এই মরজগৎ যেমন দুঃখে পরিপূর্ণ তেমন আবার এখানে সুখও আছে, তবে এই সুখদুঃখ উভয়ই অস্থায়ী। প্রশ্ন উঠে তবে আমরা এজগতে কেন আসি বা কে আমাদের এই জগত সংসারে পাঠান? চিরন্তন এই প্রশ্নের সাথে শ্রীমাধব আরও একটি প্রশ্ন জুড়ে দেন;—এই জগত সংসারটিকে কি ভগবানই দুঃখপূর্ণ ক'রে সৃষ্টি ক'রেছেন, না আমরা এসে একে দুঃখে পরিপূর্ণ ক'রে তুলেছি?

শ্রীমাধবের বক্তব্য হ'ল অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির উপাদান একদা অব্যক্ত ব্রহ্মের মধ্যে নিহিত ছিল। ব্রহ্মের স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতি যখন সেই উপাদান ধারণ করে, সেই অবস্থায় কোন কিছুই বেশীদিন সাম্যভাব বজায় রাখতে পারে না, তাই সেই সাম্যভঙ্গের ফলে পশুপাখী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদির সৃষ্টি। ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে সৃষ্টির শেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব হ'ল মানুষ। তবে কিভাবে এই সৃষ্টি হ'ল বা কে এই সৃষ্টিকর্ত্তা সে বিচার সুনিপুণভাবে করা বড় কঠিন। সমস্ত কিছুই যদি বিবর্ত্তনের ফলে হ'য়ে থাকে তবে মানুষও বিবর্ত্তন নীতিতে সৃষ্টি হ'য়েছে বলা চলে। মানুষের পরে আর কিছু সৃষ্টি হ'য়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বিবর্ত্তননীতি যদি আমরা মেনে নিই তবে দেখা যায় যে পচনই হ'ল সৃষ্টির উৎস। মনে পড়ে পূর্ব্ব মঙ্গলবারের এমনি একটি আলোচনা সভাতেই শ্রীমাধব একবার বলেছিলেন, সারাজগতে প্রাণশক্তি সম্পন্ন চারটি জাতির উল্লেখ করা যায়; যেমন উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ। বিবর্ত্তন নীতি মেনে নিলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা এ জগতে এসেছি একথা বলা চলে না; তবে কি একথাই মেনে নিতে হবে যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা নন? না, সেটি ঠিক নয়। আমাদের সন্ধান

করে, বিচার ক'রে দেখতে হবে যে এই বিবর্ত্তন এলো কোথা থেকে ?

মুনিঋষিগণ ব'লে গেছেন, ঈশ্বর এক এবং সেই এক থেকেই বহুর সৃষ্টি। জাগতিক ক্ষেত্রে ভালমন্দ ইত্যাদি যে সকল গুণ আমরা দেখি তার আদি হ'ল সত্ত্ব-রজঃ-তম এই তিনটি গুণ। সদ্ভাবান্বিত যা কিছু তার উৎস সত্ত্বগুণ, পঞ্চভৌতিকাদির মধ্যে যে ক্রিয়াশক্তি সেটি আসে রজোগুণ থেকে এবং স্থিতিশক্তি ও বাধাশক্তি হ'ল তমোগুণের। এগুলো প্রধান হ'লেও তিনটির মধ্যেই অনন্ত গুণের মিশ্রণ রয়েছে। সত্য, সাম্য প্রভৃতি ক্রিয়া সত্ত্বগুণের। যখন যার মধ্যে যে গুণের আধিক্য লক্ষিত হয় তখন সেই নামেই তার নামকরণ হয়।

যার মধ্যে সত্ত্বগুণাধিক্য, সে সর্ব্বদা সদ্ভাবান্বিত ভাবে নিবৃত্তির পথ ধ'রে এগিয়ে চলে। রজোগুণাধিক্য ব্যক্তি বিলাসী হ'য়ে উঠে। তমোগুণাধিক্যের কারণে মানুষ আলস্য, ক্রোধ, হিংসাপরায়ণতা ও দ্বেষাদির কবলে পড়ে। এই তিনগুণের নিজেদের প্রকাশিত হবার ক্ষমতা নেই। চব্বিশ তত্ত্বের মাধ্যমে এরা প্রকাশিত হবার পথ খুঁজে পায়। ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করার জন্য ষড়রিপু ও অষ্টপাশ ঐ চব্বিশতত্ত্বকে পরিচালনা করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব ষড়রিপুর অধীন থাকে ততক্ষণ যে তাকে সুখে দুঃখে হাবুডুবু খেতে হবে, কিন্তু যখন তার নিজ সত্তার কথা মনে পড়ে অর্থাৎ সে যে ঈশ্বরের অভিন্ন সত্তা এ জ্ঞান হয়, তখনই সে জেগে উঠে; মনে হয় শান্তিতে ছিলাম, অশান্তির কবলে কেন জড়িয়ে পড়লাম, কেন ঈশ্বর অশান্তি পরিপূর্ণ দুঃখময় মর্ত্ত্যলোকে আমাকে পাঠালেন ? মনের এই অবস্থায় কেউ যদি সৎপথে চলার মাধ্যমে নিজরাজ্য অর্থাৎ আত্মরাজ্য ফিরে পাবার জন্য সচেষ্ট হয় তখন সে রিপুর অধীনতা থেকে মুক্ত হ'তে পারে এবং রিপুগণই তখন তার সেবাদাসী হ'য়ে কার্য্য করে। মানবমানবীর এ উপলব্ধি তখন আসে যে এই রিপুগণ কত দুর্ব্বল, কত শক্তিহীন যাদের

মোহমায়ায় সে একদিন ডুবেছিল। ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থের জন্য মোহগ্রস্থ হবার ফলে ষড়রিপু ও অষ্টপাশ ঐ সুযোগ সুবিধা গ্রহণ ক'রেছিল। মানবমানবী তখন ভাবে, এদের মোহে পড়ে দুর্ব্বল না হ'লে কি এরা আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হ'ত? হ'ত না।

শ্রীমাধব বলেন, এখানে একটি কথা আমাদের ভেবে দেখতে হবে; সেটি হ'ল ইন্দ্রিয় চরিতার্থবোধ না থাকলে যে আবার সৃষ্টি লোপ পাবে। তাই আমার উপদেশ হ'ল, ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া করণকর্ম্মে সহায়তা ক'রে সৃষ্টিকার্য্য সমাধান কর তবেই আর সুখদুঃখের কবলে পড়ে হাবুডুবু খেতে হবে না। প্রত্যেক নারীপুরুষের যৌবন হ'ল সৃষ্টির কারণে, তাতেই পৃথিবীর গতি অব্যাহত থাকে। সৃষ্টির কারণে একটি যুবক আর একটি যুবতীর সহায়তায় যৌবনকে কাজে লাগায়। এই কর্ত্তব্যপালন হ'ল সত্যাংশে—একেই বলে ক্রম। ক্রমের মাধ্যমেই তোমার সংসার বৃদ্ধি পাবে। এতদ্ব্যতীত কিবা নারী কিবা পুরুষ, যদি যৌবনকে আত্মচরিতার্থের ভোগে নিয়োজিত করে, তবে সেটি হ'ল ব্যতিক্রম। এই ধর্ম্মই হ'ল বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। কোন কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় যদি অন্যরূপ বিধান দিয়ে থাকেন তবে সেটি বিশ্বজনীন ধর্ম্ম নয়, তাহ'ল সমাজ বিধান, তার সঙ্গে বিশ্বজনীন ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নেই। বিশ্বজনীন ধর্ম্মে একটি মাত্র কথাই বলার আছে; সে হ'ল—তুমি সত্যের অভিন্ন সত্তা। ক্রমের পথে জীবন পরিচালনা ক'রে এটি তোমার অনুভব করতে হবে। এখন পরিষ্কার বোঝা গেল যে ক্রমে শান্তি আর ব্যতিক্রমে অশান্তি। তুমি যে মোহগ্রস্থ হ'য়ে পড়েছিলে সে দোষ হ'ল তোমার বৃত্তির। এখানে মানুষকেও কোন দোষ দেওয়া যায় না আবার ঈশ্বরকেও এজন্য দায়ী করা যায় না। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জীবের জীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে; এ তাদেরই খেলা। প্রবৃত্তির কবলে বাঁধা না পড়ে যাতে নিবৃত্তির পথে যেতে পার, সেই চেষ্টাই কর। আবার বলি, প্রবৃত্তি

না থাকলেও তো চলেনা, তাই নিবৃত্তির সহায়তায় প্রবৃত্তিকে দাসী রাখ, কিন্তু প্রবৃত্তির দাস হ'য়ো না। উপমাস্বরূপ শ্রীমাধব বলেন, যেমন একটি চাকর বা দাসীর উপর কোন ভোগেচ্ছা থাকতে পারেনা, (থাকলেও সেটা ব্যতিক্রম) কেননা সেখানে নিবৃত্তি আছে অলঙ্ঘ্য বাধা স্বরূপ। তাই বলি, প্রবৃত্তিকে দাসী রাখ, প্রবৃত্তির উপরে ভোগেচ্ছা রেখো না।

আলোচনা সভায় অবতারবাদ সম্বন্ধে কথা উঠেছিল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীমাধব বলেন, মানুষের মধ্যে যে আমি সত্য, সেই আমি সত্যই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাতা ; একথা আমি, তুমি সবাই বলতে পারি। আমার মধ্যে যে আমি সত্য সেই আমি সত্যই কর্ষণ-আকর্ষণ-বিকর্ষণকারী কৃষ্ণ, আর আমার যে ভাব সেই ভাবই হ'ল তাঁর সত্তা। আমি কথাটি থেকে কেউ ভিন্ন নয়—আমিই পরমাত্মা, তাইতো বলি, নিজেকে জান তবেই তাঁকে জানতে পারবে। তবে শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ভাবি পরমপুরুষ বা অবতারপুরুষ তাই তাঁর কথাগুলো আমার পরম সত্তারূপ অঙ্কুরের পরম উপাদান কিন্তু সেই কৃষ্ণও তো মানুষরূপে জন্ম নিয়েছিলেন, যদিও ভক্তরা তাঁর দেহকে বলে চিন্ময়দেহ। তবে সমস্ত ধর্ম্মের মূল বিচার করতে গেলে, বিশ্বজনীন ক্ষেত্রে অবতারবাদ ব'লে কিছু নেই। তাই যদি হ'ত তবে তো জগতের সবাই তাঁকে মেনে নিত। তা তো মানে না! সূর্য্যকে সবাই মানে, কেননা সূর্য্য যে আলো বিকিরণ করে জগতের সবাই তো তা সমভাবেই ভোগ করছে কিন্তু মনুষ্যদেহ বিশিষ্ট কৃষ্ণ কি সর্ব্ব দেশ-কাল-পাত্রের কাছে সূর্য্যের মত একই ভাবে গৃহীত হ'য়েছেন? হননি। তাই বলি, যেহেতু মানবদেহ নিয়ে জন্মেছেন সেহেতু তাঁকে মানবশ্রেষ্ঠ বলাই ভাল। প্রকৃতপক্ষে অবতারবাদটি হ'ল সাম্প্রদায়িকবাদ। তবে যে সম্প্রদায় অবতারজ্ঞানে কাউকে ভজনা করে তাদের কাছে সেটি শ্রেষ্ঠ তো বটেই। আসল কথা

হ'ল, যে যে মতবাদ নিয়েই চলুক, লক্ষ্য তো সবার একই। বিশ্বজনীন ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বই হ'ল সবার উপরে, মনুষ্যত্বই শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যত্ব যার জাগ্রত সেই বুঝতে পারে কোনটি সুপথ, কোনটি ধর্ম্মপথ, কোনটি ন্যায়নীতি ; যে অমানুষ, সে এসবের কি বুঝবে ?

এই যে আমরা বলি, জগতের সব কিছুই অনিত্য, সবই মিথ্যা তা বলি কেন ? ব্যতিক্রমের পথে চলতে চলতে অজ্ঞানতায় ডুবে গিয়ে মনে হয় সব অনিত্য, সবই মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে অনিত্য ব'লে কিছু নেই—সবই নিত্য অর্থাৎ সব কিছুই সত্য।

প্রেম-ভক্তি-জ্ঞান

গত মঙ্গলবার শ্রীমাধবের আলোচনা সভায় জনৈকভক্ত তিনটি প্রশ্ন করেন, তিনি বলেন মীরার ভজনে আছে 'বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা', আবার ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'প্রেম হ'ল ভগবানকে বাঁধবার দড়িস্বরূপ ; শ্রীমৎ ভগবৎ গীতায় আছে, ভক্তির কথা। 'তাই' মনে প্রথম প্রশ্ন জাগে, প্রেম ও ভক্তির পার্থক্য কি ? দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল ; ভগবানকে যদি অদ্বয় বা অব্যক্তরূপে উপাসনা করি, তবে তাঁকে প্রেম বা ভক্তি নিবেদন করা কি ক'রে সম্ভব ? তৃতীয় জিজ্ঞাসা এই যে, ভগবানকে লাভ করতে হ'লে কি প্রেম ও ভক্তির প্রয়োজন, না শুধু জ্ঞানের দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায় ?

এই প্রশ্ন তিনটির সমাধান দিতে গিয়ে শ্রীমাধব বলেন, সংসাররূপ জীবনপথে মানবমানবী লাভ লোকসানের বুদ্ধি দ্বারাই পরিচালিত হয়। সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করতে গিয়ে তারা হ'য়ে

উঠে স্বার্থান্বেষী এবং আত্মকেন্দ্রিক, কাজেই লাভ লোকসানের হিসাব কষা ছাড়া আর কোনদিকে তাদের মন আকৃষ্ট হয় না। সেক্ষেত্রে এ সমস্ত প্রেম ভক্তির বিষয় সুবিচার করা বড় কঠিন হ'য়ে পড়ে।

শ্রীমাধব বলেন, আলোচনার প্রারম্ভে প্রেম কথাটির প্রকৃত অর্থ কি সেটি আমাদের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। জীবনপথে অগ্রসর হ'তে গিয়ে নানাবিধ কর্ম্মের মাধ্যমে মানুষ খুঁজে বেড়ায় একটু ভালবাসা, একটু আনন্দ, সামান্য একটু সুখ ও শান্তি কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় তার এই খুঁজে বেড়ানটাই সার; এর কোনটিই তার নাগালে ধরা দেয় না। এর কারণ কি? কারণ হ'ল এই যে, সংসার পথে চলতে গিয়ে সে নিজেকে সংসারচক্রে অতিমাত্রায় জড়িয়ে ফেলে এবং সেইহেতু সংসারের বোঝাটা এত ভারী হ'য়ে উঠে যে, মাথা সেই চাপ সহ্য করতে অপারগ। বোঝার ওজন অনুযায়ী চাপও সৃষ্টি হয় কিনা। অসহনীয় এই বোঝাটি থেকে মুক্তি পেলে যেমন সুখ-শান্তি-সোয়াস্তি বা আরাম বোধ হয় তেমনি সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের বাণী বা উপদেশ পালন ক'রে বা জপতপাদি ক'রে সংসার জীবনে আমরা ভুলের বোঝাকে যতটুকু হাল্কা করতে পারি ততটুকুই শান্তি বা সোয়াস্তি পাই। ভুলের বোঝা কেন বলি? অজ্ঞানতায় ডুবে থেকে যে সকল কর্ম্ম আমরা করি তাতে ঐ ভুলের বোঝা যে ক্রমশঃ বেড়েই চলে। জীবনপথে চলাকালীন মানুষ যদি তার সকল কর্ম্ম, আচরণ, চলন-বলন, আহার-বিহার ইত্যাদি সব কিছুকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে পারে, তবেই দেখা যাবে তার কাজে, কথায়, ব্যবহারে সে নিজেও আনন্দ পায় এবং চারিপাশের অন্য সবাইকেও প্রচুর আনন্দ দেয়। প্রাণবন্ত বলতে কি বোঝায়? প্রাণ তো সকল জীবের মধ্যেই আছে। বীণাযন্ত্রে যেমন একটি তারে সুর বাজালে পাশাপাশি সমস্ত তারে সেই সুরের ঝঙ্কার বেজে উঠে তেমনি জীবজগতেও যে প্রাণে প্রাণে সংযোগ আছে; কেননা সেই একই যে বহু হ'য়েছেন, তাই একের

আনন্দহিল্লোল বস্তুতে সঞ্চারিত হয়। দেখা যায়, মুনি ঋষি, সাধু, সজ্জন তাঁদের কথাবার্ত্তা, চলন-বলন, আচরণ সব কিছু এমন প্রাণবন্ত ক'রে তোলেন যে, বনের হিংস্র পশুসকল ও নিজধর্ম্ম ভুলে গিয়ে তাঁদের অমৃতবাণী, স্তোত্রপাঠ, মন্ত্রোচ্চারণ ও সামগীতি মুগ্ধ হ'য়ে শোনে। এই প্রাণবন্ত কথা বা আচরণে হিংসা, দ্বেষ দূরীভূত হ'য়ে তার মধ্যে সরলতা, নম্রতা, উদারতা আদি জাগ্রত হয় এবং প্রীতির ভাব সৃষ্টি করে। এই প্রীতিই সবার মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চারিত করে।

কর্ম্মের মধ্যে প্রাণবন্ত ভাবের প্রকাশ কি রকম ?

নিষ্ঠার সহিত সুচারুরূপে যে কর্ম্ম করা হয় সেটিই হ'ল প্রাণবন্ত কর্ম্ম। সমস্ত অবস্থায় যার মধ্যে এই প্রাণবন্ত ও স্বচ্ছ ভাবটি বজায় থাকে তার মধ্যে আপনা থেকেই প্রীতি উদয় হয় এবং সেই প্রীতিই সবাইকে প্রীত ও তৃপ্ত করতে সক্ষম হয়।

শ্রীমাধব বলেন, তুমি প্রকৃতি আর পরমাত্মাধাই একমাত্র পুরুষ। দুজনের মধ্যে যখন প্রীতির ভাব জাগ্রত হয়, তখন সেই প্রীতির পরশে বা আকর্ষণে উদয় হয় প্রেম। এই প্রেম এমনই নির্ম্মল, এমনি পবিত্র যে সারাবিশ্ব এই প্রেমডোরে বাঁধা পড়ে আছে। এ প্রেম হ'ল সর্ব্বজনীন প্রেম, জাত-কুল-মানের বালাই এ প্রেমে নেই। উপমাস্বরূপ শ্রীমাধব বলেন, যেমন ধর, বাগানের গাছে ফুল ফুটে আছে, প্রস্ফুটিত সেই ফুলের হাসিতে রয়েছে স্নেহমাখা প্রীতি এবং সেই প্রীতির মধ্যে অতি গোপনে রয়েছে পবিত্র এই প্রেমের সৌরভ যে কারণে ফুলের আঘ্রাণ ও ফুলের সঙ্গ আমাদের এত প্রিয়। এই প্রেমে না আছে বিন্দুমাত্র স্বার্থের সঙ্ঘাত, না আছে হিংসার উন্মত্ততা। যে প্রেমে জাত-কুল-মান যায় সে হ'ল গণ্ডীবদ্ধ, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ প্রেম। কিন্তু যে প্রেমের কথা আমি বলি, সে যে বিশ্বজনীন। যার মধ্যে সেই পরমপ্রীতি জাগ্রত হয়, সে তো সবাইকে ভালবাসবেই এবং তাকেও সবাই ভালবাসবে, কেননা, 'সেথা আছে শুধুই ভালবাসাবাসি;

বিনিময়ে কিছু দেবারও নেই নেবারও নেই।' প্রস্ফুটিত ফুলের প্রীতিকর প্রাণবন্ত সৌন্দর্য্য যেমন জীবকে কাছে টানে, সেরকম মানুষও যদি প্রীতিকর ও প্রাণবন্ত হয় তবে তাকেও সবাই আগ্রহে সঙ্গ দেবে, সেখানে কোন দ্বিধা, কোন স্বার্থই প্রতিবন্ধক হ'তে পারে না। এই প্রীতির সহায়তায় জীব যখন পরমানন্দের সন্ধান করে তখন সেই প্রীতি ভক্তির রূপ ধরে। প্রীতির প্রকৃষ্ট একটি রূপ হ'ল প্রেম। প্রেমরাশিতে পরমসত্য ও তাঁর সত্তা অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত।

প্রশ্নকর্ত্তা প্রেম ও ভক্তি ছাড়া জ্ঞানের পথ সম্বন্ধেও প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমাধব বলেন, জ্ঞানের পথ সম্বন্ধে সবারই একটা দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। জ্ঞানকে লোকে কর্কশ বলে এবং তাদের ধারণা জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় কিন্তু ভগবানকে নয়; যেহেতু ভগবান হ'লেন ভক্তের।

কিন্তু আমি বলি, জ্ঞান কথাটির অর্থ হ'ল জানা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পথে তুমি কে, ব্রহ্ম কে, প্রপঞ্চ কি, তা জানার নামইতো জ্ঞান। সেটি ভক্তির সাহায্যেও জানতে পারে, চিত্ত নিরোধ দ্বারা যোগের সাহায্যেও জানা যায়, আবার জ্ঞান দ্বারাও জানা যায়। মানুষের এই ভ্রান্তি থাকা অনুচিত যে, তিনটি আলাদা। প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। যোগ ও ভক্তির মিশ্রণ যে জ্ঞানে নেই সে জ্ঞান হ'ল অজ্ঞানতা স্বরূপ। যোগ বা ভক্তি ক্ষেত্রেও এই একই কথা বলা চলে।

প্রশ্ন উঠে, তবে জ্ঞানকে রুক্ষ বলা হয় কেন? তার কারণ হ'ল, যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষ নিরাকার ব্রহ্মকে জানতে চায়, প্রেম ও ভক্তি সেখানে কৈ; সেই অর্থে জ্ঞানকে বলে নীরস। এই নীরস অর্থে রস নেই তা কিন্তু নয়, যে রস এতে আছে তা আস্বাদন বা উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমাদের নেই, তাই জ্ঞানকে নীরস বা রুক্ষ বলা হয়। জ্ঞানের পথে তো সেবাপূজা ইত্যাদি নেই, তাই ভাবি জ্ঞান নীরস।

যোগের পথে এই ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, তোমাদের মধ্যে যে মূঢ়তা ও বিক্ষিপ্ততা আছে সেটি সংশোধন ক'রে একাগ্র হ'তে চেষ্টা কর। একাগ্র হ'লেই চিত্ত নিরোধ হবে।

শ্রীমাধব বলেন, ভক্তি পথে তুমিও আছ এবং তোমার ইষ্ট বা স্রষ্টাও আছেন; তাঁকে ডাক, এটাই হ'ল ভক্তির পথ। যিনি অখণ্ড-মণ্ডলাকার, তাঁর যতটুকু সৃষ্ট হ'য়েছে ততটুকুই তিনি ব্যক্ত, যা সৃষ্ট হয়নি সে অংশ অব্যক্ত।

শ্রীমাধব বলেন, সাধারণ মানুষের সংসার হ'ল তিনটি ঘরকে কেন্দ্র ক'রে; একটি গোয়াল ঘর, একটি রান্নাঘর ও একটি শোবার ঘর, তাই সে কেবল এই তিনটি ঘরের খবরই রাখে তার চাইতে বেশী কিছু জানতে গেলেই তার মাথা খারাপ হ'য়ে যায়। গোয়াল ঘরে থাকে গরু, ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদি পশুসকল। এরা সবাই গৃহস্থের সেবা ক'রে তৃপ্তি বোধ করে। তা নইলে কি এত চাবুক খেয়েও ঘোড়া তাকে পিঠে নিয়ে ছোটে? গোয়াল ঘরের উপমা দেবার উদ্দেশ্য কি? স্বার্থান্বেষী মানবমানবী ভগবানকে কি গোয়াল ঘরের গরুর চাইতে উপরে স্থান দিতে পারে? গরুর চারটি বাঁট হ'ল, ধর্ম্ম—অর্থ—কাম—মোক্ষ। আমরা যে সব সময়ই এই বাঁট চারটি দোহন করি; আবার তাঁকে ঘোড়া মনে করি এই কারণে যে তাঁর পিঠে চেপে যত শীঘ্র পারি এগিয়ে যাব। আমাদের সাধন ভজনের মূলে সর্ব্বদাই থাকে স্বার্থসাধনের এই অভিসন্ধি, তাই তাঁকে গোয়ালঘরে বেঁধে রেখেছি গরু আর ঘোড়া রূপে। একাধারে তাঁর থেকে সুধাও চাই আবার ধর্ম্ম—অর্থ—কাম—মোক্ষও চাই।

আর একটি হ'ল রান্নাঘর। রান্নঘরে সবরকম আহার্য্য তৈরী হয়, তারজন্য কোথাও থাকে রাঁধুনী বা চাকর, আবার কোথাও থাকে ঠাকুর। কিন্তু প্রকৃত সংসারী যারা, তারা কি রাঁধুনী, চাকর বা ঠাকুরকে কখনও রান্নাঘরে ঢুকতে দেয়? দেয় না। কেননা স্বামী-

পুত্র, সন্তানসন্ততি ও আত্মীয় পরিজনের প্রতি তারা যে প্রকৃত প্রীতি সম্পন্ন, তাই স্বহস্তে নানাবিধ সুস্বাদু ব্যঞ্জন রেঁধে তাদের খাইয়ে নিজেও তৃপ্তি পায়. আর সকলকেও তৃপ্তি দেয়। তাহ'লে দেখ, রান্নাঘরও কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। রান্নাঘরের গৃহলক্ষ্মীও যে অলক্ষ্মী হ'য়ে বসে আছে; কেননা, অপরকে দিয়ে রাঁধায় আর সদা সর্ব্বদা তার খুঁত খুঁজে বেড়ায়; এটা কি অলক্ষ্মীর চিহ্ন নয়? নিজের হাতে সব করলে কত শান্তি সংসারে থাকত বল দেখি।

রান্নাঘরের উপমা দেবার অর্থ হ'ল যে আমাদের প্রেম, ভক্তি কত নীচু স্তরে নেমে এসেছে, ভগবানকে আমরা ডাকি. 'তুমি রান্না ক'রে খাওয়াও', তাহ'লে কত শান্তি, সাংসারিক জীবনে আমাদের কত সুখ। এই সমস্ত ভাব নিয়ে আমাদের মুখে কি ঈশ্বরীয় প্রেম— ভক্তির তোফা তোফা বুলি সাজে? তিনটি ঘরেই যে ভগবান সমভাবে বিরাজ করছেন একথা কি কেউ একবারও ভাবে? তিনি নেই এমনতর বিন্দুমাত্র জায়গাও কি জগতে খুঁজে পাওয়া যায়? শ্রীগুরুদেবকে আমরা ঈশ্বরের প্রতিভূ ব'লে উচ্চকণ্ঠে প্রচার ক'রে বেড়াই কিন্তু রান্নাঘরের বামুনঠাকুর বা রাঁধুনী বা'মনীর চাইতে বেশী মান কি আমরা তাঁকে দিই?

শোবার ঘরেও সেই একই দৃশ্য। তাঁকে ডাকি আত্মসুখার্থে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানাটি পাবার জন্য, যেন শান্তিতে, আরামে নিদ্রাসুখটি অনুভব করতে পারি। শ্রীমাধব কটাক্ষ করেন, এই তো হ'ল আমাদের গুরুভক্তি, আমাদের তিনঘরের সাধনভজন। এরকম সাধনভজনের পরেও কি সেই পবিত্র, নির্ম্মল প্রেম-ভক্তির কথা আমাদের মানায়? সবচেয়ে আশ্চর্য্য হ'ল গোয়াল ঘরের কথা। তাঁর পিঠে চেপে চাবুক মারি—তাড়াতাড়ি মোক্ষে পৌঁছে দাও। আর গুরুকে পেয়েছি কামধেনুরূপে, বাঁট দিয়ে রক্ত ঝরে তবু দোহন করা থামে না। এই হ'ল আমাদের সাধন ভজন। আত্মসর্ব্বস্ব এই সাধন ভজনের ফলে কি প্রেম-ভক্তি মেলে?

সাধন ভজনের জাগতিক ও সাংসারিক রূপের বিস্তৃত বিশ্লেষণ ক'রে শ্রীমাধব তাঁর উপদেশ নির্দ্দেশ শিষ্যভক্ত সমাবেশে তুলে

ধরেন। তিনি বলেন, জানাটাই হ'ল জ্ঞান এবং জানলেই সেই জ্ঞান রসযুক্ত হয়। রসটাই হ'ল প্রেম। আমাদের আসল কথা হ'ল, ঈশ্বরকে গোয়ালঘরের বা রান্নাঘরের বা শোবারঘরের মত সেবা করলে চলবে না। এসব বর্জ্জন ক'রে সর্ব্বকর্ম্মে, আচরণে, চলনে-বলনে প্রাণবন্ত ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে হবে। ধর্ম্ম, কর্ম্ম সব কিছুই প্রাণবন্ত হ'তে হবে, এমন কি চাহনিটিও প্রাণবন্ত হওয়া চাই। যেমন মায়ের প্রাণবন্ত চাউনি হ'ল স্নেহভরা আর সন্তানের প্রাণবন্ত চাউনি হ'ল ভক্তি গদগদ।

পরিবারের কেউ যদি কট্ মট্ ক'রে তাকায় তবে সেই দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে কারুরই ভাল লাগে না। প্রাণবন্ত ক'রে যদি মূর্ত্তি গড়া হয় তবে সেই মূর্ত্তি দেখে আনন্দে বুক ভ'রে উঠে।

প্রাণবন্ত মূর্ত্তি প্রসঙ্গে শ্রীমাধবের একটি ছোট্ট আখ্যায়িকার কথা মনে পড়ে যায়।

গ্রামে ছিল একটি অতি সুন্দর ছেলে। তাকে দেখে আবালবৃদ্ধ-বনিতা সবাই ভালবাসে। যুবতীরা তার সাথে কথাবার্ত্তা বললে সবাই মনে করে, এর মধ্যে কাম বা রতিভাব রয়েছে। যুবক ছেলেটি ভাবে, 'হে প্রভু! আমার এতে অপরাধ কোথায়?' সহসা দৈববাণী হয়,—'বোকা ছেলে! তোর ভয় কিবে? তোর এত রূপ, এই রূপটা আমায় দিয়ে দে, তবেই তোর নিজের রূপ ফুটে উঠবে।'

সে ভেবে আকুল হয়, 'এ আবার কেমন কথা? এ রূপ ভগবানকে দিই কি ক'রে?' পুনরায় দৈববাণী হয়, 'ঐ গাছের নীচে তপস্যায় বসে যা। তারপর দেখা যাবে, কে তোকে কত ভালবাসে।'

ভগবান তখন এক ঋষি সন্নিধানে তাকে দীক্ষিত করালেন। যুবক গাছের নীচে তপস্যায় ব'সে যায়। তপস্যা করতে করতে কিছুদিন বাদে সে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীতে পরিণত হয়। তার আগেকার সেই রূপ তখন উবে গেছে, এবং তার মধ্যে আর কামজ প্রেমও নেই। অন্তদিকে তার মধ্যে যে ভগবৎ প্রেমের উদয় হ'ল তা দিয়ে সে সবার সেবায় লেগে গেল। গ্রামের লোকেরা অবিশ্যি তখনও তাকে ভালবাসে কিন্তু, অন্যরূপে। তখন যে সে মহাপুরুষের পর্য্যায়ে উঠে গেছে, তাই তাকে দেখলে তাদের হৃদয় ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত হ'য়ে প্রণাম জানায়।

॥ অশুদ্ধিশোধন ॥

বিষয় :	পৃষ্ঠা :
পড়ি	২৮
সাধু	২৮
জীবনপথকে	৩১
অর্থাৎ	৭৬
করেন।'	৫০
হয় না।'	৫১
খসে	০৮
তবে	৭৯
লালন	৮৬
মিথ্যা	৯৪
ও (হবে না)	১২৪
বলেন,	১২৩
নেয়	১২৭
সর্ব্বজনত্যাজ্য	১২৮
ঈশ্বর	১৩৮, ১৪৭
থাকি।	১৪০
ধর্ম্ম	১৬৩
মনুষ্যত্বের	১৬৩
ওতপ্রোত	১৬৬, ২৬৫, ২৭৪
মানবমানবী	১৬৬
হ'লে	১৬৯
সদুপদেশ	১৭২
পূর্ব্ব	১৭২
দৈত্যের	১৭৫
হ'ল,	১৭৫
ঠুলিবাধা	১৭৫
খাদ্য	১৮২
দেবদেবীর	১৮৭
দর্শণ	১৮৮
বলে, 'আমাকে	১৯৫
সরোষে	১৯৯
বো বলে, 'সর্ব্বনাশ	২০০
কোথেকে'	২০০
রাজা বলেন,	২০১
কাজেই	১০৩
অনাচার	২০৩
স্বেচ্ছাচারিণী	২০৩
সহধর্ম্মিণী	২০৫
তিনি	২০৫
এটা আবার কি?'	২০৫
সুদূর প্রসারী।	২০৭
উর্ব্বর।	২১৮
ঠিক আছে তো?'	২২১
অস্তিত্ব	২২৩
দাসত্ব,	২২৩
সহজাত ধর্ম্ম ;	২২৩
সত্তা	২২৪
যশোহানির	২৪৯
Amritsar	২৫০
সে রূপ	২৫৭
বিভিন্নভাবে	২৫৯
শক্তি	২৬৯
বহিরন্তরে	২৭৪, ২৯৮
আভিধানিক	২৮৮
যে নামে	২৯১
নিরাময়ের	২৯১
অভিপ্সা	২৯৩
পেরেছে (পরে দাঁড়ি হবে না)	২৯৫
সর্ব্বপ্রথম	২৯৫
পদ্মপলাশ-লোচন।	২৯৮
সদাসৎ	৩০৪